বিমল কর
উপাখ্যানমালা
BanglaBook.org

উপাখ্যানমালার গল্পগুলি 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ; ১৯৯০-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১-এর এপ্রিল—এই পাঁচ মাসে।

অনেককাল ধরেই আমার ইচ্ছে ছিল, কয়েকটি অ্যালিগরিকাল বা প্রতীকধর্মী গল্প লিখব। ইচ্ছে থাকলেও লেখা হয়ে উঠত না। আজ, জীবনের শেষবেলায় এসে গল্পগুলি যে লিখতে পারলাম—তাতেই আমি খুশী। আমার ইচ্ছাপূরণ ঘটলেও পাঠকের ভাল লাগার মতন কিছু এই গল্পগুলিতে থাকল কিনা তা আমি বলতে পারব না। শ্রীসাগরময় ঘোষ নিয়ত উৎসাহ না জোগালে বা তাগাদা না দিলে হয়ত শেষ পর্যন্ত গল্পগুলি লেখা হত না। আর শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে কথা প্রসঙ্গে আমার মনের ইচ্ছা না জানালেও হয়ত এমন লেখায় হাত দিতে হত না। এই গল্পগুলি দিয়েই আমি আমার ছোট গল্প লেখার পালা শেষ করলাম।

বিমল কর
১৯.১১.৯১

সূচী

সত্যদাস

সেই কোন ব্রাহ্মভোরে কচি রোদ উঠেছিল একটু। মুখ দেখিয়েই পালাল। আবার মেঘলা। তার পর বৃষ্টি ; ভরা বর্ষার মতন। আসে যায়, যায় আসে। অথচ এখন পৌষ পড়ছে। শীত এল। শীতের মুখেই আজ ক'দিন এই রকমই চলছে। সূর্য মুখ দেখায় না ; রোদ নেই, আলো নেই ঝলমলে। এমন কি রাতের অন্ধকারও ভেজা-ভেজা, স্যাঁতসেঁতে।

ভোরের রোদ দেখে রঘুনাথ ভেবেছিল, দিন পাঁচেক পরে আজই বোধ হয় অসময়ের বৃষ্টি-বাদলা কাটল। আবার সব শুকনো-শাকনা হয়ে উঠবে। মাটি শুকোবে শীতের রোদে ; গাছপালার গায়ের রঙ ফোটাবে উত্তরের হাওয়া। তা আর হল কই ! আবার বৃষ্টি !

আজ ক'দিন রঘুনাথের দোকানে বিক্রি-বাটা কম। দায়ে না পড়লে কেউ আর আসতে চায় না।

রঘুনাথের মুদির দোকান। চাল ডাল তেল নুন। মুড়ি বাতাসা থেকে আলু পেঁয়াজও পাওয়া যায়। মায় বিড়ি পর্যন্ত। দোকান খুব ছোটই। সাত আট বছরেও দোকানটাকে মোটামুটি বড় করতে পারল না রঘুনাথ। হলধরবাবুদের দোকানের তুলনায় তার দোকান টিমটিমে টেমি। তাতে অবশ্য রঘুনাথের চোখ টাটিয়ে নেই, কিন্তু তার দোকান গদাই কুণ্ডুর দোকানের মতন তো হতে পারত ! হল কই !

হলধরবাবুদের সঙ্গে তুলনা চলে না। দু-পুরুষের দোকান। সবচেয়ে পুরনো, সবার চেয়ে বড়। সেখানে না পাওয়া যায় কী ! মুদি তো আছেই, তার বেশিও আছে : টর্চের ব্যাটারি থেকে গুঁড়ো-দুধের টিন, জোয়ানের আরক থেকে বাচ্চা শোয়াবার অয়েল ক্লথ, ছাতা মশারি। বড়বাবুর ব্যবহারও ভাল। পুরনো খদ্দের এলে বিড়ি দেশলাই এগিয়ে দেন।

হলধরবাবু হবার কথা রঘুনাথ কোনোদিন ভাবেনি। স্বপ্নেও নয়। কিন্তু গদাই কুণ্ডু, নীলু ঘাটি কিংবা প্রসাদ—এদের মতনও হতে পারল কই! এরা মাঝারি মাপের ব্যবসাদার, উনিশ বিশ ছোটবড় মুদির দোকান খুলে বসে আছে। ভালই চলে তাদের। গদাই হয়ত একটু পুরনো, কিন্তু প্রসাদ? পাঁচ বছরেই সে চেহারা পালটে দিল দোকানের। এখন কেমন জাঁক করে কালীপুজো করে!

রঘুনাথের সাত বছরের দোকান কোনো রকমে টিকে আছে। চলে যাচ্ছে এই পর্যন্ত। মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয় রঘুনাথের। সে কিছুই প্রায় করতে পারল না। হয়ত গোড়াতেই ভুল করেছিল রঘুনাথ। একেবারে শেষপ্রান্তে তার দোকান, নিশিপুরের সাইডিং লাইন যেখানে মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। এত একটেরেতে দোকান করা ঠিক হয়নি।

রঘুনাথ মানুষ খারাপ নয়। তার ব্যবহারও ভাল। সে লোভী নয়, দু' পয়সার জিনিস চার পয়সায় বেচে না, ওজনে মারে না, পচা ডাল, ছাতা-পড়া বেসম বিক্রি করে না। সব মানুষের মতন রঘুনাথেরও পেট আছে, পেট চালাতে কে না দু' পয়সা চায়। রঘুনাথেরও তাই। দোকানের রোজগার থেকে তাদের দুটি মানুষের খাওয়া-পরা। বাড়তিও আছে একজন, একটা খোঁড়া মতন ছেলে—বিশু। রঘুনাথের সঙ্গে দোকানে হাত লাগায়, অন্য সময় যমুনার সংসারের কাজেকর্মে খেটে দেয়। বিশু অবশ্য এ-বাড়িতে থাকে না। সকালে আসে সন্ধেবেলায় চলে যায়। তবে তার সকাল দুপুরের খাওয়া-দাওয়া এখানেই।

বৃষ্টির ক'দিন রঘুনাথ যত না খদ্দেরের মুখ দেখল, তার দশগুণ বেশি দেখল মেঘলা দিন, বৃষ্টি। কখনো ঝমঝমিয়ে আসছে বৃষ্টি; কখনো ঝিরঝিরে, কখনো বা তুলোর আঁশের মতন জলকণা উড়ছে বাতাস ভিজিয়ে। আকাশ এই যদি ঘন ঘোর, আবার কখন একটু আরশি-রঙ হল, দেখতে দেখতে কালো। মেঘও ডাকে। বিজলি চমকায়।

রঘুনাথ দোকানে বসে বসে বৃষ্টি দেখে। সামনে কত কী গাছপালা। আগাছা। জারুল বকুল, ধুঁধুল লতা, গুঁড়ি খেজুর, বুনো কাঁটা ঝোপ। ডালপাতায় গা বাঁচিয়ে ভিজে কাক-পাখি কখনো ডাকে, কখনো পাখা গুটিয়ে বসে থাকে।

চুপচাপ কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়। কেউ এল তো ডালটা তেলটা বিক্রি করল। এ নুন লঙ্কা জিরে হলুদ নিল তো অন্য কেউ আলু পিঁয়াজ বিড়ি।

তাদের সঙ্গে দু' দশটা কথা। এ কী বেয়াড়া বাদলায় ধরল গো নগেন, বলো তো! চোখ খুলে রোদ দেখি না ক'দিন! দিনকাল পালটে যাচ্ছে বাপু, শীত বর্ষাও পালটে গেল।

যখন কেউ নেই, সামনে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেজা গাছপালা, ধুঁধুল ঝোপ, জল-কাদায় ভরা সরু পথটুকু আর একঘেয়ে বৃষ্টিও দেখা সম্ভব হয় না—তখন রঘুনাথ অন্য পাঁচটা কাজ নিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করে। আধ বস্তা আলুর বাছাবাছি সারছে, জলে স্যাঁতানিতে আলুতে দাগ ধরছে—আলু পচছে, পিঁয়াজ পচছে—পচা জিনিসগুলো ঝুড়িতে তুলে রাখছে আলাদা করে। বেশি পচলে আর বিক্রি করা যাবে না। অল্পস্বল্প দাগী আর নষ্টগুলো কম পয়সায় কিনে নিয়ে যায় অনেকে। সস্তা পড়ে।

পাঁচ সাতটা ছোট বড় টিনে ডাল মুড়ি চিঁড়ে রাখে রঘুনাথ। বিশুকে দিয়ে ডাল পরিষ্কার করিয়ে নিচ্ছে, চিঁড়ে মুড়ির টিনের ওপর পলিথিনের টুকরো চাপা দিচ্ছে এ-বেলা ও-বেলা। তাও কি আর থাকছে ওগুলো? নেতিয়ে গেল।

মাঝে মাঝে ভেতরে যায় রঘুনাথ। যমুনার সঙ্গে দু' পাঁচটা কথা বলে আসে! হয়ত একটু চা খেতে চাইল, না হয় বিক্রিবাটার হাল শুনিয়ে আসল, কিংবা খোঁজ নিল যমুনার গা-ভারি ভাবটা কমেছে কিনা!

সারাদিন তো এই রকম। সন্ধেবেলায় দোকানের ঝাঁপ ফেলার পর রঘুনাথ হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নিয়ে কিছুক্ষণ পুজোপাঠ করে। তার পর দুটো মুড়ি 'আর চা খেয়ে হাত ধুয়ে রামায়ণ নিয়ে বসে। মাঝে মাঝে মহাভারত। লণ্ঠনের আলোয় পিঠ নুইয়ে বসে রামায়ণ পড়ে সুর করে করে। ঘরের অন্য পাশে বিছানায় বসে যমুনা অন্যমনস্কভাবে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করে কিংবা শুয়ে থাকে চুপ করে।... খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে রাত হয় সামান্য।

দুই

আজ একটু অন্যরকম ঘটনা ঘটল।

বিকেলের মুখে জোরে বৃষ্টি এসে গেল। একেবারে যেন শ্রাবণ-ধারা। অবশ্য বেশিক্ষণ থাকল না। আঁধারও ঘনিয়ে এল তাড়াতাড়ি। একে মেঘবৃষ্টি বাদলা তার ওপর শীতের দিন।

বিশুকে ছেড়ে দিল রঘুনাথ। তুই যা রে ছোঁড়া। অবস্থা ভাল নয়। ভিজিস না। মাথা ঢেকে যাস।

বিশু চলে গেল একটা ছোঁড়াখোঁড়া পলিথিনের চাদরে মাথা পিঠ ঢেকে।

খানিকটা পরে রঘুনাথ যখন দোকানঘরে সন্ধে জ্বালিয়ে লক্ষ্মীর পটের নিচে ধূপ জ্বেলে দিচ্ছে—ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে একটা লোক এসে দাঁড়াল।

রঘুনাথ দেখল মানুষটাকে। চেনাজানা কেউ নয়। এ-পাড়ার লোক তো নয়ই, এমন কি এই পাঁচপুকুরিয়ায় কোনোদিন তাকে দেখেনি।

লোকটা রঘুনাথেরই সমবয়সী হবে হয়ত। কিন্তু বুড়োটে দেখায়। মুখে পাঁচ সাত দিনের দাড়ি, মাথায় রুক্ষ চুল। ওর একহাতে ছেঁড়াফাটা ছাতা। অন্য হাতে এক কাঠের বাক্স। বাক্সটা ছোট। দড়ি দিয়ে বাঁধা। ডান কাঁধে এক পুঁটলি ঝোলানো। পরনে ওর ময়লা, পেঁজাপাটা ধুতি। গায়ে কামিজ। তার ওপর এক কালো কোট। বোতাম দু' একটা আছে কি নেই। মেরামতির সেলাই এখানে ওখানে। পায়ে জলকাদায় ভেজা ছেঁড়া চটি।

রঘুনাথ বলল, "কী চাই ?"

লোকটা বাক্স নামাতে নামাতে বলল, "দুটো চিঁড়ে মুড়ি পাওয়া যাবে, বাবু ?"

মাথা নাড়ল রঘুনাথ, পাওয়া যাবে। "মুড়ি ভাল হবে না গো ! বর্ষায় ল্যেতা। আছে চাট্টিখানি।"

"চিঁড়েই দিন তবে ! গুড় আছে ?"

"ভেলি গুড়।"

"তবে তাই দিন।"

লোকটা তার ছাতা পোঁটলা একে একে নামিয়ে রাখতে লাগল দোকানের দু-হাতি নড়বড়ে বেঞ্চিতে।

রঘুনাথ কৌতূহল বোধ করছিল। "কোথ্ থেকে আসা হচ্ছে ?"

"সে ধরুন ধর্মপুর থেকে।"

রঘুনাথ কাছাকাছি কোথাও ধর্মপুর আছে বলে জানে না। তবে তার আর কতটুকু জানা ! এখানকার পাঁচ দশ মাইল এলাকার মধ্যে কত না জায়গা আছে, গাঁ-গ্রাম, কয়লাখনি, ছোট শহর, বসত বসতি। কত রকম নাম তার, রতিবাটি মনসাতলা শ্রীপুর বাদামবাগান....গণ্ডায় গণ্ডায় নাম।

"বাবু, হাত ধোবো একটু। এক ঘটি জল পাব ?"

রঘুনাথের মনে হল, লোকটার পায়ে যা ময়লা, কাদাজল—তাতে এক ঘটি জলে ওর হাত পা মুখ ধোওয়া হবে না। অচেনা মানুষকে হুট করে অন্দরে নিয়ে যাওয়াও ঠিক নয়।

কী মনে করে রঘুনাথ বলল, "দাঁড়াও একটু, দেখি... !" বলে সে ভেতরে

চলে গেল।

ফিরল সামান্য পরে। ছোট বালতিতে জল, আর টিনের মগ! দোকানের বাইরের দিকে বালতি নামিয়ে দিয়ে বলল, "নাও, হাত-পা ধুয়ে নাও। পাতকুয়ার জল।"

লোকটা দেখল রঘুনাথকে। যেন তার কুণ্ঠাই হচ্ছিল। "এক ঘটি জল হলেই হত বাবু!"

"কাদায় মাখামাখি হয়ে আছ! কেমন করে হত!...নাও ধুয়ে নাও।"

লোকটা তফাতে সরে গিয়ে হাতমুখ ধুতে লাগল।

"তা তোমার নাম কী হে?"

"আজ্ঞা, নাম তো আছে। সত্যদাস।"

"জাত কী?"

"জলটি চলে বাবু। গরিব মানুষের জাত আস্তাকুঁড়ের পাত... !"

সত্যদাস বালতির জলে পা ধোওয়া শেষ করে মুখ ধুতে ধুতে নিজেই বলল, "জলটি ভাল, বাবু; মুখে সোয়াদ লাগছে।"

রঘুনাথ লোকটিকে দেখছিল। সাদামাটা সরল বলেই মনে হচ্ছে; কথা বলার ধরনটিও নরম। "তুমি এই বাদলার দিনে যাচ্ছিলে কোথায়?"

মুখ ধুয়ে সত্যদাস বলল, "যাবার কী ঠিক আছে! যাচ্ছিলাম। পায়ে চাকা বাঁধা। যখন যেদিকে চাকা গড়ায় চলে যাই...।"

রঘুনাথ একটু হাসল। বলল, "তা বলে কোথাও গিয়ে রাতটুকু তো কাটাতে?"

"আজ্ঞা তা ঠিক। কোথাও মাথা গোঁজার চালা পেলে রাতটুকু কাটিয়ে দিতাম।"

সত্যদাসের মুখ ধোওয়া শেষ। বালতি মগ গুছিয়ে রাখল।

রঘুনাথ বলল, "দাড়াও হে! চিড়ে গুড় খাবে কিসে? ভিজিয়ে খাবে তো?"

"বাটি আছে!" বলে সত্যদাস তার ঝুলি খুলতে যাচ্ছিল।

রঘুনাথ বলল, "থাক, আমি এনি দিচ্ছি।"

ভেতরে চলে গেল রঘুনাথ।

সত্যদাস তার ঝোলা খুলে গামছা বার করতে লাগল। হাত মুখ মাথা মুছবে।

রঘুনাথ ফিরে এল। এক-হাতে কলাইকরা কানা-উঁচু থালা, অন্য হাতে

একঘটি খাবার জল। "নাও ধরো, এটিতে খেয়ে নাও মেখেমুখে ; পরে ধুয়ে দিও।"

চিঁড়ের অবস্থাও ভাল নয়। নরম হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই ; ভিজিয়েই তো খেতে হবে। কতটা ছিঁড়ে দেবে—রঘুনাথ জানতে চাইল না। পেটে খিদে আছে মানুষটার। দু মুঠো বে হলেই বা কী !

থালায় চিঁড়ে নিয়ে জল ঢেলে ভিজিয়ে নিতে লাগল সত্যদাস। গুড় নিল। বসল বেঞ্চিতে।

"তুমি কী কর হে, সত্যদাস ?"

সত্যদাস যেন হাসল একটু। বলল, "শেকড়বাকড় নিয়ে ঘুরি বাবু !"

"শেকরবাকড় !"

"তা দশ বারো রকম শেকড় আছে আজ্ঞা। ধরুন বিছার কামড়, সর্পদংশ, বিষক্ষত, শূলবেদনা, অজীর্ণ, বাতব্যথা...," সত্যদাস ধীরে ধীরে বলছিল। ও বলার মধ্যে পেশাদারি লোক-ভোলানো ভাবটা নেই, এমনভাবে বলছে যে সত্যি সত্যি এইসব শেকড়বাকড়গুলো রোগহর।

রঘুনাথ কৌতুক ও কৌতূহল বোধ করছিল। তার মনে হচ্ছিল, এত রকম জ্বালা যন্ত্রণা অসুখবিসুখের শেকড়ের কথা যখন বলছে সত্যদাস হয়ত এর পর বাচ্চাকাচ্চা হবার মতন কোনো শেকড়ের কথাও বলবে। এরা এ-রকম বলেই থাকে। রঘুনাথদের কোনো সন্তান নেই। যমুনা আজ এগারো বছর তাগা তাবিজ মাদুলি অনেক করেছে, ওষুধপত্র খেয়েছে, কবিরাজী, টোটকা, শেকড়ও বাদ যায়নি। সবই বিফলে গেছে। এখন আর যমুনা ওসব নিয়ে পাগলামি করে না। বাইরে বাইরে অন্তত নয়।

সত্যদাস খাওয়া শুরু করেছিল। মানুষটা যে উপোসী ছিল বোঝাই যায়। মন দিয়ে খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি।

রঘুনাথ সরাসরি কিছু বলল না। ঘুরিয়ে, যেন কৌতুক করেই বলল, "সর্পদংশনের শেকড় কি কাজে লাগে সত্যদাস ? আমাদের এদিকে দু একটা দেখলাম বাপু। ও তোমার শেকড় কিচ্ছুটি করতে পারল না।"

সত্যদাস খেতে খেতে বলল, "বাবু, সত্য কথাটা হল কী জানেন, সাপের বিষভেদ আছে। বড় বিষ এই গাছগাছালির শেকড়লতায় কাটে না। ছোট বিষ দূর হয়।"

"বাতব্যথার কথা কী বললে ?"

"আছে। পাকা বাত যায় না। কাঁচা বাতে বর্ষা-বাতে ভাল আরাম দেয়।

"না, আমার পরিবারের ওটি দেখা দিয়েছে কিনা তাই বলছি।"

সত্যদাস ঘটি তুলে জল খেল।

"আর কী রাখো গো ?" রঘুনাথ বলল।

"শিরঘূর্ণন, বাধক..."

"তুমি যে ধন্বন্তরী দেখি..." রঘুনাথ হেসে ফেলল। "বলি বাধকের শেকড় রাখো, বাঁজার রাখো না ?"

মাথা নাড়ল সত্যদাস। "না বাবু !"

খাওয়া শেষ করে জল খেল সত্যদাস। ঢেঁকুর তুলল। তার পর দোকানের বাইরে গিয়ে বালতির জলে তার খাবার পাত্রগুলো ধুয়ে দিল।

ফিরে এসে থালা, ঘটি রাখল।

"বিড়ি খাবে একটা ?"

"দিন !"

বিড়ি দেশলাই এগিয়ে দিল রঘুনাথ। "তা তোমার ঘরে আছে কে কে ? সংসার...!"

সত্যদাস বিড়ি ধরাল। "কেউ নাই। একা আমি ঘুরিফিরি মাথায় থাকেন শঙ্করী।" বলে নিজের মনেই যেন হাসল।

রঘুনাথ কয়েক মুহূর্ত দেখল সত্যদাসকে। বাউণ্ডুলে মানুষ নাকি। আগুটান পিছুটান কিচ্ছুই নেই মানুষটার !

এদিকে আবার বৃষ্টি নেমে গেল। সন্ধেও হয়ে এল। দোকানের ঝাঁপ ফেলার সময়। রঘুনাথ দোকান বন্ধ করে ভেতরে যাবে, হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে পুজোপাঠে বসবে। সত্যদাস তাহলে এখন যাবে কোথায় ? বৃষ্টির মধ্যে তো বেচারিকে বলা যায় না, এবার বাপু তুমি এসো ; আমার দোকান বন্ধের সময় উতরে গেছে।

বৃষ্টিটাও কেমন এল দেখেছ ! আবার যেন ঝাঁপিয়ে এসেছে।

সত্যদাস আমেজ করে বিড়ি টানছিল। চোখ সামান্য বোজা। মানুষটা সারাদিন এই বৃষ্টিবাদলার মধ্যে জলকাদা ঘেঁটে হেঁটেছে কোথায় কোথায় ! ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। সারাদিন পরে হাতমুখ ধুয়ে দুটি চিড়েগুড় খেয়েছে। পেট ভরেছে খানিকটা। বিড়ির তামাকের আমেজে তার চোখ দুটিও বুজে এল।

রঘুনাথ কী করবে বুঝতে পারছিল না। লোকটাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, আবার তার নিজের পক্ষে বৃষ্টি না-থামা পর্যন্ত বসে থাকাও সম্ভব নয়। তাহলে ?

"সত্যদাস !...তুমি বাপু একটা কাজ করো। আবার তো জল নামল। যেতে তো পারবে না। বরং তুমি বসো হে ওখানে। আমি ভেতরে যাই। সন্ধে ঘনিয়ে গিয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে পুজোটা সেরে আসি।"

সত্যদাসের যেন আমেজ ভাঙল। ব্যস্তভাবে বলল, "আজ্ঞা সেকি কথা। আপনার পুজোপাঠের সময়.... আমি আপনাকে আটকে রাখছি। আমি যাই বাবু—!"

"আরে না না, এ জলে যাবে কোথায়। বসো তুমি। জল থামলে যেও। আমি ভেতরে আছি। যাবার সময় ডেকে দিও।"

"আজ্ঞা আপনি পূজায় বসবেন।"

"ও কিছু না। ডাকলেই সাড়া পাবে।"

"বাবু, তবে দামটা নিয়ে নিন।"

রঘুনাথ কেমন কুণ্ঠিত হল। এই বাউণ্ডুলে আধ-ভিখিরি মানুষটার কাছ থেকে সে চিঁড়েগুঁড়ের কীই বা দাম নেবে। মানুষটা ভাল, সরল। মায়া হয় ওকে দেখলে। কতই বা ওর পুঁজি! দু পাঁচটা শেকড়বাকড়। বিক্রি হয় কি না-হয় কে জানে।

রঘুনাথের ইচ্ছে হল না পয়সা নিতে। দুর্যোগের মধ্যে বেচারি এসে পড়েছে এখানে—দুটো চিঁড়েগুঁড় খেয়েছে বড়জোর! পঞ্চাশ আশিটা পয়সায়, কী বড়জোর একটা টাকাই হল—ও নিয়ে আর কী লাভ হবে রঘুনাথের। সে তো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে না!

রঘুনাথ বলল, "দাম থাক হে। তোমায় দিতে হবে না।"

সত্যদাস অল্পক্ষণ দেখল রঘুনাথকে। তার পর বলল, "না বাবু, ওটি হয় না।"

'কেন হে?"

"আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, মশায়— শাস্ত্র আপনি বেশি জানেন। শাস্ত্রে বলেছে—মূল্যটি না দিলে অধর্ম হয়। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাও কাঞ্চন দিয়ে.."

রঘুনাথ হেসে ফেলল। "থাক, ধর্মকথা থাক্। ....দাও পঞ্চাশটি পয়সা দাও"

"যথার্থ মূল্যটি আপনি নিচ্ছেন না বাবু?"

"আমার ধর্ম আমাতে থাক। তোমারটি তুমি রাখো।"

সত্যদাস প্রথমে তার কোটের পকেট হাতড়াল। তার পর কী মনে করে দড়িবাঁধা কাঠের বাক্সটি খুলতে লাগল।

রঘুনাথ বলল, "তুমি না হয় পরে দিও।"

"না না, আপনি নিয়ে যান।"

দড়ির গিঁট খুলে বাক্সটির ডালা তুলল সত্যদাস। নানান ছোটখাট সামগ্রী, কাগজে মোড়া শেকড়বাকড়, কাচের বাটি, দু তিনটি, কাচের ছোট ছোট গ্লাস একজোড়া, কয়েকটা কালো কালো বল—জামের মতন, একটি একহাতি সরু লাঠি, কয়েকটা লাল সবুজ নীল রুমাল। ওরই মধ্যে থেকে সত্যদাস একটি কাপড়ের টেঁক-থলি বার করল। কাপড়ের রঙটি কালো।

রঘুনাথ এই বিচিত্র বাক্সটির সঞ্চয় দেখছিল।

থলি খুলে পয়সা বার করার সময় কী যেন একটি পড়ে গেল বাক্সর মধ্যে। সত্যদাস হয়ত খেয়াল করেনি। রঘুনাথের চোখে পড়েছিল। সে অবাক। বিশ্বাস করতে বাধছিল। এই আধ-ভিখিরি লোকটার টেঁক-থলির মধ্যে মোহর এল কেমন করে ? সোনা পেল কোথায় ?

"এই নিন বাবু", সত্যদাস পয়সা এগিয়ে দিল।

রঘুনাথের যেন ঘোর কাটেনি। অন্যমনস্ক।

"একটা টাকা আপনি নিলে পারতেন, মশায়।"

রঘুনাথ নিজেকে সামলে নিল। "পঞ্চাশটি পয়সাই দাও।"

পয়সা নিয়ে বাক্সর দিকে তাকিয়ে রঘুনাথ হালকা ভাবে বলল, "এত কী জড়ো করে রেখেছ হে সত্যদাস !",

"আজ্ঞা, এ আমার ইন্দ্রজালের বাক্সও বটে।"

"ইন্দ্রজাল !"

"হাটেমাঠে যখন ঘুরি বাবু, বসতে তো হয় দু-চার ঘণ্টা। লোক যদি না আসে কাছে শেকড়বাকড় কিনবে কে ? তখন দু চারটি হাত সাফাইয়ের খেলা দেখাই। তাসের খেলা, রুমালের খেলা, বলের খেলা। জলের রঙ পালটাই।....পেট চালাতে কত কী করতে হয়, বাবু !"

'ও ! তুমি ভোজবিদ্যাও জান ?" বলে রঘুনাথ হেসে উঠল। "বড় গুণী মানুষ হে তুমি সত্যদাস !"

সত্যদাস লজ্জা পেয়ে গেল যেন। বলল, "না মশায়, আমি গরিব তুচ্ছ মানুষ ; অমন কথা বলবেন না।"

"তুমি বসো। বৃষ্টি ধরল না। আমি ভেতরে যাই। যাবার আগে ডাক দিও।"

অন্দরে যাবার আগে রঘুনাথ দোকানের বাইরের ঝাঁপ আরও খানিকটা

নামিয়ে দিল।

তিন

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল।

রঘুনাথ সন্ধের পুজোপাঠ সেরে বাইরে এসে দেখে—সত্যদাস দু-হাতি বেঞ্চির ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে। গায়ে একটা ছেঁড়া চাদর। তার ঝোলাটি আর কাঠের বাক্স পড়ে আছে নিচে। ঝোলাটি আধখোলা। বোধ হয় চাদর বার করেছিল।

সত্যদাসকে ডাকতে গিয়ে রঘুনাথ দেখল, লোকটা কাঁপছে। হল কী ওর?

"সত্যদাস!... ওহে সত্যদাস!"

কানগালের পাশ থেকে চাদর সরাল সত্যদাস সামান্য। "বাবু?"

"তোমার হল কী?"

"কম্প জ্বর!"

"ম্যালারি?"

"পালাজ্বরে ধরেছে আমায়। তিনটি বছর ভুগছি। হয়, যায়। আবার হয়। আপনি চিন্তা করবেন না। খানিকটা পরে জ্বর ছেড়ে যাবে।.... জ্বর গেলেই আমি চলে যাব। নিশ্চিন্ত থাকুন।"

রঘুনাথ যেন আহত হল। বলল, "যাবার কথা আমি বলিনি, বাপু! জ্বরের কথা বলছি। এত কম্প হচ্ছে!"

"কম্পের দোষ কী! জলে জলে ঘোরা...! ও চলে যাবে।"

"গেলে ভাল।....তা আমি বলি কী, জ্বর গেলেও তুমি যেয়ো না। অসুখ নিয়ে এই রাতের বেলায় বৃষ্টি বাদলায় কোথায় ঘুরে বেড়াবে। বরং আজকের রাতটি এখানেই থেকে যাও। দোকানঘরেই থেকো।"

"সে কী হয় বাবু! আপনার বাড়িতে আমি অসুখ নিয়ে পড়ে থাকব।"

"হয়, খুবই হয়।...থাকো তুমি; আমি যাই। পরে এসে খোঁজ নেব।"

রঘুনাথ দোকানের ঝাঁপ পুরোটাই নামিয়ে দিল। ছোট লণ্ঠন সরিয়ে রাখল অন্যপাশে।

চার

নিজের ঘরে বসে রঘুনাথ লণ্ঠনের আলোয় 'রামায়ণ' পড়ছিল সুর করে। যমুনা বিছানার দিকে মাটিতে আসন পেতে কাঁথা সেলাই করছিল। বড়

কাঁথা। তার হাতের কাজ ভাল। এর ওর আবদারও রাখতে হয়। এই কাঁথাটা দত্তবাড়ির ছোট বউয়ের ফরমাশ। ছোট বউ ঈষাণী তার বন্ধুর মতন।

রঘুনাথ পড়ছিল :

রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি যদি হয়, করি নিবেদন ॥
এই মৃগচর্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটিরে কৌতুকে নাথ বিছাইয়া বসি ॥
আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন ॥
অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখ বিদ্যমান।...

যমুনার কান বোধ হয় রামায়ণ-পড়ায় ছিল না। দোকানঘরের দিকে কোনো শব্দ পেয়েছিল। বলল, "উঠেছে বোধ হয়।"

পড়া থামিয়ে রঘুনাথ স্ত্রীর দিকে তাকাল। কিছু বলল না। অন্য দিনের মতন আজ তার মন বসছে না পড়ায়।

"যাও গিয়ে দেখো একবার", যমুনা বলল।

"যাই...!" রামায়ণ বন্ধ করতে করতে বলল রঘুনাথ। পড়া শেষ হল না আর। "আমি ওকে থেকে যেতে বলেছি।"

"থাকবে!"

"যাবে কোথায় এত রাতে, বৃষ্টিবাদলায়। গায়ে জ্বর।" রঘুনাথ উঠে দাঁড়াল। বলল, "লোকটা বড় অদ্ভুত। শেকড়বাকড়ের এটিউটি বেচে পেট ভরায়। ওর কাছে সোনাটি এল কোত্থেকে?"

"সোনা না তামা?"

"সোনা।"

"গিলটি হবে।"

"না—মনে তো হয় না। সোনা আমি চিনি। আমার বাপ সেকরার দোকানে কাজ করত গো! সোনা দেখিনি বলছ!...দেখেছি। তার পর তোমায় দেখলুম—ওটি ভুলে এটি নিলুম। না কিগো যমুনাপুলিনে!" রঘুনাথ হাসতে লাগল রসিকতা করে। কিন্তু সোহাগটুকু মিশে থাকল হাসির সঙ্গে।

"এ সোনায় তো কিছু হল না," যমুনা বলল, "যে কে সেই! কপাল ফিরল তোমার? ছিলাম এক কোঠায়, সাত বছরে দুটি ভাঙা কোঠা। সোনা নয়, তামাও নয়—এ হল টিনের পাতি।"

"ভাগ্য যার যেমন। তোমার দোষ কী। রাজা হরিশ্চন্দর চণ্ডালের কর্ম করেছিল। ... ও কথা থাক। আমি ভাবছি ওই আধ-ভিখিরির কাছে সোনা থাকে কেমন করে?"

"ছিল হয়ত একটা। কেউ দিয়েছিল। বাপ-মা।"

"কেউ তো নেই ওর।"

"তবে জিজ্ঞেস করো।"

"না না, তা হয় না। ভাববে, লোকটার তো নজর বেশ, একলহমায় দেখে নিয়েছে সোনাটি।"

"চোর ছ্যাঁচড় নয় তো।"

"ছিছি। চোর কেন হবে। মানুষটি ভাল। তাছাড়া আজ সে আমাদের অতিথি। মন্দ কথা বলতে নেই।"

"বেশ, না বললুম। যাও দেখো গিয়ে এবার..."

রামায়ণ তুলে রেখে রঘুনাথ দোকানঘরে গেল।

সত্যদাস উঠে বসেছে। চাদর দিয়ে ঘাম মুছছিল কপালের গলার। হাওয়ায় নিশ্বাস নিচ্ছে মাঝে মাঝে। হেসে বলল, "জ্বর ছেড়ে গেছে বাবু। আমার এই রকমই হয়। হুট করে জ্বর এল কম্প দিয়ে, আবার চলেও গেল। বড় জোর একবেলা ভুগলাম।"

রঘুনাথ ঠাট্টার গলায় বলল, "ভালুক জ্বর হে।"

"তা আজ্ঞা ঠিক কথা। পুরাতন কম্পজ্বরের ধর্মই এই।"

"রাতটুকু তুমি এখানেই থাকো," বলে রঘুনাথ দোকানের টিন-দেওয়া ঝাঁপটা দেখাল। বলল, "উটি তলার দিকে একটু খোলা আছে। বন্ধ করে দি। আর উই পিছনের দরজাটি আমরা বন্ধ করে দেব। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।"

মাথা নাড়ল সত্যদাস। "যথেষ্ট।"

রঘুনাথ জানে যথেষ্ট নয়। বেঞ্চিটা সরু, ছোট। হাত-পা গুটিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুতে হবে। কষ্টই হবে সত্যদাসের।

সত্যদাস হঠাৎ বলল, "আপনি মশায় মানুষটি বড় ভাল। অজানা-অচেনা মানুষকে লোকে ঘরে ঢুকতেই দিতে চায় না, আপনি আমায় আশ্রয় দিলেন। ...যিনি দেখার তিনি কিন্তু সব দেখেন, বাবু। ঠিক কিনা বলুন।"

রঘুনাথ হাসল। বলল, "দেখেন বলেই তো এই অবস্থা গো সত্যদাস। এই দোকানটি দিয়েছিলাম দেশভুঁই ছেড়ে এসে। তা সাত আট বছর হয়ে গেল।

লতা বাড়ে পাতা বাড়ে মানুষের সাধও তো বাড়ে হে ! আমার কপালে কোনটি বাড়ল বলো ! একটি চালা মাথায় নিয়ে বসেছিলাম—সাত বছরে মাথা গোঁজার মতন দুটি চালা ; আর ওই দু চার হাত এদিক ওদিক। দেখার মানুষটি আর দেখলেন কোথায় ! ওই মানুষটির ঘাড় বেঁকা। পুবে মুখ থাকলে পশ্চিমে চোখ ফেরে না।"

সত্যদাস তাকিয়ে থাকল। দেখছিল রঘুনাথকে। চোখের পাতা পড়ল না সত্যদাসের কিছুক্ষণ। তার পর কেমন এক সরল আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

"হাসছ যে !"

"আজ্ঞা না। আমি বোকাসোকা মানুষ বাবু। মুখ্যু লোক। আমার কথায় দোষ ধরবেন না। যেমনটি মুখে আসে বলে ফেলি, বুঝি না মশায় !"

রঘুনাথ আর কথা বাড়াল না। বলল, "জ্বর যদি না থাকে দুটি রুটি আর আলুবেগুনের ঘেঁট খেয়ে শুয়ে পড়তে পার। কাল সকালে অন্য কথা।"

সত্যদাস কিছু বলল না। ঘাড় হেলিয়ে বসে থাকল।

পাঁচ

পরের দিন সকালে কুয়াশা-জড়ানো রোদ উঠল প্রথমে। বৃষ্টি নেই। আকাশ অনেক পরিষ্কার। সামান্য পরেই কুয়াশা কাটল। গাছপালা মাঠঘাটে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে।

সত্যদাস মাঠ ঘুরে এসে হাতমুখ ধুয়ে নিয়েছে ভেতরে কুয়াতলায় গিয়ে। যমুনা তখন ঘরদোর ঝাঁট দিচ্ছে। দেখল সত্যদাসকে। সত্যদাসও তফাত থেকে দু হাত জোড় করে পিঠ নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে হাসল একটু।

নিজের ঝোলাটি বেঁধে, কাঠের বাক্সটি গুছিয়ে নিয়ে সত্যদাস যখন যাব-যাব করছে রঘুনাথ বলল, 'বাসীমুখে যেতে নেই গো। দাঁড়াও, একটু চা খেয়ে যাও। চা আসছে।"

"তা খেয়েই যাই, আপনি ভাল কথা বললেন। চায়ের অভ্যাসটি অল্পস্বল্প আছে আমার।'

"তুমি এখন যাবে কোথায় ?'

"পা যেদিকে যায়", সত্যদাস হাসল ; "রতিবাটি হয়ে চলে যাব।"

যমুনা দু গ্লাস চা এনে ভেতর দরজার কাছে দাঁড়াল। শব্দ করল।

রঘুনাথ উঠে গেল চা আনতে।

সত্যদাস তার গায়ের কোটটি পরে নিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

চা এনে দিল রঘুনাথ। "ধরো হে! দাঁড়াও, একটা হাত-বিস্কুট দিই।"

রঘুনাথের দোকানে প্লাস্টিকের বয়ামে কয়েকটা হাত-বিস্কুট ছিল। বর্ষায় নেতিয়ে গেছে।

"নাও ; নরম হয়ে গেছে, মুখে দিয়ে স্বাদ পাবে না।"

সত্যদাস বিস্কুট নিতে নিতে বলল, "দিনটি আজ ভালই এল, বাবু! সুয্যিদেব উঠলেন। ঝলমলিয়ে গেল ধরিত্রী।"

রঘুনাথেরও মনে হল, আজকের দিনটি যেন এ-কদিনের মেঘলা-বাদলা, ভিজে স্যাঁতসেঁতে নির্জীব ভাব কাটিয়ে নতুন করে জেগে উঠল। সকালের কাক ডাকছে, শালিক নেমেছে, ধুঁধুল ঝোপের কাছে কুকুরটিও এসে বসল।

সত্যদাস গ্লাসটি ধুয়ে রেখে দিল। "বাবু, এবার তবে আসি।"

"এসো।'

"মনটি বড় তৃপ্ত হয়েছে মশায়। খেপা-পাগলা মানুষ, ভিখিরি লোক। দয়া করে আপনি আশ্রয় দিলেন, দুটি খেতে দিলেন। আজকাল আর কে দেয়, বাবু! ভগবান আপনার ভাল করুন।"

সত্যদাস তার দড়িবাঁধা বাক্সটা হাতে তুলে নিল। কাঁধের ঝোলাটা আগেই ঝুলিয়ে নিয়েছে।

রঘুনাথ বলল, "এদিক পানে ফিরবে কবে?"

"তার কি ঠিক আছে। সাতদিন পরে পারি, আবার মাস দু মাস কাটিয়েও পারি।"

"তা এদিকে এলে, দেখা করে যেও।"

"অবশ্যই মশায়।" সত্যদাস দু হাত তুলে জোড় করে নমস্কার করল। "আসি।"

"এসো।"

সত্যদাস চলে গেল।

রঘুনাথ তাকিয়ে থাকল। কাঁচা পথ, ঝোপঝাড়, বনতুলসীর জঙ্গল, ধুঁধুল ঝোপ, তার পর মাঠ। সত্যদাস চলে যাচ্ছে। এক কাঁধে ঝোলা, অন্য হাতে দড়িবাঁধা কাঠের বাক্স। ছাতাটি বগলে। তার কালো কোটটিতে রোদ পড়েছে।

বিশু এল খানিকটা পরে।

রঘুনাথ বলল, "দে ঝাঁটপাট দিয়ে নে। ভাল করে দিবি। দিয়ে সামনেটা

ধুয়ে দিবি জল দিয়ে, কাদায় কাদায় ভরে গেছে।" বলতে বলতে সে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল, নিয়ে দোকানের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। "বেঞ্চিটা বার করে দিবি রোদে। ক'টি জিনিস শুকোতে দেব। নে হাত লাগা। সাফসুফের কাজ শেষ করে মায়ের কাছে যাবি। চা মুড়ি খেয়ে নিয়ে অন্য ক'টি কাজ আছে মায়ের, সেরে দিবি।"

বিশু জানে তার নিত্যকার কাজ কী কী করতে হয়। দোকান ঝাটপাটটা তার প্রথম কাজ। দোকান সাফ হবার পর বাবু দু দশ ফোঁটা জল ছিটোবেন। মালক্ষ্মীর পটের কাছে রাখা ধূপদানে ধূপ দেবেন। প্রণাম করবেন ভক্তিভরে। তারপর একটি সরায় দুটি চাল আর একটি হলুদ রেখে শুরু করবেন বেচাকেনা।

বিশু ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। রঘুনাথ বাইরে দাঁড়িয়ে।

দূরে কোলিয়ারির ভোঁ বাজছে। অনেকটা তফাতে কাক ডাকছিল। কোথা থেকে যেন কাঠ কাটার মতন একটি শব্দ ভেসে আসছে।

হঠাৎ বিশু ডাকল। "বাবু ?"

তাকাল রঘুনাথ।

"এটি কী পড়ে রয়েছে!" বিশু বাইরে এসে জিনিসটি এগিয়ে দিল।

রঘুনাথ দেখল। দেখেই চিনতে পারল। সত্যদাসের সেই টেঁক-থলি। কাল রাতে এটাই দেখেছিল রঘুনাথ। সত্যদাস পয়সা বার করছিল ওর মধ্যে থেকে।

হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিল রঘুনাথ। মোটা কাপড়ে তৈরি জিনিসটা। কাপড় ময়লা। কিন্তু পুরু কাপড়। মুখের কাছে গিঁট। ভারিই লাগছিল থলিটি।

দেখেছ কাণ্ড সত্যদাসের। আসলটি নিতে ভুলে গেল কেমন করে। তাছাড়া এটি তো ওর কাঠের বাক্সর মধ্যে ছিল। বার করেছিল কেন ? করল তো আবার রাখতে ভুলে গেল কেমন করে। এমন বেখেয়ালে মানুষ বড় দেখা যায় না। ওর পকেটে পয়সাকড়ি তেমন থাকে বলে তো মনে হয় না। লোকটা বিপদে পড়বে। আবার ফিরে আসতে হবে ওকে।

রঘুনাথ থলির মুখটি খুলব কি খুলব না করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তার দ্বিধা হচ্ছিল। এই থলির ভেতর থেকে কাল একটি মোহর পড়ে গিয়েছিল বাক্সের মধ্যে। হয়ত পরে সেটা নজরে এসেছিল সত্যদাসের। যদি নজরে নাও এসে থাকে—তার বাক্সর মধ্যেই আছে—পেয়ে যাবে। কিন্তু...।

রঘুনাথ খানিকটা দ্বিধার পর থলির দড়িটি আলগা করল। দেখল।

আচমকা যেন এমন কিছু হয়ে গেল—যাতে রঘুনাথ চমকে উঠল ভীষণ ভাবে। তার চক্ষু স্থির। গলার কাছে শ্বাস আটকে গিয়েছে। বিশ্বাস হচ্ছিল না রঘুনাথের। সে কী কোনো স্বপ্ন দেখছে। তার কি মতিভ্রম হল। নাকি সে পাগল হয়ে গেছে।

রঘুনাথ থলির মুখ আরও খানিকটা হাঁ করল।

ভয়ে ভয়ে হাত ডোবালো, আঙুল দিয়ে ছুঁলো, ঘাঁটল। না, এ তো সোনা; সোনাই। মোহর!

বিশু দোকান সাফ করছে।

রঘুনাথ একবার বিশুকে দেখে নিল। না ছেলেটা তার নিজের কাজে ব্যস্ত।

একটি মোহর তুলে নিল রঘুনাথ। ভয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বিধা নিয়ে।

সকালের আলোয় রঘুনাথের আর ভুল হল না। সেকরার ছেলে। সোনা চেনায় তার ভুল হবার কথা নয়।

মোহর ঠিকই। তবে কবেকার মোহর বোঝা যাচ্ছে না। পুরনো তো বটেই। রানীর আমলের।

রঘুনাথ আর দাঁড়াল না, অন্দরের দিকে পা বাড়াল।

বাসী শাড়িজামা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল যমুনার। কুয়াতলার পাশেই জামাকাপড় মেলে দেবার দড়ি টাঙানো। যমুনা ভিজে কাপড়চোপড় মেলে দিচ্ছিল রোদে।

রঘুনাথ ডাকল, "শোনো।"

অনেক দিন পরে রোদ উঠেছে। এ ক'দিন ঘরবাড়ি যেমন সেঁতিয়ে গিয়েছিল—জামাকাপড়ের সেই অবস্থা। রোদে সবই মেলে দিতে হবে। যমুনা যেন খানিকটা আরাম করে রোদ গায়ে লাগিয়ে জামাকাপড় মেলে দিচ্ছিল। এখন এগুলো, পরে আরও দেবে।

সাড়া না দিলেও সামান্য পরে ঘরে এল যমুনা।

ঘরের মাঝমধ্যিখানে কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রঘুনাথ। তার হাতে যেন কী একটা রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে যমুনা বলল, "কী?"

কী বলবে, কেমন করে বোঝাবে ঠিক করতে না পেরে সামান্য থতমত খেয়ে রঘুনাথ বলল, "এই দেখো।"

যমুনা দেখছিল।

রঘুনাথ বলল, "মোহর। লোকটা ফেলে গিয়েছে। তার টেঁক-থলির মধ্যে এই গিনি মোহরগুলো ছিল।"

"মোহর!" যমুনা ভীষণ অবাক। আরও দু পা এগিয়ে এল।

রঘুনাথের হাতের তালুতে কয়েকটা মোহর। দুটো আঙটি।

যমুনা কোনোদিন মোহর দেখেনি। গরিব ঘরের মেয়ে, বিধবা মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছে। দুটো খেতে পরতে পেত—এই না যথেষ্ট ছিল। পরে অবশ্য মামার বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। সে অন্য কথা।

হাত বাড়াল যমুনা। "দেখি।"

রঘুনাথ একটা মোহর এগিয়ে দিল। "আমি কিছু বুঝতে পারছি না! আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা...লোকটা তার টেঁকের থলি ফেলে গেল কেমন করে? আর মোহরই বা পেল কোথায়?

যমুনা খুব মন দিয়ে মোহর দেখল। মোহর সে না দেখুক—শুনেছে তো কানে। আসল সোনা। "মোহর তুমি জান?"

"জানব না। বলছ কী! সেকরার ছেলে...!"

"মোহর কেউ ফেলে যায়?"

"পাগল না হলে যায় না।... তাও ছ' ছ'টা মোহর।"

'ছ'টা?"

"ছ'টা মোহর, দুটো আঙটি।"

"আঙটিও?" যমুনা যেন থমকে গেল। বড় বড় চোখ করে স্বামীকে দেখছিল। তার পর রঘুনাথের হাতের দিকে তাকাল।

কী মনে করে রঘুনাথ বলল, "দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিয়ে এসো।"

যমুনা এগিয়ে গিয়ে বারান্দার দিকের দরজা ভেজিয়ে দিল। বিশু এখনই এসে ডাকাডাকি শুরু করবে।

রঘুনাথ একটু আড়ালে সরে গেল। এ-পাশে জানলা রয়েছে। আলোও আছে। জানলার ওপারে ফাঁকা জমি। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই। তবু পুরোপুরি খোলা জানলার কাছে দাঁড়াল না রঘুনাথ।

নিজের হাতের মুঠো খুলে মোহরগুলো দেখাতে দেখাতে রঘুনাথ বলল, "এগুলো পুরনো মোহর। রানী-মুখো।...আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—এতগুলো মোহর লোকটা ফেলে গেল কেমন করে? ভুল করে? এমন ভুল মানুষের হয়! তাছাড়া সত্যদাস একটা দুটো নয়—ছ' ছটা গিনি মোহর পাবেই বা কেমন করে? আধ-ভিখিরি লোক। শেকড়বাকড় বেচে খায়...!"

"আঙটির পাথর দুটো কিসের ?"

রঘুনাথ আঙটি দেখতে দেখতে বলল, "পাথর আমি ভাল চিনি না। তবে দেখে মনে হচ্ছে দামী পাথর।"

"হীরে ?"

একটা আঙটি ওঠাল রঘুনাথ। দেখাল স্ত্রীকে। বলল, "এটা কেমন সাদা আর ঝকঝক করছে দেখেছো। হতে পারে হীরে। ঝলসে উঠছে—" বলে আলোর মধ্যে আঙটির পাথরটা দেখতে লাগল।

"হীরে না কাচ ?"

"না কাচ নয়।"

"আর-একটা আঙটি ?"

অন্য আঙটিটাও দেখাল রঘুনাথ। কালচে। বলল, "এটি কী—আমি জানি না। নীলাটিলা হতে পারে।"

"নীলা ?"

"কী জানি !"

রঘুনাথ হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে আঙটি দুটো দেখতে দিল।

যমুনা দেখল। সে পলা-পাথরছাড়া পাথরই দেখেনি জীবনে। আর দেখেছে মুক্তো। ঈষাণীর কানের ফুলে ছোট ছোট দুটি মুক্তো বসানো আছে।

রঘুনাথ হাত বাড়িয়ে আঙটি দুটো ফেরত নিল। মোহর আর আঙটি কাপড়ের টেঁক-থলির মধ্যে রাখতে রাখতে বলল, "সত্যদাস কেমন মানুষ বুঝতে পারছি না। ওর কাছে এসব জিনিস থাকার কথা নয়। দু পাঁচটা টাকাও যার কাছে থাকার নয় সে ছ' ছটা মোহর, দুটো আঙটি কেমন করে রাখে !"

"থলির মধ্যে পয়সাকড়ি নেই ?"

"না।"

"কাল তো তোমাকে থলির মধ্যে থেকে পয়সা বার করে দেবার সময় একটা মোহর পড়ে গিয়েছিল বলছিলে !"

মাথা নাড়ল রঘুনাথ। সে ঠিকই বলেছে।

"তবে আজ পয়সাকড়ি নয়, শুধু মোহর এল কেমন করে ?"

কেমন করে এল—তা আর রঘুনাথ কেমন করে জানবে ! কথাটা সে না ভাবছে—এমন নয়। ধাঁধা লাগছে। সবই ধাঁধা। ধোঁকা খেয়ে গিয়েছে রঘুনাথ। বলল, "কী জানি এটা বোধহয় আর-একটা থলি। সত্যদাস লুকিয়ে

রাখত।”

যমুনা বলল, “লুকনো থলি তোমার বাড়িতে ফেলে গেল! তাই হয় নাকি!”

“হবার কথা নয়। কিন্তু...”

“লোকটা চোরটোর নয় তো?...চুরিটুরি করেছিল কোথাও...ধরা পড়ার ভয়ে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল—!”

রঘুনাথের মাথায় কিছু আসছিল না। সত্যদাসকে দেখলে চোর বলে মনে হয় না। হাটেমাঠে যারা শেকড়বাকড়, ওষুধ-তেল মালিশ, হজমি কৃমির ওষুধ বিক্রি করে—সেই রকমই মনে হয়। অবশ্য লোকটা নাকি ভিড় জমাতে ভোজবাজিও দেখায়।

রঘুনাথ বলল, “সত্যদাস বলছিল ও ভোজবিদ্যা জানে অল্পস্বল্প।”

“তবে এ তোমার কিছুই নয়। ওর ভেলকি দেখাবার জিনিস। খেলা গো, খেলা। নকল সোনা, নকল হীরে!”

রঘুনাথ মাথা নাড়ল। তার মনে হচ্ছিল না—সোনা নকল। পাথর হতে পারে—সে জানে না। তবু এখন দ্বিধার সঙ্গে বলল, “কী জানি!”

“এখন কী করবে?”

“দেখি! সত্যদাস যদি আসে। খেয়াল তার পড়বেই। হয়ত আজই ফিরে আসবে। এ তো আর দশ বিশটা পয়সা কি টাকা নয় যে হারিয়ে গিয়েছে বলে মাথা খুঁড়তে যাবে না। সে আসবে।”

“আসার কথা কি বলে গিয়েছে কিছু?”

“না, তেমন ভাবে বলেনি। আমি জিজ্ঞেস করলুম। তা বলল, এ-পথে ফিরবে যখন—তখন দেখা করবে। সে সাতদিন একমাস হতে পারে, আবার দু চার মাসও হতে পারে।”

বিশুর গলা পাওয়া গেল। ডাকাডাকি করছে।

যমুনা বলল, “তা এখন করবে কী?”

“তোমার বাক্সর তলায় রেখে দাও।... কাউকে কিছু বলো না। একটু নজর রেখো। দিনকাল ভাল নয়।”

যমুনা বলল, “বিছানার তোশকের তলায় চাবি আছে। বাক্স খুলে তুমিই রেখে দাও।”

ছয়

সেদিন নয়, তার পরের দিন নয়, হপ্তাও পার হল সত্যদাস এল না।

রঘুনাথ প্রথম প্রথম ভাবত, এই বুঝি সত্যদাস এসে পড়বে। সে সকাল দুপুর বিকেল অপেক্ষা করত। সন্ধে কি রাত্রেও তার কান পড়ে থাকত দোকানঘরের দিকে। এই বুঝি সত্যদাস এসে ডাকবে, 'বাবু ?' কিন্তু কোথায় সেই লোকটা ? দোকানে বসে ডাল তেল গুড় বেচতে বেচতে রঘুনাথ সামনের দিকে তাকিয়ে থাকত, ভাবত—হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, এক কাঁধে ঝোলা, অন্য হাতে কাঠের বাক্স, রুক্ষুসুক্ষু চেহারায় সত্যদাস এসে হাজির হবে জারুল গাছ আর ধুঁধুল ঝোপের পাশ দিয়ে। সত্যদাস আসত না।

এমন করেই হপ্তা গেল। মাস গেল। শীতের বাতাস ছুটল সনসন করে, পাতা ঝরতে লাগল গাছের, মাঠের ঘাস শুকোতে শুকোতে খয়েরি হল। মাঘও এল শীত পড়ল হাড়-কাঁপানো ; বিদায়ও নিল। তার পর ফাল্গুন।

রঘুনাথ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। লোকটার হল কী! এমন বে-আক্কেলে কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ আর দেখেনি সে। তোর সোনাদানা ফেলে তুই চলে গেলি—খেয়াল পড়ল না তোর! কার না খেয়াল পড়ে! আর খেয়াল যদি পড়বে—একবার তো আসবি।

মানুষটা মরে গেল নাকি ? মরে গেল, না, ধরা পড়ে গেল! বাইরে থেকে মানুষকে দেখে চেনা যায় না। যদি এমনই হয় সত্যদাস বাইরে যত সরল ভেতরে তা নয়, তাহলে! মানুষটা কী কোনো মতলব নিয়ে মোহরগুলো এখানে ফেলে গেল ? সত্যিই কি ওগুলো চোরাই মাল! ধরা পড়ার ভয়ে ফেলে গিয়েছে ? কিন্তু সত্যদাসকে দেখে তো চোর-ছ্যাঁচড় মনে হয় না।

অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য, তার পর অস্বস্তি আর বিরক্তি। দিনের মধ্যে সারাক্ষণই যদি সত্যদাসের কথা ভাবতে হয় রাগ হওয়াই স্বাভাবিক।

"কী হলো বলো তো ? মানুষটা মরে গেল নাকি ?"

যমুনা বলল, "মরতেই পারে। মানুষের মরণের কি ঠিক আছে!....ও আর আসবে না।"

যমুনার ধারণা সত্যদাস আর ফিরবে না।

রঘুনাথ তবু অপেক্ষা করে করে ফাল্গুন-চৈত্রও কাটিয়ে দিল। বৈশাখ মাসে এদিকে এক মেলা হয়—শিব ঠাকুরের মেলা। নানা দিক থেকে লোক আসে.

দোকানপত্র বসে, হরেকরকম জিনিস বিক্রি হয়। যদি সত্যদাসও আসে—তার শেকড়বাকড় বেচতে—এই আশায় বসে থাকল রঘুনাথ, লোকটা এল না, বৈশাখও ফুরলো।

সেদিন রঘুনাথ সন্ধেবেলায় স্নান করে কাপড় বদলে রামায়ণ নিয়ে বসেছে। পড়ছিল সুর করে করে, কাছেই ছিল যমুনা, হঠাৎ বলল, "তুমি কি ঘুমোচ্ছ?"

রঘুনাথ ঘুমোয়নি। বলল, "কেন?"

"একই জায়গা কতবার করে পড়ছ?"

খেয়াল হল রঘুনাথের। বইয়ের দিকে তাকাল। সে পড়ছিল :

জন্মাবধি দুঃখ মোর কি কহিব আর।
তবু দুঃখ দেও দয়া না হয় তোমার ॥
ক্লেশে অবসন্ন তনু শুন গো তারিণী।
দয়া কর দয়াময়ী পতিতোদ্ধারিণী ॥

রঘুনাথ বলল, "খেয়াল করতে পারছি না।"

যমুনা বলল, "তুমি আজকাল বেখেয়ালেই থাক। পড়তে বসে চুপ করে যাও। হয় কী তোমার? ভাব কী?"

রঘুনাথ চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ; তার পর বলল, "ওই সত্যদাসই আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। দু পাতা রামায়ণ পড়ব—তাও মন বসাতে পারি না। ওর কথা মনে পড়ে যায়।"

"ভেব না ওর কথা।—কতবার বলেছি... !"

"কিন্তু মোহরগুলো, পাথর দুটো...."

"আমার বাপু মন বলছে, ওগুলো খাঁটি নয়। ..তুমি যতই বলো সেকরার ছেলে তুমি, তোমার ভুল হবে না; আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না ওগুলো খাঁটি। খাঁটি সোনা, হীরে পাথর কেউ ফেলে রেখে যায় না। তুমি ভুল করছ।"

"ভুল করার কথা তো নয়।"

"বেশ তো, একবার পরখ করিয়ে এসো না। ...তবে আমি বলছি—ও-লোক আর আসবে না; তুমি দেখে নিও।"

জ্যৈষ্ঠ মাসটা আর অপেক্ষা করতে পারল না রঘুনাথ। তার ভুল হয়েছে কি হয়নি একবার দেখা দরকার। হতে পারে রঘুনাথ ভুল করছে। সোনা-চেনার চোখ হয়ত তার আর নেই। সেই কবে বাবার আমলে সোনা দেখেছে, তার পর আর দেখল কোথায়? এমন যদি হয়—রঘুনাথ যা সোনা বলে মনে করছে, তা নকল সোনা, সত্যদাসের ভেলকির খেলা দেখানোর মোহর—নকল, তাহলে

এই দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা অপেক্ষার কোনো মানেই হয় না। নকলের কী দাম!

শেষে রঘুনাথ যমুনাকে বলল, "আমি একবার শহরে যাই। সোনাটা যাচাই করে আসি। চাঁদুবাবুর দোকান চিনি। মানুষটি মন্দ নয়।"

"তাই যাও।"

"একটি গিনি মোহর নিয়ে যাব গো! গরিব মানুষের পকেটে দুটি চারটি মোহর দেখলে সন্দেহ করবে। একটিই নিয়ে যাই।"

রঘুনাথ শহরে গেল। গেল বিকেল বিকেল। ফিরল রাত করে।

ফিরে এসে বলল, "যা বলেছিলাম। খাঁটি সোনা। নকল নয়।"

যমুনা আর কথা বলতে পারল না।

সাত

বর্ষার মুখে রঘুনাথ দেখল, ছ' ছ'টি মাস শেষ। সেই পৌষ আর এই আষাঢ়। সত্যদাস এল না। সে আর আসবে না।

লোকটা যখন আর এল না, অকারণ অপেক্ষা করে কী লাভ! রঘুনাথ তার দোকানটিকে এবার ধীরে ধীরে গুছিয়ে নিতে পারে। এতদিন তার টাকাপয়সা ছিল না। নিজেদের পেট ভরাতেই লাভের কড়ি খরচ হয়েছে। এখন সে একটু একটু করে দোকান বাড়াতে পারে। ঘরদোরের অবস্থাও ভাল নয়। মেরামতি দরকার। বর্ষা পড়েছে।

রঘুনাথ একদিন শহরে গিয়ে একটি মোহর বেচে এল।

সোনার কি এখন কম দাম!

সোনা বেচার টাকা পকেটে করে রঘুনাথ বাড়ি ফিরল। আসার সময় শাড়ি জামা কিনে আনল যমুনার জন্যে। আরও দু চারটে খুচরো জিনিস সংসারের কাজে লাগবে বলে।

রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা হল অনেক। আগে দোকানের কাজে হাত দেবে, না বাড়ির কাজে। দোকানটাই আগে বাড়ানো দরকার। জিনিসপত্তর আনতে হবে পাঁচ রকম, কম করে হলেও আনতে হবে; লোকে যাতে জানে রঘুনাথের মুদির দোকানেও ডাল তেল নুন ছাড়াও অন্য পাঁচটা জিনিস পাওয়া যায়। তাছাড়া অল্পস্বল্প পালটে নিতে হবে দোকানটা, সাজিয়ে নেবে। ঘরদোরের কাজে এখনই বেশি কিছু খরচ করার দরকার নেই। রান্নাঘরের মাথার টিন আর কলঘরের আড়ালটা আপাতত সারিয়ে নিলেই চলবে।

বর্ষার মধ্যেই দোকানের কাজে হাত দিল রঘুনাথ।

অবুঝ বা বেহিসেবী নয় রঘুনাথ—তবু এখন যা দিনকাল—হাতের টাকা যেন খই মুড়ি, এক ফুঁয়ে উড়ে যায়। যা ভেবেছিল সে—তার সিকিভাগও হল না, টাকা ফুরিয়ে গেল।

চিন্তায় পড়ল রঘুনাথ।

যমুনা বলল, "নামলে যখন—তখন হাত গুটিয়ে নিয়ে লাভ কী! আরও একটি বেচে এসো। নয়ত আগের খরচটুকুও জলে যাবে।"

ঠিক কথা। শুরু করেই থেমে যাবার অর্থ, না হল এটা না হবে ওটা।

রঘুনাথ বলল, "কিন্তু শহরে চাঁদুবাবুর কাছে আর কি যাওয়া উচিত হবে গো? আগেরবার মিথ্যে কথা বলেছি। তা একটা মোহর—না হয় আমাদের মতন গরিবঘরে থাকল কোনো রকমে। বার বার মোহর আসে কেমন করে? চাঁদুবাবু সন্দেহ করতে পারে।"

"তাহলে কী করবে?"

"আমি ভাবছি, দরদাম তো জানা হয়েই গেল। বাইরে গেলেও ঠকাতে পারবে না। আমি বরং বর্ধমানে চলে যাই। সকালের গাড়িতে যাব—সন্ধেয় ফিরব।"

"তাই ভাল।"

দু তিনটে দিন কাটিয়ে রঘুনাথ গেল বর্ধমানে।

ফিরে এল হাসিমুখে। বলল, "গতবারের চেয়ে আরও তিরিশ টাকা বেশি পেলাম গো। সোনার দাম নিত্য বাড়ে। দোকানের মালিকটিও ভাল।"

রঘুনাথের হাতের পয়সা খরচ হতে লাগল তার দোকান বাড়াতে।

পুজোর আগেই রঘুনাথের তিনটি মোহর খরচ হয়ে গেল। ভালই লাগছিল তার। দোকানের বাহার কত খুলে গিয়েছে। আলকাতরা মাখানো ভাঙা টিনের ঝাঁপ ছিল দোকানের, বসতে হত একটা তিন-হাতি ঠেকো দেওয়া তক্তপোশে, জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা ছিল না ভাল, কতক ময়লা টিন আর প্লাস্টিকের বয়াম। সরু একটা বেঞ্চি ছাড়া বসতে দেবার জায়গা ছিল না খরিদ্দারদের। এখন রঘুনাথ একে একে সব পালটে নিয়েছে। ঝাঁপ করেছে ভাল টিন দিয়ে, গদির তক্তপোশ পালটে নিয়েছে, গোটা দুই টিনের চেয়ার এনে রেখেছে দোকানে। আর এখন রঘুনাথের দোকানে জিনিসপত্তরও থাকে নানারকম, গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট, টিকিয়া, দাঁতের মাজন, গায়ে-মাখা মাঝারি দামের সাবান, দুধের কৌটো, সস্তা সিগারেট, চিনি, বনস্পতি, খুচরো চা,

এমনকি পেট ফাঁপার আরক, আয়না চিরুনিও।

অন্দর মহলেও এটা ওটার কাজকর্ম সারা হচ্ছে।

লোকে বলত, রঘুনাথ মুদির হল কী।

রঘুনাথ হেসে জবাব দিত, "ময়দা মাখলে তবেই না লুচি। আগে অতশত বুঝতাম না। দু মুঠো ময়দা মাখতাম, আপনাদের সেবা করতে পারতাম না। এখন কপাল ঠুকে মাখছি বেশি।"

কিন্তু টাকা? টাকা আসছে কোথ্ থেকে?

নিজের কপাল দেখাত রঘুনাথ। বলত, পরিবারের মামাটি চোখ বুজলেন হালিশহরে। ভাগ্নী ছাড়া কেউ ছিল না। মামাশ্বশুরের জমি-জায়গা ছিল সামান্য। বেচে দিলাম।

গদাই কুণ্ডু, নীলু ঘাঁটি, প্রসাদরাও দোকান দেখল। হয়ত চোখও টাটালো।

পুজোর আগে যমুনা বলল, "এবার আমার ঘরবারান্দা সারিয়ে দাও। ভাঙা বেড়া আর রাখব না। হারু বেড়া বেঁধে দেবে নতুন। গাছপালাগুলো বাঁচাতে হবে তো।"

রঘুনাথ এখনও রামায়ণ পড়ে। বইয়ে মুখ রেখে হেসে হেসে বলল, "শোনো তবে—। কঠিন রমণী-জাতি সৃজিলেন ধাতা।/ অন্তরে পুড়িয়া মরে নাহি কয় কথা ॥ কেহ না বুঝিতে পারে স্ত্রীলোকের ছল।/পুরুষ ভোলাতে নারী ফাঁদে নানা কল ॥'

যমুনা বলল, "বাঃ! আমি তোমায় ভোলাচ্ছি।"

হাসতে হাসতে রঘুনাথ বলে, "সে তো আগেই ভুলিয়েছ!.... তা বলি কী! একটু সবুর করো। দোকানের জন্যে একটা বড় বাতি কিনতে যাব কলকাতায়। পেট্রম্যাক্স.... ।"

"কলকাতায় কেন?"

"ঘুরেফিরে আসব একটু। দু চার জায়গায় দেখব। হলধরবাবুদের কিছু কিছু মাল কলকাতা থেকে আসে। একটা লোক ঠিক করতে পারলে আমিও মাল আনাব কলকাতার মহাজনের কাছ থেকে।"

"টাকা?"

"আরও তো আছে।"

যমুনা যেন খুশি হয় না। বলে, "নিঃশেষ হয়ে যাবে?"

"মনের সাধ যখন মেটাতে শুরু করেছি, শেষ পর্যন্ত মেটাব। যমুনা,

রঘুনাথ-মুদিকে লোকে বলত, নেড়াতলা।...এখন কথাটি নেই। সেদিন হলধরবাবুর বড় ছেলে শশধর এসেছিল। বলল, বাড়িতে দীননারায়ণের পুজো। বাবা একবার যেতে বলেছে। এসো একবার। আমাদের ওই একটিই পুজো বাড়িতে। পঞ্চাশ বছর হতে চলল।"

যমুনা বুঝতে পারল। হলধরবাবুরাও আজ ডাকতে আসে। হঠাৎ কী মনে হল যমুনার। বলল, "কলসির জল বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। একদিন ফুরোবেই। তুমি কলকাতাতেই যাও। পড়ে পাওয়া ধন, ফুরোলেই বা কী! তোমার-আমার সাধ-আশা তো মিটলো!"

রঘুনাথ মাথা দোলালো। সত্যদাসের কথা এখন আর বড় একটা মনে পড়ে না তার। মানুষটা যদি নাই থাকে, মরে গিয়ে থাকে—তবে আর তার কথা ভেবে লাভ কী! রঘুনাথ তো অন্যায় কিছু করেনি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সে অপেক্ষা করেছে—সত্যদাস আসেনি। রঘুনাথ চোর নয়। সে সত্যদাসের গাঁটের থলি চুরিও করেনি। তবে? ভাগ্যবশে যা পেয়েছে তার জন্যে রঘুনাথকে দোষ দিয়ে লাভ নেই!

রঘুনাথের এখন সাধস্বপ্ন মিটতে শুরু করেছে। সে হাত সামলে বসে থাকবে নাকি! যা আছে সবই তো এখন তার। সত্যদাস নেই।

আট

পুজো কাটল। অগ্রহায়ণও ফুরিয়ে গেল।

রঘুনাথের দোকান অনেক বেড়েছে। বাহারি হয়েছে। বিশু ছাড়াও একটা লোক দোকানে খাটছে এখন। দিনের বেলায় ভিড় থাকে। রাত্রে পেট্রম্যাক্স বাতি জ্বলে। ফটিকচাঁদ, কার্তিক রায়, মথুররা এসে বসে আড্ডা জমায় দোকানে। যাত্রাগানের গল্প করে, নাতুহাট কোলিয়ারিতে ডুলি ছিঁড়ে দুটো লোক মরেছে তার বৃত্তান্ত শোনায়, কার্তিকের মেয়ের বিয়ে মাঘ মাসে—দেনাপাওনার কথা এখনও চুকলো না—এইসব গল্পগাছা হয়।

অন্দরমহলও পালটে গিয়েছে রঘুনাথের। যমুনার অনেক সাধই মিটিয়ে দিয়েছে রঘুনাথ। ঘর সারিয়েছে, বারান্দা ঢেকেছে, রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর তকতক করছে এখন; কলঘর তৈরি করিয়ে দিয়েছে নতুন করে। একটি মেয়ে এখন যমুনার সংসারে কাজকর্ম করছে।

রঘুনাথের অতৃপ্তি বলে আর কী থাকল! সে সুখী।

পৌষের গোড়ায় শীত এসে পড়েছিল। এবার যেন জাঁকিয়ে শীত পড়বে। বর্ষাও কম হয়নি।

সেদিন ফটিকচাঁদরা উঠে গিয়েছে। দোকানের ছেলেগুলোও বাড়ি চলে গিয়েছে কখন। রঘুনাথ পেট্রম্যাক্স বাতিটা নিভিয়েছে সদ্য। দোকান বন্ধ করবে। এমন সময় কে যেন পা দিল দোকানে।

রঘুনাথ ঠিক বুঝতে পারেনি। জায়গাটা অন্ধকার মতন। "কে ?"

'বাবু ! আমি !"

গলার স্বরেই চমকে উঠল রঘুনাথ। লোকটাও দু পা এগিয়ে এসেছে।

"সত্যদাস !"

"হ্যাঁ বাবু ! নমস্কার !"

সত্যদাসের সেই একই চেহারা। রুক্ষ চুল, মুখে দাড়ি, এক কাঁধে তার ঝোলা, অন্য হাতে দড়িবাঁধা কাঠের বাক্স। এমনকি ছেঁড়াখোড়া ছাতাটিও তার বগলে। লোকটার গায়ে সেই কালো কোট। বাড়তির মধ্যে একটা ভুট-কম্বলের মাফলার রয়েছে গলায়।

সত্যদাস তার বাক্স নামাল। ঝোলাও নামিয়ে রাখল।

পেট্রম্যাক্স বাতি নিভে যাবার পর তফাতে একটা লণ্ঠনই শুধু জ্বলছিল।

"বাবু, আপনি ভাল আছেন ?"

রঘুনাথের গলায় তখন যেন কেউ ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে। মুখে কথা আসছিল না। সত্যদাসকে দেখছিল। সত্যিই কি সত্যদাস এসেছে ! না, তার চোখের ভুল ! বিভ্রম ?

সত্যদাসই কথা বলল, "এই পথে ফিরছিলাম বাবু ! আপনাকে বলেছিলাম না, এ-পথে ফিরলে আবার আসব।"

রঘুনাথ নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। "কোথ্ থেকে আসছ ?"

"আসার কি নির্দ্দিষ্ট থান আছে বাবু ! ঘুরে ঘুরে আসা।"

"এখন কোথ্ থেকে আসছ ?"

"হৃদয়পুর থেকে। .... আপনি ভাল আছেন ? মা জননী ?"

রঘুনাথ মাথা নাড়ল। ভাল আছে।

সত্যদাস তাকিয়ে তাকিয়ে দোকানটা দেখছিল। দেখতে দেখতে একটু যেন হাসল আপন মনে। "গত বছর এই সময়টিতে এসেছিলাম, বড় বৃষ্টি ছিল তখন— !"

রঘুনাথ কোনো কথা বলল না ; মাথা নাড়ল। সত্যদাসকেই দেখছিল।

লোকটা কেন এল ? কী দরকার ছিল তার আসার ! চিতা থেকে মরা মানুষ উঠে আসে না, কিন্তু সত্যদাস যেন সেই ভাবেই এসে পড়েছে।

সত্যদাস বার দুই কাশল খুক খুক করে, গলা পরিষ্কার করল। তার পর বলল, "বাবু গলাটিতে ব্যথা হয়েছে। নতুন ঠাণ্ডা। একটু চা পাব ? মা জননীর সেই চায়ের কথাটি আমার মনে আছে। ভুলিনি।"

রঘুনাথ আর কী বলবে ! এগিয়ে গিয়ে লণ্ঠনটি আরও একটু জোর করে দিল। বলল, "বসো।"

অন্দরে এসে রঘুনাথ দেখল, যমুনা ঘরে। মোড়ায় বসে পায়ের সেবা করছে। শীতে তার পায়ের গোড়ালি , পাতা, আঙুল ফেটেফুটে হাঁ হয়ে যায়। ব্যথাও হয় খুব। দুধের সর আর নারকোল তেল মিশিয়ে এক মলম মতন করে পায়ে মাখে যমুনা।

রঘুনাথ স্ত্রীর কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল যমুনাকে। পা নামিয়ে নিল যমুনা। তাঁতের শাড়ি, রঙিন জামা, সন্ধেবেলায় বাঁধা খোঁপা—যমুনাকে আজকাল ভালই দেখায়। মুখটাও কত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

রঘুনাথ বলল, "ও এসেছে।"

যমুনা কিছু বুঝল না। তাকিয়ে থাকল। "কে ?"

"সত্যদাস !"

যমুনার যেন বিশ্বাসই হল না। দেখছিল স্বামীকে। "সত্যদাস এসেছে !"

"হ্যাঁ। এই মাত্র এল।"

উঠে দাঁড়াল যমুনা। চোখের পলক পড়ছিল না। শেষে বলল, "হঠাৎ তার আসার কী হল ? বেঁচে আছে !"

"দেখছি তো আছে !"

"কিছু বলল ?"

"না। এই তো এল। এখনও কিছু বলেনি। ....একটু চা খেতে চাইছে। ঠাণ্ডা লাগিয়েছে, গলায় ব্যথা।" বলে রঘুনাথ কেমন হাসবার চেষ্টা করল সামান্য, "বলছে মা জননীর হাতের চায়ের কথা সে নাকি ভোলেনি।"

যমুনা খুশি হল না। বিরক্ত হয়েই যেন নিজের মনে মনেই বলল, "মা জননী !... এখন কী করবে লোকটাকে ?"

"দেখি। আগে তো একটু চা দাও। কথাবার্তা বলুক ও। তার পর দেখি—"

যমুনা চলে যাচ্ছিল। বলল, "তুমি কিছু বলো না। ...ও কি রাত্তিরে থাকবে, না, বিদেয় হবে!"

রঘুনাথ মাথা নাড়ল। "এই রাত্তিরে, ঠাণ্ডার মধ্যে আর যাবে কোথায়! থাকতেই এসেছে। কাল হয়ত চলে যাবে।"

"তুমি কিন্তু নিজের থেকে ও-সব কথা কিছু বলবে না। ... ও যদি বলে, বলবে তুমি জান না।"

যমুনা চলে গেল।

নয়

চা খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল সত্যদাসের। আরাম করেই চা খাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কাশছে, ঠাণ্ডা-লাগার কাশি।

রঘুনাথ হাত কয়েক তফাতে বসে।

সত্যদাস নিজেই বলল, "বুকের খাঁচাটি কমজোরি হয়ে গেছে, বাবু। অল্পতেই কাবু করে দেয়।"

"তোমার সেই কম্পজ্বর?"

"ও কি আর ছাড়ে, লেগে আছে।"

"তা তোমার শেকড়বাকড় নিয়ে চলছে কেমন?"

"চলছে মশায়, আগেও যা এখনও তাই। এই দেখুন না—ক'টি শেকড়ের জন্যে পঞ্চকোটে গিয়ে একটি মাস বসে থাকলুম। যেটি চাই সেটি পাই কই। একটি শেকড় আছে বাবু, আমরা বলি যমরিষ্টি, প্রসবকালে মা জননীদের বড় উপকারে আসে। এ আপনার পুরনো শেকড়। পাই কই! একটি আমি যোগাড় করেছি—এতটুকু—" বলে সত্যদাস নিজের ডান হাতের কড়ে আঙুলটি দেখাল।

রঘুনাথ অন্যমনস্কভাবে বলল, "সারা বছরটি তবে ঘুরে ঘুরেই কাটালে?"

"ওটি তো আমার কপালে লেখা। অশ্বমেধের ঘোড়া বাবু, কপালের লিখনটি যে ফেলতে পারি না। ... দিন, একটা বিড়ি দিন।"

রঘুনাথ বিড়ির বদলে সস্তা সিগারেট দিল একটা। বলল, "কাশির মধ্যে ধোঁয়া খাবে?"

"দু তিনটি টান..." বলে সত্যদাস সিগারেট হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। হাসল নিজের মনে। "এটি খেয়ে হাতমুখটি ধুয়ে ফেলি বাবু। রাতটুকু আপনার এখানেই কাটিয়ে যাই। গতবারে বড় সোয়াস্তিতে ছিলাম।

মানুষটি আপনি বড় ভাল। মা জননীও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

রঘুনাথ সারাক্ষণই অস্বস্তি বোধ করছিল। সত্যদাসের কাছাকাছি বসে থাকতে তার অস্বস্তি হচ্ছে, বিরক্তিও লাগছিল। তার কেমন যেন ভয়ও করছে। যথাসম্ভব নিজের অস্বস্তি, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, ভয় সামলে রেখে সে চেষ্টা করে যাচ্ছিল স্বাভাবিক হবার।

রঘুনাথ বলল, "এসেছ যখন তখন রাতটুকু থাকবে বইকি গো। থাকবে। ...তা আমায় বাপু এবার একবার উঠতে হবে। কাপড়-চোপড় পালটাব। একটু পুজোআর্চা.... !"

"আপনি আসুন, বাবু !"

"তুমি বরং ভেতরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নেবে চলো। সাফসুফ হয়ে এখানে এসে বসো। আমি আমার কাজটি সেরে ফেলি।"

সত্যদাস বলল, "চলুন তবে যাই।"

পুজোপাঠে মন বসল না রঘুনাথের। রামায়ণ আর খোলাও হল না।

বিছানায় বসে বসে রঘুনাথ সিগারেট খাচ্ছিল। যমুনা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। কথা বলছিল দু'জনে নিচু গলায়। ঘরের জানলা বন্ধ। দরজার একটি পাট খোলা, অন্যটি ভেজানো। বাতি জ্বলছে একপাশে।

যমুনা বলল, "তুমি কোনো কথাটি বলবে না। সাধ করে পা বাড়াতে যেও না গর্তে।.... তোমার কিসের দোষ। তুমি চোরও নও, বাটপাড়ও নও। চুরি করতে যাওনি তুমি, ছিনিয়েও নাওনি। কে কী ফেলে গেছে, তার দোষ তোমার নয়। তবে ?"

রঘুনাথ বলল, "আমি তো দিনের পর দিন—মাসের পর মাস অপেক্ষাও করেছি ওর জন্যে। ও যদি না আসে আমি কী করব।....আমি তো মানুষ। কতদিন আর ওই সোনা বাক্সে ফেলে রেখে বসে থাকব। ঠিক কিনা বলো ?"

যমুনা আর কী বলবে। স্বামী তার ঠিক কথাই বলছে। সত্যদাস যা ফেলে গিয়েছে সেটা তার দোষে। সে ফেলে-যাওয়া জিনিস নিতে আসেনি মাসের পর মাস, তার কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না যে খোঁজ করবে লোকটার। আত্মীয়জনের কথাও তো বলে যায়নি যে খোঁজ-খবর করা যায়। বাউণ্ডুলে লোকটার কেউ তো নেই।....কোনো দোষ নেই তার স্বামীর। যমুনা বলল, "কোনো কথাই তোমায় আগ বাড়িয়ে বলতে হবে না ওকে। পথে পড়ে থাকা জিনিসের কোনো মালিকানা থাকে না। এ তো আমাদের ঘরে পেয়েছি।"

রঘুনাথ মাথা নাড়ল। বলল, "আমি নিজের থেকে কিছু বলব না।"

"লোকটা মরে গেলেই পাপ চুকতো। আবার এল কেন?"

"আমাদের বরাত।"

যমুনা যেন রাগে জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছিল। বলল, "আমার যা হচ্ছে ॥ শয়তানি করতে এসেছে যেন লোকটা। বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে। পাজি, নচ্ছার। কেন এসেছিস তুই? কে তোকে আসতে বলেছে! আসবি যদি আগে এলেই পারতিস। শয়তান। হাড় হারামজাদা।"

রঘুনাথ আর বসে থাকল না। উঠে পড়ল। সত্যদাস একা বসে আছে দোকানঘরে। বলল, "দুটি খাবার ব্যবস্থা করো তাড়াতাড়ি। ওর কাছে বসে বক বক করতে আমার ভাল লাগছে না। দুটো খাইয়ে দাও। শুয়ে পড়ুক ও। সকালে বিদেয় হবে।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর দোকানঘরে নিজের শোবার ব্যবস্থা করতে করতে সত্যদাস বলল, "এবার আপনার দোকানটি বেশ হয়েছে, না?"

রঘুনাথ তাকাল। সত্যদাস কি কোনো খোঁচা দিচ্ছে? মানুষটা মুখ নিচু করে তার ঝোলা থেকে চাদর বার করছে—মুখ দেখা গেল না ওর।

সত্যদাসই বলল, "দোকানটি বাড়িয়েছেন অনেক। মালপত্তরও রেখেছেন বড় দোকানের মতন। বেশ লাগল, বাবু।"

"ও-ই... যা পারলাম", রঘুনাথ আমতা আমতা করে বলল। তার ভয় হচ্ছিল, সত্যদাস এখুনি বুঝি টাকার কথা তুলবে। জিজ্ঞেস করবে—এত টাকাকড়ি পেলেন কোথায়?

সত্যদাস অন্য কথা বলল, "আপনাদের ঘরটিও সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়েছেন। তখন বোধ হয় আধখানা ছিল, এখন পুরো করে ফেলেছেন। ভাল করেছেন, বাবু! মা জননীর কষ্টটি কমেছে। লক্ষ্মীশ্রী আছে মা জননীর মুখে। উনি সুখী থাকলেই সংসারের সুখ। মশায়, ছোট মুখে, মুখ্যুসুখ্যু মানুষের মুখে বড় কথা মানায় না। তবু বলি—রামচন্দরকে দেখুন। সীতার কপালটি পুড়েছিল বলে বেচারি রাম সারা জীবনটিই দুঃখী থেকে গেলেন।"

রঘুনাথের মনে হচ্ছিল সে যেন কোনো নদীর ধারে ভাঙা পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এখুনি পায়ের তলা থেকে মাটি খসে যাবে, আর অগাধ জলে ডুবে যাবে সে। সত্যদাসের সামনে আর বসে থাকতে সাহস হচ্ছিল না তার। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল। বুকে অস্বস্তি হচ্ছে।

"আমি উঠি গো। সারাদিন দোকান সামলাতে হিমসিম খাই। দুটি মুখে

দিয়ে শুয়ে পড়ব।" রঘুনাথ হাই তুলল তার ক্লান্তি বোঝাতে।

সত্যদাস বলল, "ছিছি, আমার জ্ঞানগম্যি কম বাবু। আপনি আসুন।"

উঠে পড়ল রঘুনাথ। "তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো?"

"না না, কিসের অসুবিধে! এমন আরামটি পাব কোথায়?

"আমি তবে আসি।...কালই কি তুমি— ?"

"একেবারে ভোরে ভোরে। প্রত্যুষ-ভোরেই চলে যাব, বাবু। একটি জায়গায় যেতে হবে।... আমি বড় ঘুমকাতুরে। যদি না উঠতে পারি দয়া করে আমায় ডেকে দেবেন।"

"দেব।"

বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুতে এসে যমুনা বলল, "একটিবারও কথাটি তুলল না গো?"

অন্ধকারেই তাকিয়ে থাকল রঘুনাথ। "না।"

"আশ্চর্য!"

জবাব দিল না রঘুনাথ।

সামান্য পরে যমুনা বলল, "তবে ও জিনিস ওর নয়।"

রঘুনাথ যেন বিরক্ত হল। "কার তবে?"

যমুনা কী বলবে! কথা বলল না। শেষে যেন নিজেদের ভোলাবার জন্যে বলল, "আমার কি মনে হয় জানো! সত্যদাস হয়ত ভাবছে, জিনিসগুলো ও অন্য কোথাও হারিয়ে ফেলেছে। এখানে ফেলে গেছে ভাবলে—একবার অন্তত বলত। ভালই হয়েছে। আমাদের সন্দেহ করল না যখন—আমরা বাঁচলুম।"

রঘুনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "মুখে না বলুক ওর চোখ তো সব দেখল!"

"চোখ অনেক কিছু দেখে! চোখ নিয়েই কি সংসার!"

রঘুনাথ চুপ করে থাকল।

রাত বেড়ে উঠছিল। শীতও বাড়ছে। যমুনা বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল। রঘুনাথ ঘুমোতে পারছিল না।

দশ

একেবারে সদ্য ভোরে সত্যদাস জেগে উঠেছে।

রঘুনাথই তাকে ডেকে দিয়েছে।

গোছগাছ সেরে হাতেমুখে জল দিয়ে সত্যদাস চলে যাচ্ছে দেখে রঘুনাথ বলল, "বাইরে বড় কুয়াশা হে! রোদও এখন উঠল না। বাসী মুখেই চলে যাবে! আর-একটু বসলে তোমার মা জননীর হাতের চা পেতে।"

সত্যদাস বলল, "না, বাবু, আজ আর উপায় নেই। মা জননীকে আমার নমস্কার জানাবেন।" বলতে বলতে সত্যদাস মাফলারটা মাথা কানে জড়িয়ে নিল। তার কপাল, কান, গালের অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে গেল। মুখ দেখা যাচ্ছে না পুরোপুরি।

"আসি বাবু!" বলে দু হাত তুলে নমস্কার জানাল।

দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াল সত্যদাস। রঘুনাথ তার পেছনে। সকালের কুয়াশায় মাঠঘাট ঢেকে আছে। গাছপালা ঘাস হিমে ভেজা।

সামান্য দাঁড়িয়ে থাকল সত্যদাস। তারপর পা বাড়াল।

রঘুনাথ হঠাৎ ডাকল, "সত্যদাস?"

ঘাড় ফেরাল সত্যদাস। তাকাল।

বলতে চাইছে, পারছে না, দ্বিধা অস্বস্তিতে কেমন যেন কথা আটকে যাচ্ছিল, তবু শেষ পর্যন্ত রঘুনাথ বলল, "তুমি কি এখানে কিছু ফেলে গিয়েছিলে আগের বার?"

সত্যদাস তাকিয়ে থাকল। পাতা যেন আর পড়ে না চোখের। শেষে একটু আশ্চর্য হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। চোখ দুটিতেও হাসি লাগল। "কেন বাবু?"

"কী ফেলে গিয়েছিলে?"

এদিক ওদিক তাকাল সত্যদাস। তারপর আকাশের দিকে। মাথা তুলে আকাশের দিকটা দেখাল। "উনি জানেন!"

"উনি? বিধাতা পুরুষ?"

"উনি দিনমণি। দিনটি উনি সাথে করে নিয়ে এসেছেন। উনি অস্ত গেলে আঁধার। রাত্রিটি আসবে। এটি দিন, ওটি রাত। ইনি আলো, উনি আঁধার। বাবু শাস্ত্রে বলে দিন-রাতের এই মিথুন অনন্তকালের। একটি সাদায় আলোয় ভরা, অন্যটি কালোয় আঁধারে কৃষ্ণবর্ণ। এই দুটিরও চক্ষু আছে।"

রঘুনাথ চমকে উঠল। সত্যদাসের রেখে যাওয়া আঙটি দুটির কথা মনে পড়ল। সাদা আর কালো। দুটিরই মূল্য ছিল। রঘুনাথ যে বেচে দিয়েছে দুটি পাথরই। অদ্ভুত এক আতঙ্ক অনুভব করছিল রঘুনাথ। বলতে যাচ্ছিল, তুমি তো ছ'টি মোহরও ফেলে গিয়েছিলে—।

রঘুনাথের মনের কথা যেন বুঝে ফেলেছিল সত্যদাস। কিংবা নিজেই সে মোহরের কথা বলত। মুখের ওপর থেকে কুয়াশার ভিজে ভাবটা মুছে নিতে নিতে সত্যদাস বলল, "বাবু, ওই দিন আর রাতটি অনন্তকাল ধরে মিথুন করছে। আর আমাদের ধরণীটিকে ঘিরে ধরে নৃত্য করে চলেছে ছ'টি ঋতু। দিন-রাত আর ঋতুর অগোচরে কিছু থাকে না মশায়। পাপ নয়, লোভ নয়, অন্যায় অধর্ম—কোনোটিই নয়। এরা সবই দেখে, এদের চক্ষুটির কথা আমরা যেন ভুলে থাকি বাবু। আমাদের সকল দুষ্কর্মই ওঁরা দেখেন।... আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। ধর্মকথা আমার মুখে মানায় না।... আপনার দুঃখটি আমি বুঝলাম। আসি মশায়।" সত্যদাস আবার নমস্কার জানাল হাত জোড় করে। তারপর চলে গেল।

রঘুনাথ দাঁড়িয়ে থাকল স্তব্ধ হয়ে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ধর্মপুরের সত্যদাস যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। রঘুনাথের চক্ষুদুটি জলে ভরে উঠেছে তখন।

কাম ও কামিনী

কাঁঠাল কাঠের বাক্সটা থেকে বাসনপত্র নামিয়ে নিচ্ছিল বিজলি। অ্যালুমিনিয়ামের বড় হাঁড়ি, ডেকচি, গামলা, কলাই করা দুটি বড় বড় বাটি, জলের মগ বার করে পায়ের কাছে নামিয়ে রেখেছে, রেখে ভাবছিল আর কী কী বার করে রাখবে এখন। কাল খানিকটা সকাল সকালই বেস্পতির আসার কথা। মেয়েকে নিয়েই আসবে হয়ত। এইসব বাসনপত্র ধোয়াধুয়ি আছে। সবই সস্তার বাসন, কাজ-চলা গোছের ; ধীরেসুস্থে না মাজলে ফুটোফাটা হয়ে যাবে। গতবছর একটি ডেকচি এইভাবেই ঝাঁঝরা হয়েছে।

এমন সময় শব্দ পাওয়া গেল বাইরে।

বিজলি বুঝতে পারল—টেম্পুর শব্দ ; শিবপদ ফিরল।

মানুষটার ফেরার কথা বিকেল-বিকেল ; ফিরল এতক্ষণে, সন্ধে পেরিয়ে। বিজলির রাগই হচ্ছিল। শিবপদর এই রকমই স্বভাব। আলগা পেল কি চরে এল। বোধসোধও কম। এখন কার্তিক মাস। মাস শেষ হতে চলল। বিকেল ফুরোতেই আঁধার নামে, আর আঁধারটি নামল কি সন্ধে। চোখের পলকেই রাত। এতটা দেরির কোনো কারণ নেই শিবপদর। যাবে শহরে, মালপত্র কিনবে কিছু, ফিরতি ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরবে। রেল স্টেশন থেকে দুটি-একটি ছেলের মাথায় মোট চাপিয়ে বাড়ি ফিরবে। সন্ধে হয়ে গেলে কেউ আর আসতে চায় না। এলেও বেশি বেশি পয়সা নেয়।

তিনশোটি টাকা নিয়ে মানুষটি বেরিয়ে গিয়েছে সকাল-সকাল। আর ফিরল এতক্ষণে।

"দেখ তো। তোর বাপ বুঝি ফিরল। রাতটুকু কাটিয়ে এলেই পারত।

ঘরের অন্যপাশে চওড়া তক্তপোশ। বিছানা গোটানো রয়েছে, শুধু সতরঞ্চিটি পাতা। তক্তপোশের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, দু'গালে দুটি হাত

রেখে গান শুনছিল ফুল্লরা। রেডিওর গান। এটি সে সদ্য পেয়েছে। বাঁকড়োর অবনী ছোঁড়া দিয়ে গিয়েছে। দোষ তো মেয়েরই। অবনী এলেই হ্যাংলামি করত। শেষমেশ অবনী এটি দিয়ে গেল। বিজলি বলেছিল, এটি তুমি কেন করলে অবনী, আমাদের গরিব ঘরে এসব মানায় না। শুনে অবনী হেসে বলল, মাসি, আজকাল মুচি-মেথরেও রেডিও বাজায়। পানঅলাতেও এখন দোকানে বসে রেডিও বানায়—এটি ওটি লাগায় জোড়ে আর পানের খিলির মতন এগিয়ে দেয়। খুব সস্তা মাসি....। বলে অবনীর কী হাসি।

বিজল বোঝে সবই। ছোঁড়ার টানটি যে ফুলুর ওপর।

মেয়েরও কাণ্ডটি বেশ। ওই যন্তরটি যেদিন থেকে পেল—সেদিন থেকেই পোষা বেড়াল ছানার মতন কোলে কোলে নিয়ে ঘুরছে। সারাক্ষণ শুধু গান আর যাত্রা থিয়েটার শোনা।

কথাটা বোধ হয় কানে যায়নি ফুল্লরার।

বিজলি মেয়ের দিকে তাকাল। উপুড় হয়ে শুয়ে, পা দুটি ছাদের দিকে তোলা, সমানে পা নাচিয়ে চলেছে। শাড়ি সায়া নেমে এসেছে হাঁটুর কাছাকাছি। গোছ দুটি বেশ পুরন্ত হয়ে গিয়েছে ফুলুর। তা বয়েস তো ষোলো পেরিয়ে গেল মেয়ের। গা বুক সবই ভরে এসেছে।

বিজলি আবার বলল, "কিরে ? কানে কথা যায় না ?"

মায়ের ধমক খেয়ে ফল্লুরা রেডিও বন্ধ করে উঠে বসল। কাপড় গুছোলো।

"দেখ, তোর বাপ বুঝি এল। টেম্পুর শব্দ পেলাম।"

ফুল্লরা উঠে দাঁড়াল। বিরক্ত। বেশ গান শুনছিল একটা, বন্ধ করে দিতে হল। তা ছাড়া ওই "তোর বাপ"—শব্দটা তার ভাল লাগে না সব সময়। কানে অবশ্য সয়ে গেছে। বছরের পর বছর শুনলে কার না সয়ে যায়। তবু মাঝেসাঝে কখন যে কথাটা তার কানে লাগে—কেন লাগে সে জানে না।

ফুল্লরা চলে গেল।

এই রাস্তাটা টেম্পু যাবার রাস্তা নয়। দৈবাৎ যদি ছিটকে আসে। তবে বিজলির মনে হল, মোট বোঝা নিয়ে ফেরার সময় শিবপদ বোধ হয় কোনো টেম্পু পেয়ে গিয়েছিল। যাচ্ছে সাতুড়িয়া কিংবা মনসাচকের দিকে—সামান্য ঘুরপথে এসে শিবপদকে নামিয়ে দিয়ে গেল। এরকম হয়। দু-তিনটি টাকা বেশি লাগে অবশ্য।

তবে আর তো দুটি দিন। তারপর এই রাস্তার সামান্য তফাত দিয়ে গাড়ি

যাবার শেষ থাকবে না। টেম্পু, ভ্যান, রিকশা, গোরুর গাড়ি—কত কী যাবে। এখন থেকেই দিনের বেলায় দুটি একটি করে যেতে শুরু করেছে। এই রাস্তাটি ধরে অবশ্য পিল পিল করে লোকজন যায় না। লোকের আসা-যাওয়া, ভিড় ওই ধুতুরিয়ার দিক থেকেই। নদীর সাঁকো পেরিয়েই আসো, আর হাঁটুজল কি বালি মাড়িয়েই আসো—ওদিক দিয়েই আসা সুবিধের। ও পাশেই কত গ্রাম গঞ্জ, ইট-কারখানা। বিজলি শুনেছে,—এখন থেকেই নদী পেরিয়ে অনেক দোকানি, কারবারি এসে গিয়েছে মেলার মাঠে। প্রতিবারেই যায়।

বিজলি বাক্সর ডালা বন্ধ করব কি করব না করে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল পায়ের শব্দ পেল।

শিবপদ ঘরে এল।

মানুষটির দিকে তাকাল বিজলি। কয়েক পলক তাকিয়েই বুঝল, শিবপদ নেশা করেছে। বিজলির কাছে এটি নতুন কিছু নয়। শহরে গেলে শিবপদ খানিকটা নেশা না করে ফেরে না। এক-আধবার যে নেশায় চুরচুরে হয়ে জামা হারিয়ে কপাল ফাটিয়ে কাছা খুলে বাড়ি না ফিরেছে এমনও নয়; তবে সে ন'মাসে ছ'মাসে একদিন। তেমন নেশা শিবপদ করেনি। চোখমুখ খানিকটা ছলছলে, পানের রস ঠোঁট গড়িয়ে থুতনি পর্যন্ত নেমে এসেছে প্রায়—ওই যা চোখে পড়ে, তার বেশি কিছু নয়। পুরোপুরি হুঁশে আছে লোকটা।

শিবপদ বলল, "দুটি বাবু-ভদ্রলোক নিয়ে এলাম গো!" এমন করে হেসে হেসে বলল ব্যস্তসমস্তভাবে যেন খুব বড় একটা কাজ করে এসেছে।

বিজলি তখনও অন্যমনস্ক; খেয়াল করে কথাটা শোনেনি। শহরে গিয়ে শিবপদ টাকাগুলো কি শুঁড়িখানায় নষ্ট করে এল! কত টাকা? অত কষ্টের টাকা কি এইভাবে উড়িয়ে আসার জন্যে দিয়েছিল সে শিবপদকে! বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নেশা করেছে!

শিবপদ বলল, "আলোটি দাও। চাবিটি দাও। বাবুদের আগে বসিয়ে আসি। তারপর বলছি।"

এবার বিজলির খেয়াল হল। বলল, "কাকে জুটিয়ে এনেছ?"

"দুটি ভদ্দরলোক বাবু...!"

"শুঁড়িখানা থেকে নিয়ে এলে ধরে?" বিজলি রুক্ষভাবে বলল।

শুঁড়িখানা থেকে!....তুমি যে কী বলো, বিজু!" শিবপদ এমন হায়-হায় মুখ করল, যেন বলল—হায় গো, একি একটা কথা হল।

বিজলি বলল, "কাকে নিয়ে এসেছ? ওরা কোন জাতের ভদ্দরলোক?"

শিবপদ দু-পা এগিয়ে এসেছিল। বলল, "তোমার মাথাটি খারাপ করো না। বলছি তো ভাল জাতের ভদ্দরলোক।... দাও চাবিটি দাও ঘরের, একটি আলো দাও। বাবুদের বসিয়ে রেখে আসছি।"

ফুল্লরা ফিরে এল।

মেয়েকে দেখল বিজলি। যেন কিছু বোঝার চেষ্টা করল। "কারা এসেছে রে ?"

"দুটি লোক দেখলাম।"

"কেমন লোক ?"

ফুল্লরা বুঝতে পারল না কী জবাব দেবে। পরে বলল, "এমনি লোক। ধুতি জামা পরা। একজনের গলায় চাদর ঝুলছে। সুটকেস বিছানা নামানো রয়েছে নিচে।"

শিবপদ বিজলিকে বলল, "আহা, আমি বলছি ভদ্দরলোক, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না।....দে ফুলু, একটি লণ্ঠন দে। চাবিটি নিয়ে আয় তুই।"

একটি লণ্ঠন কাঠের বাক্সর কাছে জ্বলছিল। অন্যটি ঘরের কোণে একপাশে রাখা।

ফুল্লরা লণ্ঠন এনে দিল।

শিবপদ লণ্ঠন ঝাঁকিয়ে একবার দেখে নিল তেল আছে কি না! দেশলাই বার করে কাঠি জ্বালাল। দুটি-তিনটি নষ্ট হল কাঠি। বাতি জ্বালিয়ে নিল শেষ পর্যন্ত।

"চাবি নিয়ে আয় তুই—, আমি চলি। অন্ধকারে কতক্ষণ আর দাঁড় করিয়ে রাখব বাবুদের।"

চলে গেল শিবপদ।

বিজলি মেয়ের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করবে কি করবে-না করে শেষে বলল, "লোক দুটি কেমন দেখতে। বয়েস কত ?"

ফুল্লরা বলল, "ভদ্দরলোকের মতন দেখতে। বুড়ো নয়, বুড়ো-বুড়ো।"

বিজলি কী ভেবে বলল, "যা চাবি দিয়ে আয়। তোর বাপকে বলবি ঘর পরিষ্কার নেই।...কুলুঙ্গির ওখানে চাবি আছে, নিয়ে যা ঝাঁটপাট হয়নি, ধুলোময়লায় ভরা, আর এখনই তোর বাপ লোক এনে তুলল। কাল সব ধোয়ামোছা করাতাম। ওইভাবেই থাকুক আজ—রাত্তিরে তোকে ঘর ঝাঁট দিতে হবে না। বলবি—কাল সকালে হবে।"

কুলুঙ্গি থেকে চাবি নিয়ে চলে গেল ফুল্লরা।

বিজলি দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য। তারপর ডালা বন্ধ করল বাক্সের। বাসনগুলো সরিয়ে রাখল একপাশে।

সামান্য বুঝি আলসেমি লাগছিল। সারাদিনই কাজ সারছে দশরকম। এবার একটু জল খাবে, পান খাবে।

জল খেয়ে পান মুখে দিয়ে বিজলি তক্তপোশে গিয়ে বসল।

দক্ষিণের জানলাটি খোলা। জানলার বাইরে দু-দশ হাত ফাঁকা জমি। গাছপালা। শিউলি ফুলের গন্ধ আসছে মাঝে মাঝে। কার্তিক মাসের শেষেও এই বারোমেসে শিউলি গাছটির ডালপালা ফুলে ফুলে ভরা থাকে। গন্ধটি অবশ্য সামান্য মিয়োনো। জানলার ওপাশে জ্যোৎস্না ছড়ানো। আজ দ্বাদশী। দু'দিন পরেই কার্তিক পূর্ণিমা। কার্তিক পূর্ণিমায় কাম-কামিনীর মেলা। মেলাটির বড় নামডাক। দশ থান থেকে লোক আসে। এ-পাশে ওই একটিই বড়সড় মেলা। আর বৈশাখ মাসে যে-মেলাটি বসে তাকে বলে শিবের মেলা। সেটি বসে অন্যখানে, দাহড়া গাঁয়ের সামনে পুরনো শিবমন্দিরের কাছে।

বৈশাখের মেলাটির জন্যে বিজলিরা দিন গুনে বসে থাকে না। দশ বিশ জন এল তো এল, না এলেও বলার কিছু নেই। কিন্তু এই কার্তিক পূর্ণিমায় কাম-কামিনীর মেলার জন্যে সারাটি বছর তারা যেন হাঁ করে চেয়ে থাকে। সম্বৎসরে এই একটিবার বাড়তি কিছু টাকার মুখ দেখতে পায়। কপাল ভাল হলে, চার-পাঁচ দিনে আয়-পয় মন্দ হয় না। হাজার দুই তিন টাকাও থেকে যায়।

আজ সাত আটটি বছর বিজলিরা এখানে। শিবপদ আগে কাজ করত চিনেমাটির খাদে। লোকে বলত 'গুদামবাবু'। রঘুনাথপুরের কাছে খাদ। পুকুর কেটে মাটি তোলা হত। কাদার মতন দেখতে। খাদ বন্ধ হয়ে গেল। মাস দুই-তিন কাজকর্মের খোঁজে খোঁজে কাটল শিবপদর। তারপর তার এক পিসি তাকে ডেকে নিল এখানে। এই জায়গাটার নাম অবশ্য তুঁতেপাড়া। পিসির কিছু জায়গাজমি ছিল মাথা গোঁজার। একটা চালাও ছিল। পিসি বিধবা। নিজের কেউ নেই। শিবপদকে নিজের গরজেই ডেকে নিয়েছিল পিসি। তার তখন মরণদশা ঘনিয়েছে। দেখাশোনার কেউ নেই। বিজলি এসে পিসিকে ছ'টি মাসও দেখাশোনা করতে পারল না, মারা গেল পিসি। বিজলিকে যে পছন্দ করেছিল বুড়ি তা নয়, নিজের দায় বুঝে মেনে নিয়েছিল। মুখ খারাপ করে কথা বলত বিজলিকে, ফুলুকেও ছাড়ত না সেই বুড়ি। তা

পিসি চলে যাবার পর শান্তি হল। স্বস্তিও পেল শিবপদ।

পিসির দয়ায় অবশ্য শিবপদ মাথা গোঁজার এই জায়গাটি পেয়ে গেল। জায়গাটি খারাপ নয়। ইটের গাঁথনি করা বাড়ি, মাথায় টালির ছাদ। দুটি ঘরের গায়ে কাঁচা বারান্দা। কাঠকুটোর বেড়া-দেওয়া খানিকটা জমি বাড়ির লাগোয়া। একটি পাতকুয়ো।

শিবপদ এখানে একটি দোকান দিল প্রথমে। চা, আলুর দম, ঘুগনি, হাতরুটি, পানবিড়ির। এই পথ দিয়ে লোকজনের আসা-যাওয়া ছিল তখন। ছোট ধোপানিতে রঙ কারখানা চালু ছিল ঘটকবাবুদের।

দোকানটি চলছিল ভালই। শিবপদ দোকান সামলাত, বিজলি রান্নাবান্না জোগাত। তিন-চার বছরেই ঘরদোর মেরামতি হল ধীরেসুস্থে। ঘরের লাগোয়া জমিতে ফলফুলুরি ফলতে লাগল। কাছেই এক ডোবা পুকুর। বিজলি হাঁস পুষল।

ঘটকবাবুদের রঙ কারখানা উঠে গেল হুট করে। শিবপদ মুখ শুকিয়ে বসে থাকল মাস কয়েক। বিজলিদের পেট চলছিল ঠিকই—কিন্তু দোকান তো উঠে যাবার জোগাড়। পথচলতি দু-দশজন ছাড়া আর খদ্দের পায় না।

বরাত ফিরল বছরখানেক পরে। ঘটকবাবুদের রঙ কারখানার ঘরবাড়ি জমিজায়গা কিনে নিয়ে এক বাবু দড়ি কারখানা চালু করল, আর রেল ইস্টিশানের ওপারে কাঠকল খুলল এক মাড়োয়ারি। মরা দোকান আবার খানিকটা জাগল। কিন্তু অসুবিধে থাকল একটু। এই রাস্তাটাকে বাঁয়ে ফেলে নতুন এক মেঠো পথ ধরল অনেকে। তাদের সুবিধের জন্যে। তা শিবপদর দোকান তাতে বন্ধ হল না।

বিজলি নিজে কম বুদ্ধি ধরে না। চা আলুর দম নিয়ে বসে থাকলে কি চলে? দু-পাঁচটি কি দশটি লোক একগ্লাস চা খেল, কি একপাতা আলুর দম, দুটি রুটি—তাতে আর কত হয় সারাদিনে। পান বিড়িতেই বা ক'পয়সা থাকে।

বিজলি ভাতডাল তরকারির ব্যবস্থা করল। দোকানের নাম হল, 'তারাময়ী ভাতের হোটেল'। তারাময়ী শিবপদর মায়ের নাম। বিজলি তাকে চোখে দেখেনি। তা না দেখুক, নামটিতে শিবপদর মা থাকল, আবার ঠাকুর-দেবতারও নাম হল।

এইভাবেই চলতে চলতে বিজলি আর শিবপদ পরামর্শ করে বাড়ির গায়েই—সামান্য তফাতে দুটি ঘর তুলল। ইটের গাঁথনি, মাথায় খাপরার ছাদ। ঘর দুটি তারা ভাড়া দিতে লাগল। যে যখন আসে।

বৈশাখের শিবমেলায় বড় একটা ঘর ভাড়া নেয় না কেউ। নিলেও ব্যাপারিরা কেউ কেউ নেয়। কিন্তু কার্তিকের এই কাম-কামিনী মেলায়, ঘর ফাঁকা থাকে না, তারাময়ী হোটেলের ভাত-ডালের হাঁড়ি, তরি-তরকারির গামলাতেও অবশিষ্ট পড়ে থাকে না কিছুই।

এই সময়টায় স্টেশন দিয়ে যারা আসা-যাওয়া করে—তারা দুটি ডাল-ভাতের জন্যে তারাময়ী হোটেলে ভিড় করে। অনেকে থাকার একটু জায়গা খোঁজে। কার্তিক মাসের হিম লাগিয়ে তো মাঠেঘাটে পড়ে থাকা যায় না।

জায়গা অবশ্য দিতে পারে না বিজলিরা। ওই দুটি ঘর যদি খালি থাকে, নাও ; না থাকলে আর কিছু করার নেই তাদের। ঘর না দাও—বারান্দাটুকুতে একটি-দুটি রাত থাকতে দাও। বিজলিরা বারণ করে, তবু দু-একজন কথা মানে না ; থেকে যায়।

সেই কাম-কামিনীর মেলা এসে পড়েছে। আর মাত্র দুটি দিন।

বিজলিকে সবই গুছিয়ে নিতে হচ্ছিল। শিবপদকে শহরে পাঠিয়েছিল মালপত্র কিনে আনতে। তেল, বনস্পতি, ডাল, মশলা, আধবস্তা আলু, চা, চিনি, গুঁড়ো দুধ—এই রকম সব। শিবপদ মালপত্র বয়ে আনবে শহর থেকে। আর বিজলি ব্যবস্থা সেরে নিচ্ছে এদিককার। বাক্স থেকে তুলে রাখা হাঁড়িকুড়ি নামিয়ে নিচ্ছে, ধোয়াধুয়ি করাবে বাসানগুলো। একটা উনুন পাতিয়েছে আজ। পরশু থেকে দুটি লোক আসবে হাঁড়ি ঠেলতে। কার্তিক আর নবতারা। কার্তিক হল ঠাকুর, নবতারা জোগানদার। ধোয়াধুয়ি, মশলাবাটা সব নবতারা। কুটনো কোটার কাজটা বিজলিই করে দেয়।

তা আজই দেখ, শিবপদ দুটি লোক নিয়ে এসে হাজির হল।

দুই

বাইরে থেকে দুটি লোক ধরে আনলেই কি আর দায় ফুরোয়। শিবপদকে অনেকটা সময় ব্যস্ত থাকতে হল। কোথায় ঘর পরিষ্কার, আলো, শোবার ব্যবস্থা, দুটি মুখে দেবার জোগাড়-যন্তর সবই করতে হল একে একে।

বাবুরা একটি দিন পরে এলে রাত্তিরের এই খাটাখাটুনি বাঁচত। কাল সকাল থেকেই সব পরিষ্কার হত, ঘরদোর ; জলের কলসি থাকত বারান্দায়, ধোয়া-মোছা লণ্ঠন পেত বাবুরা। অসময়ে এসে পড়ায় অসুবিধে তো কিছু হবেই।

শিবপদ যতটা পারল নিজের হাতে করল, মেয়েকে দিয়ে করিয়ে নিল।

বিজলি দুটি রুটি তরকারির জোগাড় করে দিল।

কাজকর্ম মিটিয়ে শিবপদ কাপড় বদলাল। হাত-মুখ ধুয়ে খাবার পাট চুকিয়ে ঘরে এসে বসল যখন—তখন রাত হয়েছে।

বিজলিও এল।

এই ঘরটা শিবপদর। পাশের ঘরে থাকে বিজলি আর তার মেয়ে ফুল্লরা।

ঘরটি শিবপদর হলেও ঘরের ছ'আনাই তারাময়ী হোটেলের ভাঁড়ারে ভরতি। তাতে কোনো অসুবিধে হয় না তার। তবে এখন ক'দিন ঘর খানিকটা আগোছালো থাকবেই। বস্তা ঝুড়ি টিন শালপাতা—কোন্‌টাই বা ঘরে না রেখে বাইরে রাখা যায়! বিজলির ঘরেরও একই অবস্থা। শিবপদর ইচ্ছে আছে, টাকাপয়সা জমাতে পারলে এ-বছরেই একটা বাড়তি ঘর করবে, ছোট ঘর, ভাঁড়ার রাখার। আর হোটেলের খাওয়া-দাওয়ার জায়গাটি একটু ঘিরে নিয়ে বসার ব্যবস্থাটি পালটে দেবে।

শিবপদ বিছানায় বসে বসেই বিড়ি ধরিয়েছে, বিজলি এল।

শিবপদ হেসে বলল, "ফর্দটি মিলিয়ে নিতে এসেছ" বলে চোখের ইশারায় ঘরের কোণে রাখা বস্তা আর ঝুড়ি দেখাল।

বিজলি বলল, "না। কাল দেখে নেব।... টাকা ফেরত আছে?"

মাথা নাড়ল শিবপদ। বলল, ফেরত আর কোথা থেকে থাকবে, জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে, বল্লভবাবুর দোকানে বরং চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা কর্জ থেকে গেল। তবে হ্যাঁ—শিবপদর একটি কাজ হল না—তার মহাভারতটি বাঁধাতে দিয়েছিল—পনেরো টাকা খরচ চাওয়ায় আনা হল না এবার।

বিজলি বলল, "শুঁড়িখানায় কত খরচা হল?"

শিবপদ হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে দু'হাতের বুড়ো আঙুল নাড়িয়ে বলল, "একটি পয়সাও নয়?"

বিজলির বিশ্বাস হল না। শুঁড়িখানা কি মাগনার কারবার করে যে শিবপদকে বিনি পয়সায় মদ গিলিয়েছে। বল্লববাবুর দোকানে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা কর্জ কি এমনিতেই হল।

শিবপদ বিড়িতে টান মেরে হাসি-হাসি চোখে চেয়ে থাকল। তারপর বলল, "বাবু!"

বুঝে নিল বিজলি। বাবুরা শিবপদকে মদ গিলিয়েছে। তবে তো ঠিকই ধরেছিল সে, শুঁড়িখানা থেকেই দুটি ইয়ার-বন্ধু ধরে এনেছে শিবপদ।

বিজলি বিরক্ত হয়ে বলল, "তবে তোমার শুঁড়িখানার ইয়ার ও-দুটি ?"

কথাটা শোনামাত্র শিবপদ জিব কেটে মাথা নাড়তে লাগল। "ছি ছি, ওঁদের তুমি ইয়ার বলছ কী! কোথায় ওঁরা আর কোথায় আমি! ওঁরা হলেন ভদ্দরলোক, উঁচু কেলাসের মানুষ। আমি ভাত-বেচা শিবু ঘোষ। ওঁদের নখের যুগ্যি নই আমি! বাবুরা আমার ইয়ার হবেন কেমন করে!"

"তাহলে শুঁড়িখানায় তোমায় মদ গেলাবেন কেন ?"

শিবপদ হাসতে হাসতে বলল, "শুঁড়িখানা বলো না। শাসমলবাবুর দোকান। সেখানে সবাই যায় গো বিজু! ভদ্দরলোক, ছোটলোক, থানার বাবু, পুরুতঠাকুর, স্কুলের মাস্টার, মেথর মুদ্দাফরাস মায় দু-একটা হিজ্জরে মাগী..."

বিজলি বলল, "বুঝেছি। তা ওই বাবুরা কে ?"

"দেখোনি তুমি ?"

"না।"

"ফুলু দেখেছে।"

"দেখুক। ....ওরা কে ?"

"একজনের নাম কুঞ্জবাবু! কুঞ্জলাল মুখুজ্যে। বামুন মানুষ। কুলিন গো! বাবুটিকে দেখতে একেবারে জমিদার রাজাবাবু গোছের। এখন বটে রাজপুত্তুর বলা যাবে না। বয়েস হয়ে গিয়েছে।"

বিজলি কিছু বলল না। শিবপদর দিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টে। মেয়ের মুখেও বিজলি শুনেছে, একটি বাবু নাকি খুব সুন্দর দেখতে। জোয়ান নয়, আবার বুড়োও নয়। মেয়ে অবশ্য নাম বলেনি। জানত না।

শিবপদ বলল, "অন্য বাবুটির নাম সহদেব। বাবু তামাশা করে বলেন সহচর। সহদেববাবুর দেখতে খারাপ নয়, তবে বাপু কুঞ্জবাবুর মতন কার্তিকও নয়। উনি বেশ কালো-কালো দেখতে। চোখটি মুখটি ভাল। বাবু বলেন, "শালা আমার ছায়াসহচর হে। পিছু লেগে আছে। এঁটুলি।"

"কী করেন ওঁরা ?"

বিড়ি ফেলে দিল শিবপদ টিনের কৌটোয়। ডাকল বিজলিকে। বিছানায় এসে বসতে বলল।

বিজলি কাছেই ছিল। কী মনে করে বিছানার একপাশে গিয়ে বসল।

শিবপদ বলল, "করবেন কী! টাকা থাকলে কে আবার তোমার-আমার মতন ভাতের হোটেল খোলে বিজু!" বলেই একটু চুপ করে থেকে মুখটি বিমর্ষ করে বলল আবার, "আর করবেই বা কী! অন্ধ মানুষ।"

বিজলি তাকিয়ে থাকল। "অন্ধ মানুষ?"

"জন্মান্ধ নয়। পুরো অন্ধও নয়", শিবপদ দুঃখের গলায় বলল, "এককালে সবই দেখতেন—তোমার আমার মতন। বড় বড় দুটি চোখে প্রখর দৃষ্টি ছিল। বাবু বলেন—শিকারির নজর, অন্ধকারেও তাঁর চোখদুটি জ্বলত। তারপর একটু একটু করে দৃষ্টি ক্ষীণ হতে লাগল। দু-পাঁচ বছরে বেশ বোঝা গেল নজরটি কমে গেছে। চশমা পরতেন তখন। বছর বছর কাচ পালটাতে পালটাতে একসময় নাকি দৃষ্টি একেবারেই টিমটিমে হয়ে গেল। ডাক্তার বদ্যি বাদ গেল না। যে যা বলল, ওষুধপত্তর লাগালেন। এখন উনি দিনের বেলায় ঝাপসা একটু দেখেন। আঁধার হয়ে গেলে—একেবারে অন্ধ।"

বিজলি মন দিয়ে শুনছিল। চুপচাপ থাকার পর বলল, "ছানি পড়েছে চোখে?"

"উনি বলেন, না—ছানি পড়েনি। ডাক্তারেও বলেনি ছানির কথা।"

"তবে?"

"তবেটি তো ধরা যাচ্ছে না।"

বিজলির মুখের পান ফুরিয়ে গিয়েছিল। মুখের মধ্যে জিব বুলিয়ে যেন শেষ স্বাদটি মাখিয়ে নিল। শেষে বলল, "তা অন্ধ মানুষটি এখানে কেন?"

শিবপদ হাই তুলল বড় করে। মাথাটি সামনে পিছনে ঝাঁকাল। তারপর বলল, "কাম-কামিনীর মেলায় এসেছেন।"

বিজলি অবাক। ক'মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, "অন্ধ মানুষ কাম-কামিনীর মেলায়!"

শিবপদ মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, "উনি এসেছেন চক্ষু দুটি চাইতে গো। বললেন, শুনি—তোমাদের মনসা পাহাড়ের মাথায় যে মন্দিরটি আছে, সেখানের বিগ্রহটি বড় জাগ্রত—তিনি নাকি মানুষের মনস্কামনা অপূর্ণ রাখেন না। আমার প্রার্থনাটি ওঁকেই জানাব। চক্ষু দুটি ফিরে চাইব। এমন করে অন্ধ হয়ে আর বাঁচতে পারি না।"

বিজলি চুপ করে থাকল।

শিবপদ নিজেই বলল, হাই তুলতে তুলতে, "বাবুর সহচরটি সব জানে গো, বিজু?"

"কী জানে?"

"এই মেলার কথা। মনসা পাহাড়ের কথা।"

বিজলি বলল, "সহচরটিই তবে এনেছে?"

মাথা হেলাল শিবপদ। "মনে তো তাই হল। তবে বাবু নিজেও আসতে পারেন। স্বভাবটি জেদি মনে হল। একরকথার মানুষ।"

বিজলি এবার উঠে দাঁড়াল। নিজের ঘরে যাবে। "ঘর তো দিলে বাবুদের। টাকাপয়সার কথা হয়েছে ?"

শিবপদ হাত বাড়াল। "উঠলে কেন ? একটু বসো। সবটুকু শুনে যাও।....টাকাপয়সার কথা না বলে কি আনি বাবুদের। দুটি ঘর বাবদ বারোটি টাকা। দু'বেলার খাওয়া-দাওয়া মাথাপিছু দশ টাকা। চা জলখাবার আলাদা। লণ্ঠনের তেল বাবদ একটি টাকা। ....নাও এবার হিসেবটি করো... জুড়েমুড়ে তুমি চল্লিশটি টাকা পাবে রোজ। কম হল ? পঞ্চাশ হলেও বাবুরা থেকে যেতেন। পয়সার তো অভাব নেই।"

বিজলি যেন বোকার মতন শিবপদকে দেখতে লাগল। দিনে চল্লিশ টাকা দু'জনের জন্যে। মানুষটার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। পঁচিশটি টাকার বেশি তাদের পাবার কথা নয়। গতবছর থেকে ঘরভাড়া হয়েছে তিনটি টাকা। আগের বছর ছিল দুই। শিবপদ তিনকে ছয় করে দিল। আর ডালভাত রুটি তরকারি সবজির ঘেঁট-এর জন্যে পাত প্রতি পাঁচটি টাকা নেয় না বিজলি। মাপের ভাত-রুটি নিলে তিন টাকা। বাড়তি হলে অন্য হিসেব। শিবপদ খাওয়ার টাকাও বেশি নিচ্ছে। চা-জলখাবার আলাদা...। বিজলির মনে হল, শিবপদ ওই বাবু দুটিকে হাতে পেয়ে দু'পয়সা বেশি কামিয়ে নেবার মতলব ফেঁদেছে।

বিজলি বলল, "তুমি কি ডাকাতি করছ নাকি ?"

শিবপদ হাসল। বলল, "আমি কেন ডাকাতি করব। জিনিসপত্তরের দাম যা বেড়েছে। আর আমাদের তো এই দু-পাঁচটি দিনের বাড়তি কামাই। বাবুদের ওপর নজর রাখার দাম নেই ? তোমার মেলার মানুষ হলে দুটি টাকা কম হত বটে। তবে কি না তাদের আর কে খাতির যত্ন করত। গোরুছাগলের মতন পড়ে থাকত আর চরে খেত। এই বাবুদের চারটি বেলা খাতির যত্ন করতে হবে আমাদের। টাকা বেশি নিচ্ছি না, ন্যায্যটি নিচ্ছি।"

বিজলি আর দাঁড়াবে না। চলে যেতে যেতে বলল, "বাবুদের বুঝি অনেক টাকা ?"

শিবপদ বলল, "কানে কানে একটি কথা বলে নিই—শুনে যাও।"

বিজলি দাঁড়াল। দেখল শিবপদকে। ফিরে এল।

শিবপদ বিজলির কানে কানে কথা বলল না। তবে নিচু গলায় বলল

কিছু।

তিন

সকালে বাবুদের দেখল বিজলি। সামনাসামনি গেল না ; তফাত থেকে দেখল।

বিজলিদের ঘরদুটি পুবদিকে। পেছনে খানিকটা বাগান, গাছপালা। বাড়ির সামনে বারান্দা, পাকা উঠোন। তারপর ডানহাতি একটি চালা গোছের। সেখানেই শিবপদর দোকান। তারাময়ী হোটেল। একপাশে চা মুড়ি পানের ব্যবস্থা, অন্যদিকে ছোট ভাঙা বেঞ্চি আর নড়বড়ে এক কাঠের তক্তা পেতে হোটেলের খাবার ব্যবস্থা। রান্নাবান্না হয় ভেতর দিকে—বিজলিদের রান্নাঘরের গায়ে গায়ে। সারা বছর এই ব্যবস্থাটিই থাকে—শুধু এখন এই ক'দিন একটি ছেঁড়া-ফাটা তেরপল মাথার ওপর টেনেটুনে ছড়িয়ে নিয়ে ইটের উনুন পেতে রান্নাবান্না হয়। নয় নয় করেও ভাত-রুটি খাবার লোক জোটে জনা চল্লিশ—দিনের বেলাতেই জনা পঁচিশ ত্রিশ। রাত্রে কম।

ভাঁড়ার ঘর দুটি এখান থেকে সরাসরি চোখে পড়ে না। খানিকটা আড়াল পড়েছে। উত্তরদিকে মামুলি দুটি ঘর। ছোট, লম্বাটে। বিজলিদের ঘর আর ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে গাছপালার আড়াল। কলকে ফুলের ঝোপ, একটি পেঁপে গাছ, কাঠগোলাপ।

বিজলি সকালে বাসনপত্র বার করে দিচ্ছিল বেস্পতিকে। ধোয়াধুয়ি করতে হবে। কুয়াতলায় গিয়ে বসবে বেস্পতি মেয়েকে সঙ্গে করে।

কাল উনুন পাতা হয়েছে উঠোনে। শুকিয়ে এসেছে বারোআনাই। বিজলি ভাবছিল বিকেল নাগাদ উনুনটি ধরিয়ে একবার দেখে নেবে ঠিকমতন আঁচ উঠছে কিনা।

এমন সময়, কুয়াতলার দিকে যেতে গিয়ে তার নজরে পড়ল বাবুটিকে।

বাবু বাইরে দাঁড়িয়ে। খানিকটা ছায়ায়।

বাবুর পরনে সাদা লুঙ্গি ; চেক কাটা। গায়ে পুরো-হাতা গেঞ্জির ওপর হাতকাটা সোয়েটার। গলায় একটি হার। সোনার বিছেহার। মাথার চুলগুলি সাদা। চোখে চশমা।

বাবু সিগারেট খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতের ক'টি আঙুলে আংটি আছে বিজলি বুঝতে পারল না। হয়ত চারটি আঙুলেই আছে।

ওই বাবুটিই তবে কুঞ্জবাবু।

বিজলি এতটা তফাত থেকেও বুঝতে পারছিল—নজরে লাগার মতনই

চেহারা। যেমন গায়ের রং, তেমনই গড়ন।

বাবুটির কিন্তু বয়েস খুব বেশি হবার কথা নয়। বিজলিরই বয়েস এখন তেত্রিশ-চৌত্রিশ। কুঞ্জবাবুর বয়েস বড়জোর পঞ্চাশের কাছাকাছি। তার বেশি হবার কথা নয়, বরং কমই হবে। মাথার চুলগুলি এখনই কাশফুলের মতন হয়ে গিয়েছে। এতটা দূর থেকে বুঝতে না পারলেও বিজলির মনে হল, গায়ের ধবধবে সাদা চামড়া যেন তামাটে, রোদপোড়া, শুকনো দেখাচ্ছে।

বিজলি কয়েক পা সরে আরও আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

ফুল্লরা এল। শিবপদরও গলা পাচ্ছিল বিজলি।

"মা ?"

"উঁ ?"

"ঘরে যে দুটি কাচের বাটি আছে চায়ের সে দুটি চাইছে।"

বিজলি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। মেয়ের দিকে তাকাল। "কী বললি ?"

"চায়ের বাটি দুটি চাইছে।"

"কে ? তোর বাপ ?"

ফুল্লরা কিছু বলল না। যা তার ভাল লাগে না, মা বারবার সেই কথাটিই বলবে। মাকে যে বারণ করেনি ফুল্লরা তা-ও নয়। শুনে মা এমনভাবে রেগে গিয়েছে—যেন মেয়ের চুলের মুঠি ধরে আছাড় মারবে। 'বাপ নয় তো কী তোর ? হারামজাদি, হতচ্ছাড়ি। তোর লজ্জা করে না। যে-মানুষ তোকে কোলে করে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করল সে তোর বাপ নয় তো তোর বাপ কি ভগবান আকাশ থেকে হাত বাড়িয়ে তোকে খাইয়ে দিয়েছে ! কোন্ হারামজাদা তোর মাথায় ফুল-চন্দন ছড়িয়েছে রে যে আজও বেঁচেবর্তে আছিস। কুকুরে তোকে টেনে নিয়ে যেত কোন্ কালে তা জানিস, মরা বেড়ালছানার মতন পড়ে থাকতিস জঞ্জালে। খেয়ে পরে বেঁচেবর্তে, পেছন ঢেকে, ছাদের তলায় শুয়ে আছিস ওই মানুষটার জন্যে ! ওকে তোর বাপ বলতে মাথা হেঁট হয়— ! খবরদার আর যেন অমন কথা না শুনি মুখে। শুনলে তোর মুখে আমি লাথি মারব, ভেঙে দেব মুখ। ওই তো মুখের ছিরি, বড় রূপসী হয়েছিস তুই ! যা চলে যা আমার সামনে থেকে। নেমকহারাম, বজ্জাত মেয়ে কোথাকার !...

মায়ের রাগ সামলাবার ক্ষমতা ফুল্লরার নেই। সে সাবধান হয়ে গিয়েছিল। শিবপদকে বাপ বলতে তার ইচ্ছে না করতে পারে, ভালও না-লাগতে পারে, কিন্তু মায়ের কাছে কথাটা আর সে বলে না।

বিজল বলল, "কী হবে চায়ের বাটিতে ?"

"ওই বাবুদের চা দেবে।"

"বাবুরা না চা খেয়েছে সকালে ?"

"ভাল হয়নি। আবার চেয়েছে। ভাল করে।"

বিজলি যেন সামান্য বিরক্ত হল। "নিয়ে যা। সাবধান। বাড়িতে ওই দুটিমাত্র কাচের বাটি। আমার শখের জিনিস। ভাঙে না যেন!"

ফুল্লরা চলে গেল।

বিজলি বুঝতে পারছিল, বাবু দুটিকে নিয়ে শিবপদকে অনেক জ্বালা সইতে হবে। সাধ করে পায়ে ধরে এনেছ, এবার তার ঝক্কি সামলাও। তোমার ওই পায়রা খোপের মতন ঘর দুটিতে যারা এসে জায়গা নিত—তারা ছাপোষা মানুষ, গরিব গুর্বো। তাদের কোনো বায়নাক্কা ছিল না। মাথা গোঁজার জায়গা পেয়েছে, দুটি ডালভাত খেতে পাচ্ছে—এতেই কৃতার্থ ছিল। এখন বোঝ! পয়সাঅলা মানুষ ধরে এনেছ, উঁচু 'কেলাসের ভদ্দরলোক'এরা তো তোমায় হুকুমের চাকর করে রাখবে। তাদের রুচিতে খাবে, না হয় বলবে—এসব গোরুছাগলের খাবার কী খাওয়াচ্ছ শিবপদ। আর শালপাতাই বা কেন! থালাটালা নেই ? মানুষ চিনে খাওয়াও। পয়সায় কি আসে যায়। আরও চাও, আরও পাবে।

বিজলির মনে হল, শিবপদকে ডেকে বলে, তোমার বড়লোক বাবু দুটির জন্যে আলাদা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করো। বারোয়ারি এই ভাতডাল কুমড়োর ঘেঁট ওঁদের মুখে উঠবে না।

ফুল্লরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"সাবধানে ধুয়ে নিবি।"

চলেই যাচ্ছিল ফুল্লরা।

"শোন্।"

দাঁড়াল ফুল্লরা।

"চা নিয়ে যাবে কে ? তুই ?"

"আমায় বললে আমি যাব।"

"না, তুই যাবি না।"

ফুল্লরা এমন চোখ করে তাকাল, যেন বলল, কেন ?

বিজলির মুখ থেকে কথাটা যেন বেরিয়ে গিয়েছিল হঠাৎই। বেরিয়ে যাবার পরই নিজেকে সামলে নিল। বলল, "তোর এখানে কাজ আছে। একা আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখব। বাটি দিয়ে তুই চলে আয়। তোর

বাপকে বলিস বাবুদের চা দিয়ে আসতে।... যার যেমনটি মানায় তেমনই ভাল। কলাপাতায় ভাত জোটে না, রুপোর পাতে অন্ন চাই। কে বলেছিল, উঁচু কেলাসের বাবু ধরে আনতে। এখন একের পর এক বায়নাক্কা সামলাও।"

ফুল্লরা বলল, "কেন ? বাবু দুটি তো ভাল, মা !"

বিজলি মেয়েকে দেখল দু'পলক। বলল, "ভাল-মন্দ তোকে বুঝতে বলছি না, যা বলছি তাই করবি। বাইরে থেকে লোক ধরে আনলেই তোকে গিয়ে তার সেবা করতে হবে। যার করার সে করুক।"

ফুল্লরা কিছু বলল না। মা এখন এক কথা বলছে, কাল অন্য কথা বলবে। এখানে লোকজন এলে মা চায় মেয়ে যেন সব কাজেই খানিকটা হাত লাগায়, সাহায্য করে। দশ-বিশ জন একসঙ্গে এসে হামলে পড়লে তখন তাদের সামলানো কি সহজ। এ আসন চাইবে, ও জল চাইবে, একজন ভাত চাইলে তো অন্যজন তরিতরকারি চাইল....; কে তখন সামলায় তাদের। তার ওপর চা মুড়ি বেসমের লাড্ডু পান—সেসব তো আছেই। তখন ফুলুর ডাক পড়ে কেন ? ঠিক আছে, আজকের দিনটি যাক, কাল সে দেখবে মা কী বলে।

ফুল্লরা চলে যাচ্ছিল।

বিজলি হঠাৎ বলল, "অবনী কবে আসবে ?"

অবনীর কথা মা এমনভাবে বলল যেন ফুল্লরার সঙ্গে অবনীর কোনো কথা হয়ে গিয়েছে আড়ালে, মেয়ে জানে অবনী কবে আসবে।

ফুল্লরা বলল, "কিছু বলে যায়নি।"

"আসবে না ?"

"জানি না।"

"যা তুই।"

ফুল্লরা মাকে বলল না, কিন্তু সে জানে অবনী আসবে। অবনীর সঙ্গে মেলায় যাবার কথা আছে তার।

ফুল্লরা চলে যাবার পর বিজলি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। এখন আর কুঞ্জবাবুকে সে দেখতে পাচ্ছে না। মানুষটা কি নিচে নেমে ঘোরাফেরা করছে।

বিজলি নিজের কাজে গেল।

চার

বিকেল নাগাদ সবই গোছগাছ হয়ে গেল। বাসনকোসন মাজাধোয়া শেষ, উনুন শুকিয়ে গিয়েছে, কিছু কাঠ আর কয়লা জড়ো হয়েছে একপাশে। এখানে কয়লা পাওয়া শক্ত। অনেক কষ্টে জোগাড় করতে হয়। শালপাতার বাণ্ডিল দিয়ে গিয়েছে বাতাসী বউ।

মুদিখানার বাজারও গুছিয়ে নিল বিজলি। চাল ডাল নুন লংকা একপাশে রেখে দিল। অন্যপাশে বড় বড় ঝুড়িতে আলু কুমড়ো ঢেঁড়স বেগুন—যা সবজি জুটেছে। আজ রাতটুকু কাটলেই কাল থেকে শুরু হয়ে যাবে লোক আসা। পরশু কার্তিক পূর্ণিমা। কাম-কামিনীর মেলা। মেলা অবশ্য এখন থেকেই শুরু হয়েছে। তবে সে শুধু ধুলো ঝাঁট। কাল থেকে দোকানপত্র বসে যাবে, ব্যাপারিরা যে যার গাঁঠরি খুলে বসবে গুছিয়ে, পরশু একেবারে ভরা-ভরতি মেলা। নানান রকম দোকান, বেচাকেনা। মেলায় সবই আসে, চালের বস্তা থেকে কাপড়-জামা চাদর, মাটির হাঁড়িকুড়ি থেকে অ্যালুমিনিয়ামের বাসন, লোহার বঁটি কড়াই হাতা ঝাঁঝরা থেকে কোদাল কুড়ুল পর্যন্ত। ওদিকে কাচ আর প্লাস্টিকের চুড়ি, টিপ, সেফটিপিন, মাথার কাঁটা, মায় সস্তা স্নো পাউডার। রোল গোল্ডের গয়নাও বিক্রি হয়। এ-জিনিস আগে আসত না, হালে আসছে। বলে 'গিলটির গয়না'। একটা লোক আসে হজমি, বাত আর বাধকের ওষুধ নিয়ে। এ সব গেল দোকান-পশার, অন্যদিকে মেলায় আরো কত কী আসে ; নাগরদোলা, ঘোড়াদোলা, ধনপতি মাইতির ম্যাজিক, কাটা মুণ্ডুর খেলা, বন্দুকের ছররা দিয়ে বেলুন ফাটানো, তাসের জুয়া। ওরই মধ্যে খাবারের দোকান ; বেসমের বড়া, জিলিপি, গজা, বোঁদে, চাই কি রুটি তরকারিও। মেলায় যারা আসে তাদের থাকার ঠিকঠিকানা নেই। একটা চালা আছে বটে লম্বা মতন—তাতে আর ক'জন থাকতে পারে। অর্ধেক লোক নদী পেরিয়ে আসে, আর রাত হলে ফিরে যায়, কিছু আশ্রয় নেয় গোরুর গাড়ির ছইয়ের মধ্যে, কেউ বা দোকানপত্রের ছাউনির তলায়। বাকিরা মাঠেঘাটে পড়ে থাকে।

পূর্ণিমা একদিন। কিন্তু মেলা ভাঙতে ভাঙতে পাঁচ-ছ'দিন।

তবে এই মেলার আসল দিনটি তো পূর্ণিমার দিন—রাতে। কাম-কামিনীর মেলায় সেইটেই মহোৎসব। মানুষের কামের খেলা সেই দিনটিতেই। আর কামিনীও জুটে যায় গণ্ডায় গণ্ডায়। দশ জায়গার সাজনি আর বেশ্যা এসে জোটে পাহাড়ের তলায়। এরাই হল কামিনী।

বিজলি সবই জানে। মেলাতেও গিয়েছে। দেখেছে সব। মেলাটি বাদ দিলে—এখানে যা হয় তা হল মদোমাতাল কামুক লোকদের বেশ্যা নিয়ে ফুর্তি-হল্লোড়ের তাণ্ডব।

শিবপদ বলে, যার যেমনটি মন চায় সে তেমনটি নিয়ে থাকে। এতে তোমার কী, আমারই বা কী ?

তা ঠিক, বিজলির কিছু নয় ; সে শুধু দেখে, বছরের এই ক'টি দিনে তাদের 'তারাময়ী হোটেলে'-র বিক্রিবাটা কেমন হল। সারা বছরে এইটুকু তাদের উপরি পাওনা। দু'তিনটি হাজার টাকা যদি আঁচলে বাঁধতে পারে তাই যথেষ্ট।

সন্ধেবেলায় গা-হাত ধুয়ে শাড়িজামা বদলে বিজলি চুল বেঁধে নিচ্ছিল। অন্যদিন আগে আগেই কাপড় বদলানো চুল বাঁধা হয়ে যায়। আজ কাজকর্ম মিটিয়ে গা ধুতে গিয়ে দেরি হল।

ফুলুরা ঘরে নেই। মেয়েটাকে বারবার বলা সত্ত্বেও হারামজাদি ওই বাবুদের কাছে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। বড় ভাল লেগেছে বাবুদের। লাগবে না কেন, বাবু তো দেখতে শুধু সুন্দর নয়, গলায় সোনার হার, হাতে চার পাঁচটি আঙটি। টাকা বুঝি গন্ধও ছোটায়। ফুলু-হারামজাদি কি বড়লোকবাবুদের টাকার গন্ধও পেয়েছে! বাবুরাই বা মেয়েটাকে ডাকাডাকি করে কেন ? সাত ছুতোয় ডেকে পাঠায় ?

বিজলি চুল আঁচড়ানো শেষ করে খোঁপাটি বেঁধে নিল। নিয়ে দেয়ালে ঝুলোনো আয়নায় নিজের মুখটি দেখতে দেখতে শাড়ির আঁচল দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছিল।

নিজের মুখ আয়নায় দেখার মতন করে কতকাল আর দেখে না বিজলি। দেখার দরকারও করে না। খেয়ালই থাকে না তার। স্নানের সময় টিন আর কাঠের বেড়া দেওয়া কলঘরেও নিজের অঙ্গগুলি চোখ চেয়ে দেখে না। অথচ তার হাত সবই তো স্পর্শ করে, পরিষ্কার করে, কখনো কখনো কোনো ব্যথা কালসিটে, ডুমো—তাও নজরে পড়ে যায়—কিন্তু নিজের দেহ এবং অঙ্গ সম্পর্কে সে খেয়াল করে কিছুই দেখে না।

বিজলি আজ হঠাৎই যেন নিজের মুখটি দেখতে লাগল আয়নায়।

চুল দেখল সামনের মাথার, কপাল দেখল, নাক চোখ গাল ঠোঁট। গলাও দেখল।

বয়েস তার হয়েছে। তেত্রিশ। হয়ত চৌত্রিশ। তার সতেরো বছর

বয়সে ফুলু হয়েছিল। তারপর ষোলো বছর কেটে গিয়েছে। এই ষোলো বছরে বিজলির গিয়েছে অনেক। ফুলুর আসল বাপ বিজলির দেহটিকে ক্ষত করেছিল, ফলের মধ্যে পোকা ধরিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ফলটি তো একদিন খসে পড়বেই। কিন্তু পোকাগুলো? মেয়েদের শরীর বলে কথা—ভেতরটি যেন গাছের শেকড়, ভেতরে ভেতরেই সব ছড়িয়ে যায়—ওপরে বেরিয়ে আসে না। বিজলির দেহটিও ওপর ওপর শুধরে গেল। শিবপদ তখন যদি না আগলে নিত, বিজলির কী হত কে জানে! বিজলি অন্তত জানে না।

দু-চারটি বছর নিজেকে সামলাতে না সামলাতেই বিজলি পড়ল শিবপদর পিসির নজরে। বুড়ি বিষ-নজরে দেখল বিজলিকে। 'শিবু তোকে খাটে শোয়ায় বলে তুই ভেবেছিস তুই তার বউ! ওরে আমার ভাদ্দরমাসের মাদি রে! মনে রাখবি তুই পেট ময়লা করে এসেছিস। তুই নষ্টমাগী। নোংরা মাগী।'

বিজলি সবই জানত। অস্বীকারও করত না। কিন্তু বুড়ি তাকে শিল দিয়ে পিষতো যেন দুবেলা। মন যেন বলত, এমন করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা ভাল, না হয় পুরনো জায়গায় ফিরে গিয়ে মদ কারখানার গায়ে মেয়েদের বস্তিতে খোলার ঘর ভাড়া করে বসে যাওয়াও স্বস্তির। কী এমন ক্ষতি হবে তাতে! এখানে চিল ঠোকরাচ্ছে, ওখানের ভাগাড়ে শকুনি নামবে। দুই-ই সমান।....শিবপদ বলত, ছিছি—তোমার দেখি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে! পিসির কথা কানে তুলবে না। বুড়ি আর ক'দিন। অবস্থা দেখছ না—হাত পা পড়ে গিয়েছে, বুকের খাঁচায় দম নেই। কথায় বলে, যে গোরু দুধ দেয়—তার লাথি হজম করাও ভাল। শিবপদ মানুষটি ওই রকমই। মন্দটিও সে হাসিমুখে সইতে পারে। কিছু বললেই রামায়ণ মহাভারত শোনায়। ধর্মকথা।

বিজলি বুঝত সবই। কিন্তু ওই বুড়িই যখন ফুলু মেয়েটাকে গরম চিমটের ছেঁকা দেবার মতন করে বারবার বলত, 'তোর আবার বাপ কি রে ছুঁড়ি। কে তোর বাপ! আদিখ্যেতা করিস না। শিবু তোর বাপ নয়, যা খোঁজ গিয়ে তোর বাপকে...' তখন গা-কান পুড়ে যেত বিজলির।

ফুলু তখন ছোট ছিল। সাত আট বছর বয়েস। সে তারও আগে থেকে শিবপদকে দেখছে। কিছু বোঝে বাকিটা বোঝে না। বুড়িই নিত্যদিন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেয়েটাকে বিগড়ে দিল বরাবরের মতন। নয়ত ফুলু শিবপদকে 'বাপ' বলে মেনে নিতে পারত হয়ত।

বুড়ি কিন্তু মারা গেল। মাস ছয় পরে। শিবপদ ঠিকই বলেছিল—বুড়ির

আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, যা বলে শুনে যাও। বুড়ি মরলে আমাদের আর চিন্তা কী! মাথা গোঁজার জায়গাটি পাব, জমি-জায়গা পঞ্চাশ একশো হাত। এটি ওটি। কে দিত বিজু এত সব! মুখটি বুজে থাকো—তারপর তো আমরা...।

পিসি মারা যাবার পর বিজলির বুকের ভার নামল, গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে এল ধীরে ধীরে, মন শান্ত হল।

তারপর থেকে বিজলি এই সংসার নিয়ে রয়েছে। সংসার, ঘরবাড়ি, খাওয়া-পরার চিন্তা, নিজেদের পা দুটিকে মাটিতে ঠেকিয়ে রাখার পরিশ্রম। মাঝে মাঝে ধাক্কা আসে, নড়বড়ে হয়ে যায় আয়ের পথ, তিনটি মানুষের পেট ভরার ব্যবস্থা। আবার তখন দুশ্চিন্তা, উপায় খোঁজা, নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে উদ্বেগ।

বছরগুলো এইভাবে কাটতে কাটতে আজ বিজলিরা মোটামুটি একটা পা রাখার জায়গা পেয়েছে। তাদের চলে যায়।

নিজেকে বিজলি এখন আর স্ত্রীলোক হিসেবে দেখে না। দেখতে যেন ভুলেই গিয়েছে। তার বোধ হয় খেয়ালও থাকে না, 'তারাময়ী' হোটেলের বিজলির তলায় সে অন্য এক বিজলি। সে স্ত্রীলোক। তার দেহ, অঙ্গপ্রতঙ্গ আছে। নদী মরে গেলে তার জল শুকোয়—বিজলি তো মরা নদী নয়, তার দেহটি এখনও মজেনি।

শিবপদ কখনো কখনো বলত, বিজু তুমি কিন্তু এখনো বেশ দেখতে গো, চেহারাটি খাশা রয়েছে।

শিবপদ বলত। বিজলিও হাসত। এসব আদরের কথা বিছানায় মানাত ভাল, শুনতেও খারাপ লাগত না। কিন্তু বিজলি কোনো মোহ বা মায়া নিয়ে নিজেকে খুব কমই দেখেছে। দেখার কথাও মনে হত না আর। কেনই বা দেখবে! দেখে কী লাভ? আজ এতগুলো বছরে কত কী ঘটে গেল। সংসারের নিয়মটি কী—তুমি জানো না! এক উনুনে রান্না চাপালে কতকাল আর তার আঁচ থাকে? তাপ নিভে ছাই পড়ে যায় ওপরে। বিজলিরও সেই অবস্থা, তার তলায় কী আছে সে দেখতে চায় না।

সাইকেলের ঘন্টি শুনতে পেল বিজলি।

শিবপদ ফিরল। গিয়েছিল বেশ খানিকটা আগে। ভাঙাচোরা সাইকেল ঠেলে শিবপদ যখন যাচ্ছে তখনই সন্দেহ হয়েছিল বিজলির। 'যাচ্ছ কোথায়?'

শিবপদ লুকোবার চেষ্টা করেনি। যাচ্ছে স্টেশনের দিকে, পঞ্চু লাটের

আস্তানায়। বাবুর জন্যে নেশা আনতে। সারাটি দিন বাবু গলা শুকিয়ে বসে আছেন, বিকেল ফুরলো, আর কি তিনি নান্দীমুখের পাত্রটি হয়ে বসে থাকতে পারেন।

বিজলি কিছু বলেনি। বলে লাভ নেই।

আয়নায় নিজের মুখটি ভাল করে দেখল বিজলি। দেখেও যেন মানতে চাইছিল না। আরও খুঁটিয়ে দেখল। তারপর আয়নার কাছ থেকে সরে এল। ঘরের দরজা খোলা। তাকাল দু'পলক। কোথাও কোনো পায়ের শব্দ নেই। সামান্য আড়ালে সরে গেল। গায়ের আঁচল আলগা করল। চোখ নামাল বুকের দিকে।

সামান্য সময় যেন কেমন কুণ্ঠা আর দ্বিধার মধ্যে থাকল বিজলি। ধীরে ধীরে মোহের মতন লাগছিল। জামাটা খুলতে গিয়ে কী যেন মনে হওয়ায়—বিজলি গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল, ছিটকিনি তুলে দিল ভেতর থেকে।

বিজলি নিজেকে দেখবে।

"মা ?"

বিজলির ততক্ষণে শাড়ি গোছানো হয়ে গিয়েছে। জামার বোতাম দিল। মুখ মুছে নিল আঁচলে।

দরজা খুলে দিল বিজলি।

ফুল্লরা ঘরে ঢুকেই বলল, "মা, বাবু পালা গেয়ে শোনাচ্ছিলেন! কী সুন্দর গলা গো। রেডিয়োয় পালা শুনি, তার চেয়েও সুন্দর।"

বিজলি বলল, "জানি।" বলেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "কী পালা ?"

ফুল্লরা পালার নাম বলতে পারল না। কিন্তু তার চোখমুখের ঝকঝকে খুশি খুশি ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল—বাবুর পালাগান তাকে ভীষণ মুগ্ধ করেছে। সামান্য উত্তেজিতও হয়ত। ফুল্লরা বলল, "বাবু চোখে দেখেন না।... দু হাত হাতড়ে হাতড়ে পালা বলছিলেন—। কী যেন....কী যে বলছিলেন,... দূর ছাই আমার মনেও থাকে না।"

বিজলি মেয়েকে দেখছিল।

ফুল্লরা দেখতে ভাল। সুন্দরী নয়। বড় বড় চোখ নাক, লম্বাটে মুখ, ভরা গলা, ধবধবে দাঁত। গায়ে গড়নে একটু থলথলে। হালকা ছেলেমানুষি

চালচলন। গায়ের রঙটি মাঝারি, তেমন ফরসা নয়। মেয়েটার মধ্যে ছটফটে ভাব আছে।

বিজলির মনে হল, ওই বয়েসে বিজলি যত সুন্দর ছিল মেয়ে তত সুন্দর হয়ে ওঠেনি। আর এখনও মেয়ের মা হয়েছে বলে সে যে বুড়ি হয়ে যায়নি তাও ঠিক। বরং আজ বিজলি নিজেকে যেটুকু দেখল, তাতে তার নিজেরই অবাক হবার কথা। বয়েসে যতটা চেহারা পালটায় তার অর্ধেকেও কি পালটেছে? এখনও বিজলির গড়ন ভেঙে যায়নি, শরীর থলথলে হয়ে ওঠেনি। কাঠামো ঠিক আছে। ছিপছিপে শরীর, একটু বা গায়ে লেগেছে, সেটা কিছুই নয়। তার হাত পা কোমর শক্ত। খাটাখাটুনির দরুন কোনো অঙ্গই বেজুত বিশ্রী হয়ে যায়নি। মাথার চুল এখনও কালো। আগের মতন ঘন আর নেই। গায়ের রঙ অবশ্য অনেক মরে গিয়েছে। তবু মেয়ের চেয়ে বিজলি এখনও ফরসা।

ফুল্লরা বলল, "বাবু ক'টি পান চেয়েছেন।"

বিজলির হুঁশ হল। বলল, "হবেখন। তুই আর ওপাশে যাবি না।" বলেই কেমন বিরক্ত হয়ে মেয়েকে দেখল, "তোকে না বারণ করেছি বাবুদের কাছে ঘুরঘুর করতে। সকাল থেকে কেন যাচ্ছিস ওদিকে? কী আছে ওখানে?"

ফুল্লরাও রেগে গেল। "কোথায় গিয়েছি সকাল থেকে। তোমার ফরমাশ খাটছি তখন থেকে আর তুমি বলছ,..."

"বেশি কথা বলবি না। আমার চোখ আছে।...ফরমাশ আমার খাটছিস বইকি! সংসারের দুটো কাজ করতে হলে ফরমাশ খাটা হয়। আমার দু হাতে আমি হাজারটা কাজ সারব এই ক'দিন আর তোরা নড়ে বসলেই বলবি ফরমাশ খাটছিস! পেটে ভাত জুটছে, পেছনে কাপড় জুটছে—তোর আর কী! কেমন করে জুটছে তা তো দেখার দরকার নেই।...আমার মতন কপাল করে জন্মালে বুঝতে পারতিস।"...বলতে বলতে বিজলি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। "ঘর ছেড়ে আর বেরুবি না। ওদিকে এখন শুঁড়িখানা বসিয়েছে তোর বাপ আর বাবুরা। আমি তোর বাপের ঘরে আছি। ওদের কিছু দরকার হলে আমি দেখব। তুই যাবি না।" বিজলি চলে গেল বাইরে।

পাঁচ

নিজের বিছানাটি বিছিয়ে নিচ্ছিল শিবপদ। এটি তার বরাবরের অভ্যেস। বিছানা বিছিয়ে নিতে নিতে গান গাইছিল : 'বল দেখি ভাই শিবের বুকে ন্যাংটা মাগী কে নাচে রে, সুরাপানে ঢল ঢল ওর হাতে কেউ বাঁচে নারে।'

বিজলি ঘরে এল।

শিবপদ অতটা লক্ষ করেনি। আজ তার খানিকটা ফুরফুরে নেশা হয়েছে। কুঞ্জবাবু মদের গেলাসে কিসের একটা বড়ি ফেলে দিলেন। বললেন, নাও হে নাও ; নেশাটি পাখা মেলবে।

খেয়ে নিল শিবপদ। বাবুও খাচ্ছিলেন। খেতে খেতে গল্পগুজব চলছিল। কুঞ্জবাবুর সঙ্গে পাললা দেবার ক্ষমতা শিবপদর হল না। কিন্তু তার মজা ধরে গেল। নেশার মধ্যে সে কত কী শুনল, জানল—যা আগে জানত না। অবশ্য কথাগুলো বললেন সহদেববাবু। কুঞ্জবাবুর সহচরটি।

বিজলি ঘরে ঢুকে শিবপদর গান শুনতে শুনতে বলল, "তোমার বুকে আমি ন্যাংটো মাগী নাচছি ?"

শিবপদ তাকাল। দেখল বিজলিকে। তারপর হেসে বলল, "এটি কালীমায়ের গান গো! তুমি তো বিজলি।" শিবপদর গলার স্বর ভারী, কথাগুলো সামান্য জড়ানো, তবে অস্পষ্ট নয়।

বিজলি বলল, "তোমার ওই বাবুরা বুঝি গানটা শেখালেন ?"

শিবপদ বলল, "শোনো কথা, বাবুরা শেখাবেন কেন! এটি আমি জানি। গেয়েছি কত! তুমি শুনেছ।" বলতে বলতে সে হাত নেড়ে বিজলিকে কাছে ডাকল।

বিজলি এগিয়ে গেল না, বলল, "সারা সন্ধেটি নেশা করে কাটালে। নেশাটি শেষ করে দুটি মুখে দিয়ে বিছানা পাড়ছ! তারপর ?"

শিবপদর বিছানা করা হয়ে গিয়েছিল। দেওয়ালে টাঙানো কাঠের র‍্যাক থেকে তার বিড়ির কৌটো আর দেশলাই নামিয়ে নিতে নিতে বলল, "কথাটি কী তোমার ?"

"রাত পোয়ালে ভোর। কাল সকাল হল কি..."

বিজলিকে কথা শেষ করতে দিল না শিবপদ। বলল, "সকালটি হোক, তোমার আগে থেকেই চিন্তা কেন! দুপুরের আগে একটি লোকও আসছে না।"

"তা বলে কাজ নাই ?"

"স-ব হয়ে যাবে। ....শোনো, তোমার সঙ্গে কটি কথা আছে। ফুলু কি ঘুমালো ?"

"শুয়ে পড়তে বললাম।"

"তবে শোনো। ...এসো কাছটিতে, বসো এসে।" শিবপদ বিছানায় গিয়ে বসল। ডাকল বিজলিকে। ডেকে বিড়ি ধরাতে লাগল।

বিজলি কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েকে বলে এসেছে শুয়ে পড়তে। ফুলু বেশ ঘুমকাতুরে, সন্ধে হতে না হতেই হাই তোলে। বোধ হয় সে ঘুমিয়েও পড়ল এতক্ষণে।

শিবপদ বিড়ির ধোঁয়া গিলে বলল, "আগের কথাটি বলি তোমায় বিজু, নয়ত বঝুবে না। আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, মুখ্যু হয়ে জীবনটি শালা নষ্ট হয়ে গেল! কিছুই জানলাম না গো, শিখলাম না। ....তুমি বসো। না বসলে এসব জ্ঞানের কথা শুনবে কেমন করে! বসো!"

বিজলি কিছুই বুঝতে পারল না। তবে বিছানায় বসল। শিবপদর কাছেই।

শিবপদ বার কয়েক নিজের খেয়ালে মাথা দোলালো। তাকাল বিজুর দিকে। তারপর বলল, "বাবুর সাথে ওই যে সহচরবাবুটি রয়েছেন, উনি বড় জ্ঞানের মানুষ। কত কথা শোনালেন বিজু! আমরা তো কিছুই জানি না। এই জায়গাটিতে সাত আট বছর কেটে গেল—এটি আমাদের ঘরবাড়ি। কিন্তু জানলামটা কী?"

বিজলি কোনো আগ্রহ বোধ করল না। নেশার ঘোরে শিবপদ বেশি-বেশি কথা বলছে। বরং একটু ঠাট্টার গলাতেই বলল, "জ্ঞানের কথাটি কী বলল সহচরবাবুটি।"

শিবপদ বলল, "উনি বললেন, কাম-কামিনীর মেলাটি হল মচ্ছবের জায়গা। দশ থান থেকে দশটি লোক আসে-যায়, খায়-দায়, ফুরতি-ফারতা করে, এটি-সেটি বেচে-কেনে—তারপর চলে যায়। ওটি কিছু নয়।"

বিজলি যেন হাসল। বাবুটি তো বড় জ্ঞানের কথা বলেছেন। বলল, "এটি তোমার জানা ছিল না? ফুলুও জানে।"

শিবপদ বিড়িতে টান দিল। মাথা নেড়ে বলল, "আহা শোনোই না! আমি কি মেলার কথা বলছি! মেলাটি মচ্ছব—সবাই জানে। কিন্তু আসলটি তুমি জান না। আমিও জানতাম না।"

"আসলটি কী?" বিজলি যেন তামাশা করেই বলল।

শিবপদ এবার অন্যরকম মুখ করে হাসল। বলল, "মনসাপাহাড়ের মাথায় কার মন্দিরটি আছে জান?"

বিজলি দেখল শিবপদকে। মানুষটা নেশার ঘোরে বকবক করছে নাকি? বলল, "না, জানি না। মন্দির আবার কোথায়? ক'টি পাথর পড়ে আছে শুনি।"

"পাথরগুলির আড়ালে দেবতাটি আছেন।"

"দেবতা !....কে বলল, তোমার জ্ঞানের বাবুটি বললেন ?"

"বিজু, আগে কথাটি শোনো, রঙ পরে করো।" শিবপদ এবার বিজলির দিকে ঘুরে বসল। বলল, "ওই দেবতাটি হলেন কামদেব।"

বিজলি এবার বুঝি অবাক হল। সে জানত, ওখানে নাকি কোন দেবীর ভাঙা মূর্তি ছিল একসময়। এখন কী আছে কেউ বলতে পারে না। কেননা, কেউ কিছু দেখতে পায় না। "দেবতা !"

শিবপদ বলল, "হ্যাঁ গো, দেবতা। কামদেব।...এটি তোমার আমার কাম নয়, উই যে বেশ্যা মাগীগুলো মশাল আর মাতাল মদ্দগুলোকে নিয়ে পাহাড়ের ঝোপেঝাড়ে গিয়ে ন্যাংটা হয়ে গড়াগড়ি করে—এটি সে কাম নয়।"

বিজলি পলক ফেলল না। শিবপদকে দেখতে লাগল।

শিবপদ বলল, "সহচরবাবুটি মানী লোক। অনেক কথা জানেন। বাবু বললেন, এই দেবতাটি আমাদের শাস্ত্রে আছে। বেদে আছেন। অথর্ব্ব বেদ। সেটি কী আমি তো জানি না। বেদ কি আমি জানি, না, তুমি জান। নামেই শুনেছি বেদবেদান্ত পুরাণ।"

বিজলি বলল, "কী আছে শাস্ত্রে তাই শুনি ?"

"কামদেবটি হল মঙ্গলের দেবতা। সৃষ্টির দেবতা। উনি প্রসন্ন হলে পাপতাপ শোক-দুঃখ দূর হয়। উনি অভিশাপ থেকে মুক্ত করেন।"

বিজলি বলল, "সহচরবাবু জানলেন কোথা থেকে ?"

"এটি কেমন কথা হল, বিজু ? উনি তো তোমার আমার মতন মুখ্যু নন। কত কী পড়েছেন। জানেন।" বলে শিবপদ হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে দিল জানলার দিকে। বলল, "সহচরবাবু দেবতাটির চেহারার কথা বলছিলেন। আমার তো অত কথা মনে নাই গো। তবে উনি বললেন, দেবতাটির চোখ সুন্দর, মুখ সুন্দর, নাক সুন্দর। মাথার চুল কোঁকড়ানো, কালো। হাতটির নখগুলি লাল। বুক কোমর উরু—সবই সুন্দর। ওঁর গায়ে বকুলফুলের গন্ধ। উনি শুধু হাসিচোখে চেয়ে থাকেন।"

বিজলি শুনল। কী বুঝল কে জানে। বলল, "তা এই দেবতাটি এখানে কেন ?"

"পাহাড়টি যে মনসা।"

"মনসা তো সাপের দেবী ?"

শিবপদ যেন মজা পেয়েছে, হাসল। হাসতে হাসতে বলল, "না গো,

আমরা তো তাই জানতাম। সহচরবাবুটি বললেন—এ-মনসা সে-মনসা নয়, সাপের দেবী নয়। এটি হল মনের বস্তু। মনটি তোমার এই পাহাড়কে সৃষ্টি করেছে। ভগবান মনটি দিয়েছেন, মন থেকে এটির সৃষ্টি হল।"

বিজলি কিছু বলতে যাচ্ছিল বলতে পারল না, শিবপদ বাধা দিল।

শিবপদ বলল, "ওই পাহাড়টির চারটি পথ। চারদিকের চারটি পথ। উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম।"

বিজলি এটি জানে। শুনেছে। মেলায় গিয়ে দেখেছে নিজের চোখে। পাহাড়ের দুটি পথ ওদের, মত্ত কামার্ত কিছু পুরুষ আর কামিনীদের। মাতাল পুরুষগুলো দলে দলে ছোটে কামিনীর জন্যে। পাঁচ ঘাটের বেশ্যা পাহাড়তলিতে দাঁড়িয়ে থাকে একটি করে মশাল হাতে। তাদের কত রঙ। মাতাল পুরুষগুলো আসে। যার যাকে মনে ধরে হাত ধরে টেনে নেয়। এবার মশাল জ্বালানোর পালা। মেছুনির মতন কতক মাসিটাসি বসে থাকে কেরাসিন তেলের টিন নিয়ে। পয়সা ফেলে কেরাসিন তেলে মশাল ভিজিয়ে নাও। তারপর মশাল জ্বেলে কামিনীর হাত ধরে ছোটো পাহাড়পথে। মশালটি থাকে কামিনীর হাতে। জ্যোৎস্না রাতে মশাল কেন ? কার্তিক-পূর্ণিমা না চরাচর আলো করে রেখেছে। বিজলি শুনেছে, পাহাড়পথে গাছপালার আড়ালে জ্যোৎস্নার আলো বড় থাকে না। ঝোপঝাড়ের গাছের আড়াল দিয়ে অল্পস্বল্প থাকে কোথাও, কোথাও নয়। আঁধারই বেশি।

এই পথেই ভিড়। দলে দলে পুরুষ আর কামিনীর ছোটাছুটি। পুরুষদের জ্বালা জুড়োয়, কামিনীদের আঁচলের খুঁটে টাকা জমে এই রাতটিতে। কাম-কামিনীর মেলার এইটিই বুঝি আসল। এমন করে কাম-মত্ত আর কোথায় হবে এরা!

শিবপদ বলল, "পথগুলি কেন গো, বিজলি জান ?"

বিজলি কোনো জবাব দিল না।

শিবপদ বলল, "সহচরবাবুটি বুঝিয়ে দিলেন সুন্দর করে। বললেন, শিবু—পুরুষদের একটি দেহপথ, মেয়েদের একটি দেহপথ। এই দুটি সতন্তর থাকলে ভোগলালসা লাস্যহাস্য হয় না। দুটিতে মিলন হলে তবে ক্ষুধা মেটে। ও দুটি পথ বাদ দাও। অন্য দুটি কী ? আমি বললুম, বাবু আমি জানি না। মুখ্যু মানুষ। রামায়ণ মহাভারত ছাড়া আমার কিছু পড়া নাই। তা বাবু বললেন—কী বললেন জান ?"

বিজলি তাকিয়ে থাকল।

শিবপদ বলল, "উনি বললেন, অন্য দুটি পথ ভিক্ষার আর প্রার্থনার।"

"ভিক্ষার?"

"হ্যাঁ গো, ভিক্ষাটি তুমি জান না? দেখো নাই? সংসারী মানুষ গেরস্থ লোকগুলি কোন পথে যায়?"

বিজলি বুঝতে পারল। সে দেখেছে। একটি পথ ধরে যায় গেরস্থ বাড়ির স্বামীস্ত্রী। নানা বয়সের। মেয়েলোকের হাতে একটি মশাল। বাড়ি থেকেই তৈরি করে এনেছে। পুরুষটির হাতে শালপাতার ঠোঙায় ফুলপাতা। দুটিতে পাহাড়পথে এগিয়ে যায়। তাদের ভিক্ষা, সন্তান। বড় আশা আর কামনা নিয়ে তারা পথটি ধরে চলে যায়। ওদের সঙ্গেই বুঝি যায় কিছু শোকার্ত জনক-জননী, স্বামী-স্ত্রী। যায় শোকতাপ রোগব্যাধি রহিত করার ভিক্ষা জানাতে। এরা কি কিছু পায়? কে জানে! বিজলি জানে না।

শিবপদ বলল, "প্রার্থনার পথটিতে বড় কেউ যায় না গো!"

"কেন?"

"ওটি অন্য পথ। বাবু বললেন, ওই পথটি ধরে যে যায় সে শুধু দৃষ্টির প্রার্থনা জানাতে পারে। অন্য কিছু নয়।"

"তবে বলো অন্ধের পথ।"

শিবপদ হাসল যেন। "অন্ধ! এ জগতে কে কখন অন্ধ হয়েছে সে তো নিজেই জানে না, বিজলি। মাছ চোখ চেয়ে ঘুমোয়। মানুষ চোখ চেয়েও অন্ধ থাকে।"

"তোমার কুঞ্জবাবুটি ওই পথটি ধরে যাবেন?"

"হ্যাঁ গো।"

"যান তবে। ...তোমার সহচরবাবুটি তো একটি কথা জানেন না।"

"কী কথা?"

"কামিনী নিয়ে যারা যায়—তারা মশালটি নিয়ে মাথা ঘামায় না, পাহাড়ের কোনখানে তা নিভে গেল তাতে তাদের কী! আঁধারেই তারা খুশি।"

"ঠিক কথা।"

"সংসারী মানুষ যারা যায়—তারাও কি কোনোদিন শেষপর্যন্ত পৌঁছতে পারে? বাতাসে মশাল নিভে যায়। পড়ে যায় হাত থেকে।"

"কথাটি ঠিক। মশাল নিভে গেলে জ্বালাবার নিয়মটি নাই। হাত থেকে পড়ে গেলে তোলা নিষেধ।"

"চোখের জলটি নিয়ে তারা ফিরে আসে।"

"পরের বছর আবার যায়। ...তা এটি তো জগতের নিয়ম। আশায় মানুষ বুক বাঁধে।"

বিজলি এবার উঠল। "তোমার কুঞ্জবাবু সেটি জানেন?"

"জানেন। ...কিন্তু বিজু, একটি তো কথা থাকল।"

"কী কথা?"

"কুঞ্জবাবুর সাথে যাবে কে? মেয়েছেলে ছাড়া সঙ্গিনী হবার নিয়ম নাই। মশালটি সেই ধরবে। কামিনীর কাজ এটি নয়। বাবু বলছিলেন, শিবু তোমার মেয়েটিকে দাও। সে আমার সঙ্গিনী হবে। ওটি আমার মেয়ের মতন গো। আমি ওকে আমার গলার সোনার হারটি দেব। টাকা দেব একটি হাজার। মেয়েটিকে দাও গো!"

বিজলি যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

ছয়

দিনটি মেঘলা-মেঘলা হয়ে শুরু হয়েছিল। বেলায় রোদ উঠল, আকাশ নীল হয়ে এল। দুপুর নাগাদ ঝকঝক করতে লাগল রোদ। বিজলিদের তারাময়ী ভাতের হোটেল বেলা থেকেই জেগে উঠেছিল। রেল স্টেশনের দিক থেকে লোক আসছিল দুটি চারটি করে, আসছিল ভ্যান-রিকশা; দুটি একটি করে গোরুর গাড়ি। ব্যাপারিরা আসছিল টেম্পু করে। সঙ্গে বড় বড় গাঁঠরি, হ্যাজাক বাতি, পাট করা প্লাস্টিকের চাদর।

শিবপদ সকাল থেকে ব্যস্ত। বিজলির হাত-ভরা কাজ। কার্তিক-ঠাকুর পুরনো লোক, নবতারাও নতুন নয়। তবু বিজলির যেন দু দণ্ড কোথাও দাঁড়িয়ে থাকার অবসর নেই। দোকানচালার কাছ থেকে হল্লা উঠছে বেলা থেকেই। খরিদ্দার আসছে। চা মুড়ি আলুর বড়া—যার যা রুচি খাবে। বিড়ি টানবে চুটিয়ে। তারপর চলে যাবে। ভাতের পাত পড়বে দুপুর নাগাদ।

আজকের দিনটি এইরকমই যাবে। আজ সারাদিন; সন্ধেরাত পর্যন্ত। কাল সকাল দুপুরও তারাময়ী ভাতের হোটেলে লোকের আসা-যাওয়া থামবে না। তবে বিকেলের পর ফাঁকা। তখন সবাই পূর্ণিমার কাম-কামিনীর মেলায় গিয়ে ঘুরবে ফিরবে, খাবে-দাবে, আহ্লাদ করবে। ওই দিনটিতে বিজলিরা সাঁঝবেলায় লোক পায় না। না পাক। পরের দিনটিতে আবার লোকজন আসে। মেলা চলে চার পাঁচটি দিন। ত্রিশ চল্লিশটি লোক তো পায় বিজলিরা। প্রতিদিনই পায়। ভাত হয়ত খায় না সকলে, অন্য কিছু খায়।

অন্য অন্যবার বিজলির ব্যস্ততা থাকে, হাঁকডাক থাকে, বিরক্তিও থাকে,

আবার খুশি-ভাবটিও থাকে। এবারে বিজলি কেমন গম্ভীর।

বাঁকড়োর অবনী এল বিকেলবেলায়। আজ আর কালকের দিনটি সে থাকবে। মেলা শেষে পরশুদিন সকালে ফিরে যাবে।

অবনীকে দেখে বিজলি অন্যমনস্ক হয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

কুঞ্জবাবুদের দেখেছিল অবনী। বলল, "মাসি, ভদ্রলোক দুটি কে ?"

"এসেছেন। মেলা দেখতে যাবেন। শখ।"

"পয়সাঅলা মানুষ দেখি! গলায় সোনার হার, হাতে চারটি আঙটি, দামী পাথর মনে হয়।"

"তা হবে। বড়লোক।"

অবনী কিছু বলল না। কিন্তু বিজলিমাসির ওই খাপরাঘরে আগে যারা এসেছে—তাদের সঙ্গে এই দুজনের যেন কোনো মিল নেই। ছাপোষা, সাধারণ, গরিবগুরবোদেরই ওই পায়রাখোপে মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে দেখেছে অবনী অন্য অন্য বছর। এইবারই প্রথম দেখছে বড়লোক মানুষও মাসির ঘরে ঠাঁই নিয়েছে।

অবনী ঠাট্টা করে ফুল্লরাকে বলল, "মাসির বাড়িতে সোনার গৌরাঙ্গ এসেছে।"

ফুল্লরাও রগড় করে জবাব দিল, "বুড়ো গৌরাঙ্গ!"

অবনী এমন এক হাসি হাসল চোখে-চোখে যেন বোঝাতে চাইল, জোয়ান গৌরাঙ্গটি তো তোমার পাশে ফুলু।

তা অবনী সময়মতন এসে উপকারই হল বিজলিদের। দুপুর থেকেই কাজে লেগে গেল। তার কাছে এটি নতুন নয়। মেলার সময় মাসির বাড়িতে এলেই খেটেখুটে দিয়ে যায় সে।

বিকেল কাটল ; আর দেখতে দেখতে সাঁঝবেলা। পুরনো একটি পেট্রম্যাক্স জ্বলে উঠল তারাময়ী ভাতের হোটেলের চালায়।

এখন আর লোক আসা-যাওয়া নেই। একটি দুটি ছুটকো মানুষ। শেষে ফাঁকা হয়ে গেল দোকান।

সারাদিন খাটাখাটুনির পর শিবপদ হাতমুখ পরিষ্কার করে চলে গেল কুঞ্জবাবুদের ঘরে। বাবুদের সঙ্গে বসে বসে গা-গতরের ব্যথা মারবে, গল্পগুজব করবে।

ফুল্লরা আর অবনী বসল রেডিয়ো নিয়ে। ঘরে নয়, দোকানচালার তলায়। বিজলি বলল, "ঘরে নয় বাইরে যা—ঘর অচ্ছুছ হয়ে আছে আমার।"

বিজলি এমন কথাটি বড় বলে না মেয়েকে। আজ বলল। চোখের সামনে মেয়েকে আর বুঝি সে ধরে রাখতে চায় না।

গা ধুয়ে শাড়ি জামা পালটে বিজলি যখন একা হল—তখন রাতের দণ্ড শুরু হয়েছে। পান জরদা মুখে দিয়ে বিজলি কিছুক্ষণ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে বাইরে। কাল পূর্ণিমা। কলকে ফুল আর কাঠগোলাপের গা মাথা চাঁদের আলোর তলায় ডুবে আছে যেন। বারোমেসে শিউলির গন্ধ আসছে বাতাসে।

বিজলির হঠাৎ মনে হল, সারাটা দিন সে যেন কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল। ভাত ডাল তরি-তরকারি, উনুন ধোঁয়া, নবতারা বেস্পতি—এদের মধ্যে সে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে রেখেছিল। এখন সে একা। কিন্তু তাই কী! বিজলি কি সত্যিই ডুবে গিয়েছিল ভাতের হোটেলের ডালভাতের মধ্যে। বোধ হয় না। অন্য অন্যবার সে যেমন করে এই হোটেলের কাজকর্মের মধ্যে তলিয়ে থাকে, এবার আর পারেনি। সমস্ত কিছুর মধ্যে সে ছিল ঠিকই—কিন্তু কে যেন, কী যেন তার মনকে টেনে নিচ্ছিল অন্যদিকে। বার বার বিজলি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল, বলছিল এক করছিল অন্য, কার্তিক ঠাকুরকে তেলমশলা বার করে দিতে গিয়ে নবতারাকে শালপাতার বাণ্ডিল বার করে দিল, জলের কলসিটি ভাঙল, বেস্পতির মেয়েটাকে একটি জামা দেব বলেছিল, দেওয়া হল না।

আজ কেন, কাল রাত থেকেই বিজলি বুঝি ঠিকমতন কিছুই খেয়াল রাখতে পারছে না। ভুল হয়ে যাচ্ছে। ভাবছে কতরকম। সত্যি বলতে কী, আজ দুটি দিনই বিজলি যেন নিজের সুখস্বস্তি মনের শান্তিটুকু আর অনুভব করতে পারছে না। শিবপদ কেন যে বাবুদুটিকে এখানে এনে তুলল? ভুল করেছে। সে বোঝেনি। এই ভুল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—তাও সে বুঝতে পারছে না।

সাত

দুপুর থেকেই মেলাটি ভরে যায়। দলে দলে লোক আসে নদী পেরিয়ে। নদীতে সাঁকো হয়েছে বছর কয়। আসে টেম্পু, 'টেকার' গাড়ি। লোক বোঝাই করে ভ্যান রিকশা। আর গোরু-মোষের গাড়ি আসে গণ্ডায় গণ্ডায়। নদীতে এখন জল নেই। ঝুরঝুরিয়ার দিক থেকে যারা আসে তারা নদীর বালিতে গোরুরগাড়ির চাকার গর্ত বসিয়ে দিব্যি চলে আসে। আসে পায়ে হেঁটেও।

নদীর ধারেই মেলা। নদীপাড়ের গাছপালা আর পাথরগুলো পেরিয়ে দুশো

গঞ্জও নয়, মেলার এলাকা শুরু হয়ে যায়। খানিকটা তফাতে মনসা পাহাড়। পাহাড়টি তেমন উঁচু নয়, তবে বড় খাড়ামতন লাগে, মাথাটি যেন ত্রিশূলের মতন—মাঝের চূড়াটি সরু হয়ে রয়েছে—দু পাশে দুটি মাথা। দূর থেকে বোঝা যায় না—মনে হয়—অল্প কিছু গাছপালা আর পাথরের রাশি ছাড়া পাহাড়টিতে কিছু নেই। কালচে সবুজ চেহারা দেখে তেমনই মনে হয়। কিন্তু পাহাড়টি চোখে যেমনটি লাগে তেমনটি নয়। গাছপালায় জঙ্গল, পাথরে পাথরে ভরা। বর্ষায় আরও জঙ্গল বাড়ে, পাথরগুলি পিছল হয়ে যায়। শীতে নিচ-পাহাড়ে পাতা পোড়াবার রেওয়াজ থাকলেও ওপর-পাহাড়ে আগুন জ্বলে না।

পাহাড় আর নদীর গায়ে গায়ে এই মেলাটি যেন শীতের মুখে বিশ-পঁচিশ মাইল এলাকার মানুষগুলিকে টেনে আনে মউমাছির মতন।

দুপুর থেকেই ভিড়। লোক আসছে তো আসছেই। গাঁগ্রামের মানুষ, মফস্বলের মানুষ। কতরকম সাজ। সাদামাটা, আবার সঙের সাজও চোখে পড়ে পুরুষদের। মেয়েদের শাড়ি জামার রঙে রঙে মেলার ছটা বাড়ে যেন। বাচ্চাকাচ্চাদের গায়ে বাহারি জামা।

দোকান-পশারও কম কী! একটি পাশে চাল ডালের ব্যাপারিরা বসে গিয়েছে, তার পাশে বাসনপত্রর দোকান। অন্যদিকে লোহার জিনিস, কড়াই খুন্তি বঁটি কাঠারি। সংসারী গেরস্ত মানুষের যা চাও প্রায় সবই জুটে যাবে। তারপর ও-পাশটিতে গেলে দেখা যাবে—শাড়ি সায়া জামা নিয়ে বসে আছে একদল, দু তিনটি লোক শীতের চাদর আর ভুট কম্বল এনেছে। মেয়েদের জন্যে কী নেই মেলায়? প্লাস্টিকের চুড়ি, নাককানের গয়না, টিপ, সস্তা স্নো পাউডার, মায় রবারের চটি।

আর সারা মেলা জুড়ে খাবারের দোকান, চায়ের দোকান। ওখানে নাগরদোলা, ঘোড়াদোলা। ম্যাজিক। জুয়া। বন্দুকের ছররা দিয়ে বেলুন ফাটানো।

বিকেল থেকে ধুলোয় ধুলোয় মেলা যেন ঝাপসা হয়ে ওঠে। ছেঁড়া শালপাতা ওড়ে, কাগজ ওড়ে, বেলুন বাঁশি বাজে বাচ্চাদের হাতে হাতে। আঁধার নামল কি নামল না—কার্তিকের পূর্ণশশী মনসাপাহাড়ের মাথার পাশ থেকে জ্যোৎস্নাধারা ছড়িয়ে দিতে লাগল। আলোটুকু ধবধবে হয়ে ফুটে উঠতে সামান্য সময় যায়। ততক্ষণে আলো জ্বলে উঠছে মেলায়। কেউ জ্বালিয়েছে ডে লাইট, পেট্রম্যাক্স, কোনো দোকানে জ্বলছে কার্বাইডের আলো, কোথাও বা

লণ্ঠন। আর ওই মাঠটুকুতে রসগানের আখড়া বসল। 'কাঁচা বয়েস দেখে ওগো নজর দেয় ভূতে, গা ছমছম করে আমার পারিনে একলা শুতে।'

মেলাটি যেন ধীরে ধীরে নিজের মতন করে পড়ে থাকল একপাশে আর পাহাড়তলি জ্বলে উঠল দপ করে, শুরু হয়ে গেল কামার্ত পুরুষ আর কামিনীর মশাল নিয়ে ছোটাছুটি, মত্ত উল্লাস। পাহাড়ের দুটি পথে তখন আলোর নাচন। পাহাড় জঙ্গল পাথর আর জ্যোৎস্নার আবরণটিকে বুঝি জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে কিছু পুরুষ আর নারী।

শিবপদ আর সহদেব কুঞ্জবাবুকে মহুয়াগাছের পাশে একটি পাথরের আড়ালে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

এখানটিতে কেউ নেই। এ পথে যাবার দ্বিতীয় কেউ আছে কি না কে জানে!

কুঞ্জবাবুর পরনে ধুতি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি, গলায় গরম সাদা চাদর। চোখে চশমা। চক্ষু দুটি বোজা নয়। চেয়ে আছেন, কিন্তু কিছুই নজরে আসছে না। অন্ধ।

"তোমরা কি চলে গেলে?" কুঞ্জবাবু ডাকলেন।

"না, যাচ্ছি।"

"সহচর, আমার মালাটি দিলে না? ফুলগুলো?"

সহদেব একটি শালপাতার বড় ঠোঙা দিল কুঞ্জবাবুর ডান হাতে, বলল, "এই নিন।"

"তোমরা যাচ্ছ?"

"খানিকটা তফাতে আছি।...থাকব আমরা।"

"সে কই? আমার সঙ্গিনী?"

"আসবে। আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন। সে আসবে।"

সহদেব আর শিবপদ নেমে এল কয়েক পা, তারপর আড়ালে চলে গেল।

কুঞ্জবাবু একা দাঁড়িয়ে থাকলেন। চোখে তিনি কিছুই দেখছিলেন না। শুধু মেলার দিক থেকে ভেসে আসা মিশ্রিত কলরোল শুনছিলেন।

অপেক্ষায় অপেক্ষায় কুঞ্জবাবুর কতটা সময় কেটে গেল তিনি বুঝলেন না, শেষে পায়ের শব্দ পেলেন।

"কে? ফুল্লরা? এলি তুই?"

সঙ্গে সঙ্গে নয়, সামান্য পরে উত্তর পাওয়া গেল, "এলাম।"

"দেরি হল তোর ?"

"কই !"

"মশালটি এনেছিস ? জ্বালা এবার।'

"জ্বালাই।"

কুঞ্জবাবু হঠাৎ বললেন, "তোর গলাটি ভার ভার কেন ফুল্লরা ? মোটা শোনায় !"

একটু চুপ। তারপর জবাব এল, "সাঁঝবেলায় চান করে শুদ্ধ হয়ে এলাম। ঠাণ্ডা লেগে গেল।"

"ও ! তা মশালটি জ্বালা।"

মশাল জ্বলল। কুঞ্জবাবু দিনমানে ক্ষীণ দৃষ্টি, নিশিকালে অন্ধ। চোখে দেখেন না, কিন্তু মশাল জ্বলে ওঠার পর আলোর ঝলকটি যেন অনুভব করতে পারছিলেন। আভাটি অনুমান হচ্ছিল।

সামান্য অপেক্ষা করে কুঞ্জবাবু বললেন, "চল তবে।"

যাত্রা শুরু হল। পাহাড়তলার এই জায়গাটি থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ির মতন—পাহাড়ের মাটি কেটে সিঁড়ি হয়েছে। তারপর বাঁক নিয়ে রুক্ষ পথটি এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে গেছে। পথের পাশে ঝোপঝাড় গাছ, লতাপাতা। নুড়ি পাথর ছড়ানো রয়েছে অজস্র। আশেপাশে বড় বড় পাথর।

কুঞ্জবাবুর ডান হাতে মালা আর ফুলের ঠোঙাটি। তাঁর বাঁ হাতটি ধরে আছে সঙ্গিনী। এক হাতে সে কুঞ্জবাবুর হাত ধরেছে অন্য হাতে মশাল।

সাবধানে পা বাড়াচ্ছিলেন কুঞ্জবাবু। অন্ধ মানুষের হাঁটা। এই পাহাড়ি পথ ধরে এমন করে তিনি কতক্ষণ হাঁটবেন, কতটা পথ হেঁটে গেলে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছতে পারবেন—তিনি কিছুই জানেন না। সহচর তাঁকে আশা দিয়ে ভরসা দিয়ে টেনে এনেছে এখানে। তিনি এসেছেন—, অন্ধ দশাটি যদি ঘুচে যায় !

কুঞ্জবাবু কথা বলছিলেন মাঝে মাঝে। জবাব বড় পাচ্ছিলেন না। তাঁর সঙ্গিনীটি নিষেধ করছিল। চড়াই পথে ওঠার সময় বেশি কথা বলা উচিত নয়, হাঁপ ধরে যায়। তা ছাড়া পথ দেখে দেখে যেতে হচ্ছে মেয়েটিকে, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে হয়ত দুজনেই পড়ে যাবে পাথরে হোঁচট খেয়ে।

ঠিক কথা। "চল তবে। আমার হাতটি শক্ত করে ধরে থাকিস।"

ধীরে ধীরে খানিকটা পথ আসা গেল।

পাহাড়তলিতে ঠাণ্ডা ছিল, শীত ছিল না। এখন ওপর-পাহাড়ে শীত

লাগছে। বাতাসও বেশি। হিম পড়ছে। কুয়াশা জমেছে চারপাশে। ঘন হয়ে আসছে ক্রমশ। কার্তিক পূর্ণিমার আলো পাহাড়িপথে গাছপালার আড়ালে কখনো দেখা দেয়, কখনো হারিয়ে যায়।

কুঞ্জবাবু অন্ধ হলেও সমর্থ মানুষ। তিনি বোধ হয় কোনো জেদ এবং আকুলতার বশে উঠেই চলেছেন। তাঁর নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমে শব্দময় হয়ে উঠল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন।

আরও খানিকটা উঠে কুঞ্জবাবু দাঁড়ালেন। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। বিশ্রাম নেবেন কিছু সময়। বললেন, "কতটা পথ এলাম রে ? বাকি থাকল কতটা ?"

"এখনও অনেকটা পথ।"

"অনেকটা ! রাত কত হল ?"

রাত বেশি হবার কথা নয়। সন্ধ্যার মুখেই যাত্রা শুরু হয়েছিল। এখন অল্প রাত। তবে পাহাড়ের এই নির্জন নিস্তব্ধ জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে মনে হয় অনেক রাত হয়ে গেল। জ্যোৎস্না-কুয়াশায় জড়ানো একটি অচেতন জগৎ যেন পাহাড়ের এই পাশটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দূরে মেলাতলা। আলোর বিন্দুগুলি জোনাকির মতন জ্বলছে। নদীর দিক থেকে মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আসছে উত্তরের, সেই বাতাস এসে বুঝি পাহাড়ের অন্য প্রান্তটিকে অস্থির করে তুলেছে। কাম-কামিনীর মত্ততা সেখানে। মশাল নিয়ে কারা ছুটে যায়, আলোর রেখাগুলি বিদ্যুতের মতন ঝলসে ওঠে, হারিয়ে যায় পরের মুহূর্তে, অন্ধকার, আবার আলো, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় গভীর অন্ধকারের বনজ লতাপাতার আড়ালে। তাদের উল্লাসধ্বনি ভেসে আসে বাতাসে।

কুঞ্জবাবুর বিশ্রাম নেওয়া শেষ হল। বললেন, "চল্ রে !... আর দাঁড়াব না। রাত হয়ে যাবে। কতটা পথ যেতে হবে আরও তাও জানি না।" বলে হাতটি বাড়ালেন, যেন ধরতে বললেন সঙ্গিনীকে। 'দেখ ফুল্লরা, চোখটি আমার দেবতাটিকে দেখছে না, মনে মনে আমি কিন্তু এখন দেখছি ওকে। সহচরটি আমায় যেমন বলেছে তেমন রূপেই। আহা, কী অপরূপ শোভা তাঁর। হে দেবতা, স্বপ্নহর, সৃষ্টির প্রথম লগ্নে দেখা দিলে সুন্দরের বেশে, সুচারু নাসিকা তব প্রসন্ন ললাট, নয়নে করুণা ঝরে, ওষ্ঠপুটে মায়াময় হাসি। বকুলসৌরভে পূর্ণ দেহ তব...' বলতে বলতে কুঞ্জবাবু থেমে গেলেন হঠাৎ। আগুনের তাত অনুভব করছিলেন। ফুল্লরা কি মশালটি ভুল করে তাঁর গায়ের কাছে এনে ফেলেছে ? বললেন, "তুই করছিস কী ! আগুনটি আমার গায়ের

কাছে এনে ফেললি। পুড়িয়ে মারবি ?"

কোনো সাড়া নেই। আগুনটি যেন আরও কাছে এনে ফেলেছে ফুল্লরা।

কুঞ্জবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। "ফুল্লরা ?"

এবার সাড়া এল। "ফুল্লরা নয়, আমি বিজলি!"

কুঞ্জবাবু হতবাক। বিভ্রমে পড়ে গেলেন। বুঝতে পারছিলেন না, ফুল্লরা কোথায় গেল! বিজলিই বা কে! এর গলার স্বরটি রুক্ষ রূঢ় হিংস্র।

"ফুল্লরা কোথায় ?"

"ফুল্লরা নেই। আমি আছি। আমিই আপনার সঙ্গে এসেছি।"

"ও!...গলাটি তাই অন্যরকম লাগছিল।...তুমি কে ? আমার সঙ্গে কেন ?"

"আমি বিজলি।...আমার বাপের নাম ছিল ইন্দর..."

"কে ইন্দর ?"

"মনোহরপুরের ইন্দর। মাঠবাগানের বাগানবাবু..."

কুঞ্জবাবুর আবছাভাবে মনে পড়তে লাগল। মাঠবাগানের ইন্দর রায় না ? খামার আর বাগান দেখত!... মনে পড়ছে। কুঞ্জবাবুর তখন জোয়ান বয়েস। বাপের ফায়ার ব্রিক্সের কারখানা। 'গোল্ডেন ফায়ার ব্রিক্স' কম্পানি। কারখানা আর জমি-জায়গা। অঢেল পয়সা। কুঞ্জবাবু বাপের ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁর ছিল অন্য নেশা আর শখ। অপচয়টা শিখেছিলেন। আনন্দ ফূর্তির জন্যে হাত বাড়াতেন সব দিকেই। কিন্তু একটা শখ তাঁর ছিল, শুধু শখ নয়, ভালবাসা। কুঞ্জবাবু নিজের একটি দল খুলেছিলেন থিয়েটারের। যাত্রা ধরনের থিয়েটার। দলটি তাঁর প্রাণ। অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন, কলকাতা থেকে সাজগোজ করিয়ে আনতেন, সরঞ্জাম আসত নানারকম। গান-বাজনার লোক রেখেছিলেন বেছে বেছে। নিজেও অভিনয় করতেন ভাল। সুন্দর চেহারা, সুন্দর কণ্ঠস্বর। রমণী-মনোহর পুরুষ।

কুঞ্জবাবু বললেন, "তুমি সেই বিজলি, ইন্দর রায়ের মেয়ে ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি এখানে কেন ?"

"কপালে ছিল তাই এখানে। ফুলু আমার মেয়ে।"

"ফুল্লরা তোমার মেয়ে!...মেয়েটি বেশ গো!...তা তুমি কেন এলে ? মেয়েটিকে আমি গলার এই হারটি দিতাম, টাকা দিতাম..."

বিজলি যেন ঘৃণার বশে মুখ ফিরিয়ে নিল। মুখ ফিরিয়ে নিতেই চোখের দৃষ্টি গেল দূরের মেলার দিকে। জ্যোৎস্না আর কুয়াশা জড়ানো আকাশতলায়

যেন একটি বিরাট আসর বসেছে যাত্রার, আলোর বিন্দুগুলি জোনাকির মতন জ্বলছে। বিজলি চোখ ফেরাল। চোখ সরাতেই অন্য দৃশ্য। ওপাশে কাম-কামিনীর বনোৎসব। পশুর মতন তছনছ করে দিচ্ছে সব কিছু।

হাতের মশালটি এইবার কুঞ্জবাবুর গায়ের কাছে নিয়ে এল বিজলি, আবার। লোকটা অন্ধ। সে তো আজ। নিশিকালে চোখে দেখে না। কিন্তু ও তো চিরকালের কামান্ধ পুরুষ। নিষ্ঠুর, শঠ, পশু। কুঞ্জবাবুর রূপ ছিল, আকর্ষণ ছিল, অর্থ ছিল। ও ছলপটু ছিল। বিজলি একদিন ওর কামিনী হয়েছিল, ভুল করে, লোভে পড়ে, বোকামি করে। কতই বা বয়েস তখন তার! এমন তো হয়। হয় না? বিজলি তো একা ওই মানুষটার মোহে পড়েনি, আরও কত মেয়ে ওর কামিনী হয়েছে। কুঞ্জবাবু তাদের মন রাখার দরকার বোঝেনি।

বিজলির হাত কাঁপছিল। এতকাল পরে সে এই কামদেবতাটিকে বড় কাছে পেয়েছে। এখন সে দেবতাটির চোখে মশালের এই আগুনটি ছুঁইয়ে দিতে পারে। বাতাসে শিখাগুলি কাঁপছে মশালের। বিজলি কি মানুষটার চোখে এই আগুনটি ছুঁইয়ে দেবে! ভোগসুখের অমন রূপবান মানুষটি বিজলির জীবনের দাহটুকু অন্তত অনুভব করুক।

কুঞ্জবাবুর চশমা পরা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিজলির মনে হল, চোখে মুখে মশালটি না ছুঁইয়েও সে বাবুটির পোশাকে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। ক্ষতি কী? মানুষটির বস্ত্র জ্বলবে। দেহ জ্বলবে। হাহাকার করে উঠবে ও। আর্তনাদ করবে। এই পাহাড়ের এমন নির্জনে কেউ তাকে দেখতে আসছে না, বাঁচাতে আসছে না।

বিজলি মশালটি কুঞ্জবাবুর গায়ের চাদরে ছুঁইয়ে দিতে যাচ্ছিল, বলল, "ফুল্লরাকে আর আপনার গলার হারটি দিতে হল না। ওটি আপনার গলাতেই থাক। মেয়েটি শুধু আমার নয়, আপনারও।"

কুঞ্জবাবু যেন আতঙ্কে হাত বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। মশালের তাতটি সরাতে চাইছিলেন গায়ের কাছ থেকে। ডান হাতের ফুলপাতার ঠোঙাটি পড়ে গেল মাটিতে বিজলির পায়ের সামনে।

সরে এল বিজলি দু পা। মাটিতে ফুলপাতা মালা ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজলি মুখ তুলল। কুঞ্জবাবুকে দেখল। হঠাৎ মনে হল, অন্ধ, অসহায়, ভীত, আর্ত মানুষ। এই মানুষটিকে আজ আর পুড়িয়ে ছাই করে কিছু কি লাভ হবে বিজলির!

বিজলি কী মনে করে বলল, "আসুন।"

"কোথায় ?"

"নিচে যাব। মশালটি নিভে আসছে।"

অন্ধ কুঞ্জবাবুর হাত ধরে বিজলি নিচে এল। পাহাড়তলায়, সেই মহুয়াগাছটির কাছে। মশালটি ফেলে দিল দূরে। নিবে আসছে আগুন।

শিবপদ আর সহদেব অপেক্ষাই করছিল। খানিকটা তফাতে। পাথর আর গাছতলার পাশে। সামান্য আগুন জ্বালিয়ে নিয়েছিল শুকনো কাঠকুটোর পাতার।

এগিয়ে এল দু'জনেই।

শিবপদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কুঞ্জবাবু বললেন, "কে ?"

"সহচর।"

"সহচর !...এ কেমন হল সহচর। পথের মাঝে কেমনটি যেন হয়ে গেল।"

"শুধুই কি ফিরে এলেন !"

কুঞ্জবাবুর অভিভূত বিমূঢ় ভাবটির ঘোর যেন কাটেনি তখনও। মনটি চঞ্চল, অন্তরটি উদ্বেল। বললেন, "বুঝি, আবার বুঝি না সহচর ! মাথাটিতে ঘোর লেগে আছে।"

সহচর বললেন, "ঘোরটি কেটে যাবে। আঁধারটি তো অল্প ছিল না...কতকাল থেকে জমে জমে আপনাকে অন্ধ করে রেখেছিল। সেটি কেটে গেল। এই সহচরটি আপনার সুখ-সম্পদের বিলাস বৈভবের দিনটিতেও আপনাকে দেখেছে। আপনি তাকে দেখেননি। জীবনের ভোগসুখের বেলাটি আপনি আপনার অর্ধেকটি ছিলেন। সুখটুকু নিয়ে জীবন তো নয় বাবু, দুঃখটুকুও তার অংশ। দিনে রাতে দিবস পূর্ণ হয়। জীবন পূর্ণ হয় শোকে তাপে ব্যথায়। আপনি বাবু, নিশিকালের নয়নটি আজ লাভ করেছেন।"

কুঞ্জবাবু নিস্তব্ধ। কোনো অলৌকিক জ্যোৎস্না যেন তাঁর শুভ্র কেশ, শ্বেত বসনকে বৃষ্টিধারার মতন সিক্ত করে তুলছিল।

শেষে কেমন আকুল গলায় তিনি ডাকলেন, "বিজলি !"

বিজলি শিবপদর সঙ্গে নীরবে হেঁটে যাচ্ছিল।

যেতে যেতে শিবপদ দাঁড়াল, বলল, "তুমি কাঁদো নাকি গো ?...আহা, কাঁদো কেন !...শাস্ত্রপুরাণে একটি কথা আছে তুমি জান না। ভগবান এই মানুষটিকে

যখন সৃষ্টি করলেন—একে একে সবই দিলেন। দেহ দিলেন, রূপ দিলেন ইন্দ্রিয়গুলি দিলেন তারপর দিলেন কাম ক্রোধ লোভ হিংসা দ্বেষ। দিয়েও তাঁর মনটি চঞ্চল থেকে গেল। কী যেন বাকি থেকে যায়? কী? তখন ভগবতীকে বললেন, এটি কেমন হল ভগবতী? মনটি যে অস্থির থেকে যায় আমার। ভগবতী তখন বললেন, প্রভু, আপনি তো আসলটিই দিলেন না। ভগবান বললেন, সেটি কী? ভগবতী বললেন, অন্তঃকরণটি দিলেন কই। ক্ষমাটি দিলেন না, ভালবাসাটি দিলেন না। ভগবান তখন ভুলটি শুধরে নিলেন নিজের। অন্তঃকরণটি দিলেন মানুষকে। ক্ষমা দিলেন, ভালবাসা দিলেন।...তুমি কাঁদো কেন বিজু। ওই অন্ধ মানুষটি তোমার হাত ধরে দেবতাটির দয়া পেল আজ। তুমি ওই দেবতাটির কামিনী গো।"

শিবপদ হাত ধরল বিজলির।

মেলায় গানের আসরে ফুলরা বসে আছে। গান শুনছে অবনীর পাশে বসে। ওদের ডেকে নিয়ে শিবপদরা বাড়ি ফিরবে।

ফুটেছে কমলকলি...

ফাল্গুনের মাঝামাঝি পলাশবনে আগুন ধরে গেল। ডাইনে খোয়াই, বাঁয়ে মউরি মাঠ। দুইয়ের মাঝখান ধরে খানিকটা এগুলেই পলাশবন। মউরি মাঠকে কেউ কেউ বলে আকাশি মাঠ। যত না মাঠ তার চেয়ে বেশি ছোট ছোট বালিয়াড়ির ঢেউ। মাঠ-শেষের আগেই আকাশ এসে মাটি ছুঁয়েছে। তারই গায়ে উড়নি নদী। কবে নাকি কোন্ অপ্সরার গায়ের উড়নি খুলে গিয়ে বাতাসে উড়তে উড়তে এসে পড়েছিল এখানে—সেই থেকে উড়নি নদী। শীর্ণ স্বচ্ছ আকাবাঁকা জলস্রোত। বর্ষায় জল থাকে, বাকি সময়টায় ঝকঝকে বালি।

এই বছরটি যেন কেমন। সবই আগে আগে। বৈশাখ পড়ল কি আকাশ জুড়ে চিতা জ্বলে উঠেছিল। সেই দাউ দাউ জ্বলনে গাছপালা পুড়ল, লতাপাতা শুকিয়ে ঝরে গেল, পশুপাখিও ঝলসে যাচ্ছিল। বর্ষাও এল ঝমঝমিয়ে। আষাঢ়েই ভরা শ্রাবণ। শরৎকালটি অবশ্য সময়মতন দেখা দিয়েছিল। তবে এবার শিউলিগাছের ডালে যেন পাতা ছিল না। পাতা ডুবিয়ে ফুল ফুটেছিল। আর রূপমণি গাছের মাথা নুইয়ে দিল পুঁতির মতন ছোট সাদাসাদা জংলি ফুল। সকাল বিকেল, শুধু ফুল ঝরে। তারপর হেমন্ত আর শীত। এল গায়ে গায়ে। মাঘের গোড়াতেই শীত মোলায়েম হল। তখন থেকেই বাতাস এলোমেলো। হাওয়া দিল বসন্তের।

মাঘের শেষে পলাশবনে রঙ ধরেছিল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি আগুন ধরে গেল।

এবারে দোল পড়েছে পয়লা চৈত্র। নীলমণির বড় আফসোস, আহা অমন ফুলগুলি সব দোলোৎসবের আগেই শুকিয়ে ঝরে যাবে!

মাধব হল নীলমণির বড় চেলা। ভাবসাব যথেষ্ট। নীলমণির আফসোস

দেখে মাধব বলত, পলাশবন রাঙা থাকল কি থাকল-না তাতে কী আসে যায় ঠাকুর! আপনার এই আখড়াটিতে তো তখন রঙ ধরে যাবে।

নীলমণির এই আস্তানাটিকে মাধব বলে, আখড়া। নীলু ঠাকুরের আখড়া। তার দেখাদেখি আরও পাঁচজন আখড়া বলতে শুরু করেছে।

নীলমণি শোনে, আর হাসিহাসি মুখ করে। এটি তার আখড়া নয়, আশ্রমও নয়, সে বলে, গৃহবাস। জায়গাটি দেখলে অবশ্য ছোটখাটো আশ্রম বলে মনে হয়।

বছর তিনেক আগে নীলমণি এই জায়গাটিতে এসে উঠেছিল। কবে কোন্ কালে এখানে একটি গড় ছিল। রাশ রাশ পাথরের স্তূপ আর বড় বড় গাছের জঙ্গল ছাড়া সেই গড়ের আর কিছু নেই। তবু নামটি থেকে গিয়েছে বাসুদেবগড়। বাসুদেব ছিল রাজা।

নীলমণির মনে ধরে গেল বাসুদেবগড়। বিঘে দেড়েক জায়গা নিল। দাম বলতে প্রায় কিছুই নয়। জংলি জায়গা—কোন্ কাজেই বা লাগে! নীলমণি ধীরেসুস্থে জায়গাটিকে ঘিরে নিল। নিজের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করল।

আজ অবশ্য নীলমণির গৃহবাসটিকে আশ্রম বলেই মনে হয়। কাঠকুটো, জঙ্গলা লতাপাতা, কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়া রয়েছে চারপাশে। কাঠের তক্তা দেওয়া দুটি সরু সরু ফটক। সামনেরটি পুবমুখো। পুবের দিকেই নীলমণির বাস।

নিজের আশ্রয়টি নীলমণি ছোটখাটো করেই গড়ে নিয়েছে। সূর্যমার্কা সস্তা পাতলা টালির ছাদ, ইটের দেওয়াল। মেঝে সিমেন্ট-বাঁধানো। গুটি তিনেক ছোট ছোট ঘর, বারান্দা। দেখতে কোঠা বাড়ির মতনই লাগে।

পশ্চিমের দিকে খড়ের ছাউনি-দেওয়া লম্বাটে এক একচালা। গাঁথনি অবশ্য ইটের। মেঝে কাঁচাপাকা, কোথাও সিমেন্ট কোথাও খোয়া-পেটানো। এই একচালার মধ্যে দশ পনেরো জন অনায়াসেই মাথা গুঁজে থাকতে পারে। দু'চারটি জংলা কাঠের তক্তপোশ পাতা থাকে। দড়ির খাটিয়াও দাঁড় করানো আছে দু'তিনটি একপাশে।

কুয়াতলার কাছ বরাবর থাকে বংশী। বংশী আর তার বউ সুবলা। একটা কচি ছেলেও আছে ওদের, ঝুমরু। বংশীদের বাড়িটি হল টিনের চালা দেওয়া।

নীলমণির এই জায়গাটিতে গাছপালাও মন্দ নয়। দু তিনটি বড় বড় গাছ: নিম আর দেবদারু। ফলের গাছ বলতে পেয়ারা, কুল। আতাঝোপ। বংশীর

হাতের গুণে শাকসবজি আনাজও ফলে : লাউ কুমড়ো, ঝিঙে, লেবু লংকা—এরকম সব। দু'পাঁচটি মামুলি ফুলগাছে ফুলও ফোটে বারো মাস।

নীলমণি একা থাকে না। সঙ্গে থাকে কনকবালা। সম্পর্কে নীলমণির বোন। নিজের নয়, সৎমায়ের মেয়ে। বোনের বাপটিও অন্য। নীলমণির থেকে বছর ছয়েকের ছোট কনক। বয়েসে যুবতী, দেখতে সুন্দরী। নীলমণি বলে, কাঞ্চনকান্তি।

পেশা বলতে নীলমণির বড় কিছু নেই। দু চারটি ওষুধবিষুধ সে তৈরি করে, গাছগাছড়ার ; সোহাগা কর্পূর লবঙ্গফুল চন্দনগুঁড়োর মলম। আরও কত কিসের মিশেল থাকে। লোকজন আসে মাঝে মাঝে, নিয়ে যায়। আশপাশের হাটেবাজারেও নীলমণির তৈরি ওষুধের শিশি, মলমের কৌটো পাওয়া যায়। মাধবই এই ব্যবস্থাটি করেছে।

নীলমণির হাতে তৈরি দুটি ওষুধের খুব সুনাম। আগুনে-পোড়া ঘায়ের জ্বালা-যন্ত্রণা কমাতে রয়েছে একটি মলম। অন্য ওষুধটি শ্লেষ্মা-রোগের। আরও একটি ওষুধ নীলমণি জানে। উন্মাদ রোগের ছোটখাট উপসর্গ দেখা দিলে তার সাময়িক উপশম সে করতে পারে। তবে এই ওষুধটি আর কতই বা কাজে লাগে!

মাধব ঠাট্টা করে নীলমণিকে বলে, "আপনি ঠাকুর বৈদ্যবংশে না জন্মালেও সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আমি বলি কী—এই আখড়াটিকে কবিরাজী ওষুধের কারখানা করে ফেলুন। আগুনে পোড়া আর কফ পিত্ত দিয়ে তো শুধু হবে না, দু পাঁচটি মেয়েলি ওষুধ বার করুন। হাটে-মাঠে বিক্রি হবে। আর একটা মাথার তেল—বলবেন—সুনিদ্রাবিলাস। মাথায় মাখলেই সুনিদ্রা। .... এই ক'টি বার করুন তো, দেখতে দেখতে লাখোপতি হয়ে যাবেন।"

নীলমণি হেসে বলে, "আমি ধন্বন্তরি হব কেন, মাধব। দু একটি ওষুধ যা জানি—সেগুলি আমার বাপ-ঠাকুরদার কাছে শিখেছি। টোটকা-টুটকি বলতে পার। দেহাতি ওষুধ।"

নীলমণি ঠিকই বলে। তার ঠাকুরদা আগে ছিলেন জরিপদার। জঙ্গলে মাঠেঘাটে জরিপের কাজ করতেন। পরে কাঠের কারবার শুরু করেন। পাহাড় জঙ্গলে ঘোরার সময় এক সাধু তাঁকে আগুনে-পোড়ার ওষুধটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুরদা সেটি পারিবারিকভাবে ব্যবহার করতেন। পাড়াপড়শিদের দিতেন।

নীলমণির বাবা কালীগঙ্গার অক্ষয় কবিরাজ মশাইয়ের কবিরাজী ওষুধের

কারবারের অংশীদার ছিলেন। পয়সাও যোগাতেন। বাবাও যেন কেমন করে দু একটি ওষুধ শিখে ফেলেছিলেন। শ্লেষ্মা আর শ্বেতী রোগের ওষুধ দুটি মোটামুটি কাজে লাগত। তা বাবা একসময় অক্ষয়কবিরাজ মশাইকে ছেড়ে আসেন। বনিবনা হচ্ছিল না।

বাবা মারা যান পঞ্চান্ন বছর বয়েসের এ-পারে। দ্বিতীয় স্ত্রীটি বেঁচে ছিল তারপর আরও বছর তিন। তার নামটি ছিল ইন্দুমতী।

নীলমণিদের সমাজটি একটু অন্যরকম। এমনটি এখন আর দেখাই যাবে না। বিশ তিরিশটি ঘর হয়ত ছিটিয়ে-ছড়িয়ে রয়েছে। কে কোথায় আছে খোঁজ পাওয়া যায় না। হিন্দু সমাজেরই মানুষ, তবু আচার আচরণে পুরোপুরি হিন্দু নয়। শোনা যায়, আদিতে এরা ক্ষত্রিয় ছিল। বাংলাদেশের বাইরের মানুষ। অচ্ছুতের অন্ন গ্রহণ করার জন্যে জাতিচ্যুত হয়। ছুট সমাজের মানুষ হিসেবে কে কবে কোন আলাদা ধর্ম ও মত অবলম্বন করেছিল—তারও কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না।

নীলমণির বাবা যখন ইন্দুমতীকে নিজের সংসারে নিয়ে আসেন, তখন ইন্দুমতী বিধবা, সঙ্গে রয়েছে কনক। কিশোরী মেয়ে। ইন্দুমতী বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী হল। বিয়ের আচার কিছুই ছিল না। একটি কাগজে লেখালিখি হল। সই-সাবুদ থাকল। বাবা তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গলায় সোনার হার পরিয়ে দিলেন, আর ইন্দুমতী বাবার হাতে একটি আঙটি।

ইন্দুমতী সেদিন থেকে বাবার স্ত্রী। বাবার ঘর, বাবার বিছানা ইন্দুমতীর নিজের হয়ে গেল। সংসারটিও।

নীলমণির মা মারা গিয়েছিল তার বাল্যকালে। ইন্দুমতী যখন এল নীলমণি তখন কৈশোর পেরিয়েছে। কনক বছর দশেকের মেয়ে। বাবার নতুন স্ত্রীকে পছন্দ করেনি সে। কনককেও নয়। তবে নীলমণি বরাবরই শান্ত নরম ধরনের বলে নিজের বিরূপতা জানাবার চেষ্টাও করেনি। সে ছাড়া-ছাড়া ভাবে থাকত, তফাতে তফাতে। কিন্তু বাবার তরফ থেকে ছেলের প্রতি কোনো অনাদর ঘটছে না দেখে, আর ইন্দুমতীও তাকে স্নেহযত্ন থেকে বঞ্চিত করছে না বুঝতে পেরে নীলমণির মন খানিকটা ঘুরল। ইন্দুমতীর গুণ ছিল, মায়া-মমতা ছিল। আকর্ষণও ছিল। নীলমণিকে ধীরে ধীরে আপন করে ফেলতে লাগল। 'মণি' বলে ডাকত তাকে। নীলমণি কিন্তু ইন্দুমতীকে মা বলতে পারত না, বলত 'ইন্দুমাসি'। বাইরের লোকের কাছে অবশ্য কখনও কখনও 'ইন্দুমা' বলত।

বাবা যখন মারা গেল নীলমণির বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ। ইন্দুমাসির সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই ভাল। চমৎকার বনিবনা। মাসির হ্যাঁ, নীলমণিরও হ্যাঁ। সেই মাসিই হঠাৎ কেমন খাপছাড়া হয়ে উঠল। কখনো অন্যমনস্ক, কখনও বিরক্ত। রাগারাগি করতে লাগল অকারণে। মাঝে মাঝে গুম হয়ে থাকত। দেখতে দেখতে মাসির হাবভাব পালটে যেতে লাগল। স্বামীর অবর্তমানে এরকম হয়েছে, নাকি মাসি নিজেকে নিরাশ্রয় বিপন্ন ভাবছে—বুঝতে পারত না নীলমণি। বাবা তাদের নিঃস্ব নিঃসম্বল করে রেখে যাননি। মাথা গোঁজার জায়গা, সামান্য জমিজায়গা, ওষুধের দোকানটা রেখে গিয়েছিলেন। নীলমণি সেসব দেখত। তাহলে মাসির এই ভয়, দুশ্চিন্তা, বিরক্তি, বিষণ্নতা কেন! কী হয়েছে মাসির?

নীলমণির যখন সন্দেহ হতে শুরু করেছে, ভাবছে—ইন্দুমাসির কি মাথার গোলমাল দেখা দিল তখন দুটো বিশ্রী ঘটনা ঘটল। ছোটখাটো দৃষ্টিকটু ঘটনা তো প্রায়ই ঘটত, সেসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি নীলমণি। কিন্তু পরে এমন দুটি ঘটনা ঘটল যে, নীলমণি আর অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করতে পারল না।

একদিন ইন্দুমাসি কনকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন সন্ধেরাত। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘের ডাক আর বিদ্যুতের চমকে কান চোখ খোলা রাখা যায় না। কনকের ঘর থেকে তাকে টেনে নিয়ে এসেছে মাসি। এনে ঢাকা বারান্দায় দাঁড় করিয়ে আঁচড়াচ্ছে, মারছে, গলা টিপে ধরছে, শাড়ি জামা টেনে খুলে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিচ্ছে। বৃষ্টির জলে, ঝাপটায় দু' জনেই ভিজে গিয়েছে। দুটি নারীই যেন নির্বাস, পরস্পর পরস্পরকে বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির মুখে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল।

নীলমণি কনককে বাঁচাল। কিন্তু বুঝল না, ইন্দুমাসির হঠাৎ এমন উন্মাদের মতন ব্যবহার কেন? মেয়েকে তো কম ভালবাসে না মাসি! শুধু যে ভালবাসে তা নয়—নিজের আঁচলে বেঁধে রেখেছে বরাবর। সেই মেয়েকে এমন করে নৃশংসের মতন কেন মারছিল মাসি? কী দোষ কনকের?

নীলমণি যখন কথাটা তুলব তুলব করছে, আর ইন্দুমাসির মাথার গোলমাল সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দেহ, তখনই একদিন মাসি তার ঘরে এসে হাজির। রাত হয়ে এসেছে, বৃষ্টি নেই, বাদলা বাতাস দিচ্ছিল।

ইন্দুমাসি কোনো ভূমিকা করল না। বলল, "আমি দু'চার দিনের মধ্যে পুরী চলে যাব।"

"পুরী! কেন?"

"সেখানে থাকব।"

"কে আছে সেখানে?"

"কেউ নেই। থাকলেও তোমাদের কেউ নয়। ...আমায় তুমি টাকা দেবে।"

"টাকার কথা পরে। আগে বলো, তুমি হঠাৎ পুরী চলে যাবে কেন? কী হয়েছে তোমার? কেন তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ? সেদিন কনককে..."

নীলমণির কথা শেষ করতে না দিয়ে ইন্দুমাসি আচমকা বলল, "ওই মেয়ের সঙ্গে তোমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। ওর বাবা তোমার বাবা নয়, আমিও তোমার মা নই। কনককে নিয়ে তুমি এখানে থাকতে পার। বিয়ে করতে পার।"

নীলমণি চমকে উঠল। মাসির মুখ দেখল। আগুনের শিখা দপ করে জ্বলে উঠলে যেমন তার ভয়ংকরতা থাকে—ইন্দুমতীর সারা মুখে চোখে সেই রকম এক ভয়ংকর ভাব। নিষ্ঠুর, হিংস্র দেখাচ্ছিল তাকে।

নীলমণি কথা বলতে পারছিল না। শেষে বলল, "তুমি পাগলের মতন কী বলছ?"

ইন্দুমতী বলল, "আমি পাগল হয়েছি। আরও বেশি পাগল হবার আগে এখান থেকে চলে যেতে চাই। কনককে তুমি কী বুঝবে! আমি বুঝি। ...ওকে তুমি কাছে রেখে দিও। অন্য কোথাও দিয়ো না। ও মরবে। তুমিও মরবে।"

নীলমণি বলল, "ঠিক আছে। এখন তুমি যাও।"

"আমি তো যাবই। কিন্তু তোমায় আমি বলে যাচ্ছি মণি, ভালবাসার তিনটি ঘর আছে। প্রথমটি চোখে ধরা পড়ে, অন্য দুটি দেখা যায় না। বড় অন্ধকার। যার ঘর সেও সেখানে হাতড়ে বেড়ায়। ...তুমি আমায় পাগল ভাব, আর যাই ভাব, আমি তোমায় আমার কথাটি বলে গেলাম। একদিন তুমি নিজেই বুঝবে।"

ইন্দুমাসি সত্যিসত্যি পুরী চলে গেল। স্বর্গদ্বারের দিকে থাকত। মাস ছয়েক পরে খবর এল, সমুদ্র মাসিকে টেনে নিয়েছে।

নীলমণি বড় দুঃখ পেয়েছিল। যে-মানুষটিকে সে বারো তেরো বছর ধরে নিত্যদিন দেখল, যাকে কখনোই খামখেয়ালি, খাপছাড়া, বোকা, স্বার্থপর, কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে মনে হয়নি, সেই মানুষই শেষপর্যন্ত কেন এমন হয়ে গেল—সে বুঝতে পারেনি। মাসি তার মেয়েকে ভালবাসত। জন্মাবধি এই

মেয়েকে নিজের বুকের তলায় রেখে মানুষ করেছে। কনক বড় হবার পর মাসি তাকে নিজের আঁচলে গিঁট বেঁধে রেখে দিয়েছিল। তবু শেষ বেলায় এমন হল কেন ?

ইন্দুমাসির স্বভাবের সঙ্গে সবই কেমন বেমানান। বাবাকে মাসি যত ভালবাসত ততই মান্য করত। বাবার কোনো কষ্ট মাসি সহ্য করতে পারত না। স্বামীর সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে এমন করে জড়িয়ে ফেলেছিল যে, নীলমণির মনেই হত না, এই স্বামী মাসির কপালগুণে নতুন করে কুড়িয়ে পাওয়া।

নীলমণিকেও কি কম ভালবাসত মাসি ! বাবা মারা যাবার পর তাকে যেন আগলে রাখতে চাইত ইন্দুমাসি। কিন্তু নীলমণি তো তখন পূর্ণ যুবক।

হয়ত মানুষের জীবন এই রকমই। যে-আকাশ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রোদে রোদে ভরা থাকে, দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে যাবার পরও যার দশপ্রান্তে নীল ছড়িয়ে থাকল—কত পাখি সাঁতার কাটল শূন্যে, বাতাসে ডানা মেলে উড়ে বেড়াল—হঠাৎ সেই শান্ত স্বাভাবিক আকাশ সন্ধের মুখে অন্যরকম হয়ে গেল। মেঘ এল, ঝড় এল, আকাশ কালো হয়ে দেখা দিল দুর্যোগ। মানুষের জীবনেও এ-রকম হয়। মাসির বেলায় হল।

মাসি মারা যাবার পর নীলমণি দেড় দু'বছর কোথাও নড়েনি। নিজের জায়গায় বসে থাকল। তার মন কিন্তু ছাড়া-ছাড়া হয়ে গেল। ভাল লাগছিল না আর। বাবার দোকান টিমটিম করে চলছিল।

কনকের বিয়ের চেষ্টা করল। মাসি থাকতেই সে-চেষ্টা হয়েছিল। কনককে রাজি করানো যায়নি। মেয়ের বয়েসও তো দেখতে দেখতে চব্বিশ পঁচিশ ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

নীলমণি নতুন করে চেষ্টা করল। পারল না। কনক যে কোন্ জেদ ধরে বসে থাকল কে জানে।

এরপর একসময় নীলমণি ঘোরাফেরা করতে বেরিয়ে এই বাসুদেবগড়ে। জায়গাটা তার ভাল লেগে গেল।

নিজেদের ঘরবাড়ি, দোকান, জমিজায়গা যা ছিল বেচে দিয়ে একদিন নীলমণি চলে এল এখানে। তারপর তিনটি বছর কেটে গেল।

দুই

সে-দিন মাধব এল বিকেলের গোড়ায়। সাইকেল থেকে নামতে নামতে বলল, "ঠাকুর, রেল স্টেশনের মাস্টারবাবু এটি গছিয়ে দিলেন। বললেন, ও মাধব—এটি নিয়ে যাও, তোমাদের নীলমণিবাবুর জিনিস।" বলতে বলতে মাধব একটা ক্যাম্বিসের মাঝারি ব্যাগ সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের কাছ থেকে নামিয়ে নিচে রেখে দিল।

গরম পড়ে আসছে। সকালের দিকটায় মরা শীতের ভাব থাকে, কুয়াশাও জড়ানো থাকে মাঠেঘাটে, কোনোদিন পাতলা কোনোদিন ঘন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের সিরসির ভাবটা কেটে যায়। বেশি বেলায়, গরম লাগতে শুরু করে, তারপর দুপুর নাগাদ মনে হয়—মউরি মাঠ আর পলাশবনের দিক থেকে এলোমেলো দমকা বাতাসের সঙ্গে বুঝি চৈত্রমাসটাও এসে পড়ল। তখন বেশ গরম। আকাশও ঝকঝক করছে, সূর্য জ্বলছে। ফাল্গুন মাস শেষ হতে চলল। দুপুরের দিকটা এই রকমই হবে। সন্ধেবেলায় আবার সব বদলে যেতে শুরু করে। রাত্রে শীত আছে এখনও। বনজঙ্গলের জায়গা, ফাঁকা, শীত ফুরোতে সেই চৈত্র।

মাধব ঘেমে গিয়েছিল। স্টেশন এখান থেকে মাইল দুই। বোধহয় সরাসরি সেখান থেকেই আসছে সাইকেল চালিয়ে পড়ন্ত রোদের মধ্যে।

নীলমণি ব্যাগটা দেখল। হাত দেড়েক লম্বা। পেট মোটা। একরঙা নয়, নীল-কালোর চৌকো-কাটা। ছোট্ট এক টিপ-তালা লাগানো মাঝ-মধ্যে।

নীলমণি বলল, "কার ব্যাগ ?"

"তা জানি না।" মাধব এবার ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, "ও দিদি, বাইরে জল দিন, গলা শুকিয়ে মরছি।"

নীলমণি একটা কাঠের নিচু চৌকির ওপর বসে ছিল। ছোট ছোট কাঠের চৌকি দু'তিনটে পাতা থাকে বারান্দায়। বেঞ্চিও আছে একটা। বারান্দায় রোদ নেই এখন। ছায়াও অনেক ঘন। রোদ এখন পশ্চিমে।

ব্যাগটা দেখতে দেখতে নীলমণি বলল, "মাস্টারবাবু ব্যাগটা দিলেন, কিছু বললেন না ? কার ব্যাগ, কে রেখে গেল ?"

মাথা নাড়ল মাধব। পকেটের ময়লা রুমাল দিয়ে তখনও মুখ গলা ঘাড় মুছে নিচ্ছিল। বলল, "মাস্টারবাবু বললেন, তিনি কি আর লোকটিকে দেখেছেন ! গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে—একটি প্যাসেঞ্জার হঠাৎ ব্যাগটি প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে দিয়ে রেলের কুলিকে বলে—এখানে পৌঁছে দিতে। পরে

মানুষটি আসছে।"

নীলমণি অবাক হল। প্ল্যাটফর্মে ব্যাগ ফেলে দিয়ে বলে গেল তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। অদ্ভুত লোক তো! সে যাচ্ছিল কোথায়? কেনই বা নীলমণিদের কাছে ব্যাগটি পৌঁছে দিতে বলল! নীলমণি বলল, "স্টেশনের মুটেও তাকে দেখেনি?"

"নজর করে দেখতে পারেনি।"

নীলমণির এখানে খানিকটা খ্যাতি রয়েছে। ফাঁকায়, একপাশে বনজঙ্গলে যেভাবে সে পড়ে থাকে—যেমন করে তার গৃহবাসটিকে গড়ে তুলেছে সে, টোটকাটুটকি ওষুধপত্র দেয়—তাতে অনেকেই মনে করে মানুষটি আশ্রমবাসী। সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রম নয় ঠিক, তবে আশ্রমই। নীলু ঠাকুরের আখড়া। এই খ্যাতির জন্যই বোধ হয় প্ল্যাটফর্মে ফেলে দেওয়া ব্যাগটি স্টেশনের মাস্টারবাবুর কাছে গচ্ছিত করে দিয়েছে কুলিটি।

কনক এল। হাতে জলের মগ আর গ্লাস। জল দিল মাধবকে।

নীলমণি তখনও ব্যাগ থেকে পুরোপুরি চোখ সরাতে পারেনি। কনককে বলল, "ওই ব্যাগটি দেখেছ! স্টেশনে কে যেন ফেলে গিয়েছে। বলেছে এখানে পৌঁছে দিতে।"

কনক ব্যাগটি দেখতে দেখতে বলল, "কার ব্যাগ? কখন ফেলে গিয়েছে?"

মাধব বলল, "মাস্টারবাবু বললেন, কাল সন্ধের গাড়িতে। এক প্যাসেঞ্জারবাবু ব্যাগটা প্লাটফর্মে ফেলে দিয়ে খালাসিকে বললেন, নীলু ঠাকুরের আস্তানায় পৌঁছে দিতে। পরে তিনি আসছেন।"

কনক বলল, "কেমন বাবু? খালাসি দেখেনি?"

"খেয়াল করেনি। সন্ধেবেলা। এখানের প্লাটফর্মে আলোও দু'তিনটি।"

নীলমণি কনককে বলল, "কে হতে পারে? কার ব্যাগ? আগে এ-ব্যাগ দেখেছ?"

মাথা নাড়ল কনক। সে জানে না।

নীলমণি কী ভেবে বলল, "ভেতরে নিয়ে গিয়ে রেখে দাও, পরে দেখা যাবে।...আর যারই ব্যাগ হোক সে তো আসছেই আজকালের মধ্যে।"

কনক আরও খানিকটা জল দিল মাধবের গ্লাসে। তারপর ব্যাগটা তুলে নিল। নিয়েই বলল, "মুখের তালাটা তো খোলা!"

নীলমণি অতটা লক্ষ করেনি আগে। মাধবও নয়। ছোট সস্তা টিপ-তালা—চট করে চোখেও পড়ে না খোলা না বন্ধ!

মাধব বলল, "তাহলে প্ল্যাটফর্মে ফেলে দেবার সময় খুলে গেছে। চলন্ত গাড়ি থেকে ছুঁড়ে জিনিস ফেললে কি ওই তালা ঠিক থাকে! কতটুকু জান ওর।"

ঠিক কথা। নীলমণি যেন মাথা নাড়ল।

কনক চলে গেল ব্যাগটা নিয়ে।

জল খেয়ে জিরিয়ে মাধব এতক্ষণে আরাম পেল।

নীলমণি এবার বলল, "তোমার লোকদুটি কবে আসবে মাধব?"

"কাল থেকেই আসার কথা। নয়ত পরশু থেকেই আসবে।...হাতে এখনও সময় আছে, ঠাকুর। দোল পড়তে এখনও সাতদিন।"

নীলমণি বলল, "দু'একদিনের কাজ। মাঠটুকু সাফসুফ করে দেবে। আর ওই চালাটি সামান্য মেরামত করে দেবে। বংশীও হাত লাগাবে ওদের সঙ্গে।"

মাধব সবই জানে। প্রতি বছরই যেমন হয় এবারও তাই। দোলের দু একদিন আগে থেকেই নীলমণি ঠাকুরের দু' দশজন চেলাচেলি আসে। এরা সব নীলু ঠাকুরের চেনাজানা, অনুগত, বন্ধুটন্ধু। কেউ একা আসে, কেউ আসে জোড় বেঁধে। আসে বেড়াতে, দোলের সময় হইচই করতে, ফাগ ওড়ায়, ঘোরেফেরে, গান গল্পগুজব করে দু'চারটি দিন এই আখড়া জমিয়ে রেখে আবার ফিরে যায়। মাধবও ওদের মধ্যে অনেককে চেনে; বলরামবাবু, সুখময়বাবু, কেদার, রায়বাবু—অনেককেই। মেয়েদের মধ্যেও চেনে লীলাদিদিকে, বেণুদিদিকে, হাসি আর মাধুরীদিদিকে। চেনার সঙ্গে অচেনাও দু একজন এসে যায়। আবার এ-বছর যারা এসেছে, তারা সবাই পরের বছর যে আসতে পারে, তাও নয়। গত দুটি বছর এরকমই দেখছে মাধব।

নীলমণি বলল, "তুমি আজ কিছু টাকা নিয়ে যাও না কেন, মাধব। কনকের সঙ্গে বসে কথা বলে নাও। চালটি ডালটি তেল মশলা কিনে রাখতে হয় এবার।"

মাধব বলল, "আমার খেয়াল আছে। গড়াই মশাইকে বলে রেখেছি। অসুবিধে হবে না। তবে একটা কথা ঠাকুর?"

নীলমণি তাকাল।

মাধব বলল, "খরচটি তো আপনার মন্দ হয় না। দশ পনেরোটি লোক খায়দায়, তাদের চা পান এটি ওটিও রয়েছে। গড়ে একশো শোয়াশো টাকা। পাঁচ সাত দিনে পাঁচ সাত শো টাকা। আপনি এতগুলো টাকা খরচ করেন।

তা করুন, আপনার লোকজন, অতিথি, কটি দিন আনন্দ করতে আসেন সবাই। আপনারাও একা পড়ে থাকেন।...কিন্তু ঠাকুর, খরচাটি তো তুলতে হবে। একটি দুটি ওষুধ আরও বাড়ান। দাশরথিবাবু বলছিলেন, কুষ্ঠ রোগটি এদিকে বেশি। লোকে ভয়ও পায়। হাসপাতাল সেই তিরিশ চল্লিশ মাইল তফাতে। মণ্ডল পাদ্রিবাবার কুঠো আশ্রমটিও কম দূর নয়। সেখানে আসল কুঠোরা থাকে। তাও দশ পনেরোটি। একটি ওষুধ যদি বার করেন—বিক্রি হবে।"

নীলমণি সব শুনল। বলল, "আমার যে জানা নেই মাধব। ...কাজে লাগবে না, মিথ্যে একটি ওষুধ বিক্রি করে কী লাভ! সাতশো হাজারটি টাকা যদি আমার খরচা হয় এ-সময়ে হোক। বাপের কৃপায় এখনও সামান্য কিছু আছে আমার। চলে যাবে। তুমি ভেব না।"

মাধব চুপ করে বসে থাকল। তারপর হেসে বলল, "ঠাকুর, আপনার লাখোপতি হওয়া হল না।"

তিন

নীলমণির ঘরে ব্যাগটি রেখে দিয়েছিল কনক।

সন্ধেবেলায় নীলমণি কোনো কোনো দিন বইপত্র পড়ে : রামায়ণ মহাভারত চরিতামৃত ; কোনোদিন কবিরাজী চিকিৎসার বই, কোনোদিন বা এস্রাজ বাজায়। নীলমণি গাইতেও পারে। তবে তার গলার স্বর নরম, উঁচুতে চড়তে পারে না, চেষ্টা করলে কাশি এসে যায় বলে গান সে বড় একটা গায় না।

নীলমণি একটা বই নিয়েই বসবে ভাবছিল। লণ্ঠনটা সরাতে গিয়ে ব্যাগটা চোখে পড়ল।

কনক কী কাজে ঘরে এসেছিল, কাছেই ছিল। নীলমণি ব্যাগটা দেখতে দেখতে বলল, "এ তো বড় অবাক কাণ্ড দেখছি, কনক।"

"কী ?"

"লোকটা কে ? গাড়ি থেকে ব্যাগ ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল ! এখানেই যদি আসছিল তবে আবার গেল কোথায় ? কী আছে ব্যাগে ?"

কনক বলল, "জামাকাপড় আছে হয়ত। হালকা।"

"এখানেই আসছিল শুনলাম। কে আসছিল ? আর যদি আসছিল তো নেমে গেলেই তো পারত। জিনিস রেখে চলে গেল !" বলেই নীলমণি থেমে গেল। তারপর হঠাৎ তার কী মনে পড়ে গেল। অবাক গলায় বলল,

"শিতিকণ্ঠ নয় তো ?"

কনকও যেন শিতিকণ্ঠর নাম শুনে অবাক হল। নীলমণিকে দেখল কয়েক পলক, তারপর ক্যাম্বিসের ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে থাকল। "ওর কি আসার কথা ছিল ?"

"জহরকে নাকি বলেছিল দোলের সময় আসবে। জহর চিঠিতে লিখেছিল।"

কনক কথাটা জানত না। জহরদাদার চিঠির কথা সে শুনেছে। এই ক'দিন মাত্র আগে চিঠি এসেছে জহরদাদার। দোলের সময় আসছে না এবার। গতবারও আসতে পারেনি।

"নিশ্চয় শিতিকণ্ঠ," নীলমণি বলল, "ও ছাড়া এমন সব কাণ্ড আর কে করবে !"

কনক বলল, "আমায় তো তুমি বলোনি। কেমন করে জানব !"

"ভুলে গিয়েছি। তা ছাড়া জহরের চিঠি। শিতিকণ্ঠ নিজে লেখেনি। ও কী বলেছে জহরকে, শিতির কথার কি ঠিক আছে। দেখা হয়েছে, বলেছে, ফুরিয়ে গেছে। আমি নিজেই বিশ্বাস করিনি।"

কনক কিছু বলল না।

নীলমণির কৌতূহল যেন বেড়ে গেল। বলল, "ব্যাগটার তালা খোলা ?"

কনক মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

কী খেয়াল হল নীলমণির, কৌতূহল যেন ক্রমশই বাড়ছিল। মজাও লাগছিল। বলল, "দেখি কী আছে ? শিতি আমার সঙ্গে চালাকি করতে চাইছে ! আমায় বোকা বানাবে !"

কনক ইতস্তত করল। "খুলে ফেলব ?"

"খুলে ফেলো।"

"আজই যদি এসে পড়ে ! বা কাল ?"

"আজ আর কখন আসবে ! সন্ধে তো হয়েই গেছে। কাল আসতে পারে। আসুক।.... ও আমার সঙ্গে মজা করবে, ধোঁকা দেবে—আমি ওর সঙ্গে মজা করতে পারব না !" নীলমণি ছেলেমানুষি গলায় বলল, হাসতে হাসতে।

কনক ব্যাগের মুখে লাগানো আলগা তালাটা খুলে ফেলল। স্ট্র্যাপ ছিল দু পাশে দুটো। খুলে নিল।

নীলমণি হাসিমুখে তাকিয়ে থাকল।

কনক ব্যাগ খুলে হাত ঢোকালো ভেতরে। যা ভেবেছিল সে, ঠিক তাই।

জামাকাপড়ই রয়েছে ব্যাগের মধ্যে।

প্রথমেই কনক একটা চাদর বার করল। গরম চাদর। ঘন খয়েরি রঙের। সামান্য কাজ আছে পাড়ের দিকে। দেখাল নীলমণিকে।

হাত বাড়াল নীলমণি। "দেখি।"

হাতে নিয়ে দেখল নীলমণি। মাথা নাড়ল।

কনকও বুঝতে পারল না। শিতিকণ্ঠকেই কতকাল দেখেনি।

চাদরের পর একে একে অনেক কিছুই বেরুলো ব্যাগের মধ্যে থেকে। জামা দু'তিনটি, ধুতি একজোড়া, গেঞ্জি, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, আয়না, চিরুনি, মায় কাগজে মোড়া চামড়ার চটি।

নীলমণি বড় অবাক হয়ে যাচ্ছিল। একটি জিনিসও সে চিনতে পারছিল না। না-চেনা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। আজ চার বছরের মধ্যে শিতিকণ্ঠকে মাত্র একবার সে দেখেছে। এখানে নয়, পুরনো বাড়িতে।

কনক তখনও ব্যাগের মধ্যে হাত ডুবিয়ে হাতড়াচ্ছিল। এবার একটা চশমার খাপ বার করল। করে খাপটা খুলল। স্টিল ফ্রেমের চশমা। গোল কাচ।

নীলমণি বলল, "শিতি নয়। শিতি চশমা পরে না।"

কনকও জানে শিতিকণ্ঠ চশমা পরে না। তবে হালে যদি নিয়ে থাকে চশমা—কে বলতে পারে! চশমার খাপ রেখে দিয়ে কনক ব্যাগটা এবার উলটে দিল। যদি কিছু থেকে থাকে ভেতরে।

ব্যাগ ওলটানোর পর মামুলি একটা খাম পাওয়া গেল। সাদা খাম। ভাঁজ করা। খামের মধ্যে আধ-ছেঁড়া তুলসীর মালা। দেখে তেমনই মনে হল।

নীলমণি যেন খুবই হতাশ হয়ে পড়েছে। গাল চুলকে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "কনক, হেরে গেলাম। শিতি নয়।"

কনক বলল, "কে তবে?"

"বুঝতে পারছি না। শিতি ছাড়া এরকম কাজ তো অন্য কেউ করবে না। শিতি বরাবরই রগুড়ে! ওর মাথায় খেলেও নানারকম। কাণ্ডজ্ঞান নেই।"

কনক জিনিসগুলো গুছিয়ে ব্যাগে ভরতে লাগল।

নীলমণি কনককে দেখছিল। শিতিকণ্ঠ এলে কনক কি খুশি হত? এক সময় কনকের সঙ্গে শিতির সম্পর্ক ভালই ছিল। শিতি কনককে পছন্দ করত। কনকের জন্যে তার দুশ্চিন্তাও দেখেছে নীলমণি। ইন্দুমাসির ইচ্ছেও ছিল, কনকের সঙ্গে শিতির বিয়ে হয়ে যায়। শিতি ভাল ছেলে, দেখতেও সুপুরুষ। ঝকঝকে চেহারা। স্বভাবও ভাল। খুবই জীবন্ত ধরনের। এক সময়

চাকরিবাকরি করত, পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নেমেছিল। ফলপাকড়ের মোরব্বা, আচার, সস—এটাসেটা করত। খারাপ চলত না তার ব্যবসা।

নীলমণি নিজেও শিতিকণ্ঠকে বলেছিল কনককে বিয়ে করার জন্যে।

শিতিকণ্ঠ হাসত। বলত, 'গাছের ফল না পাকলে হয়? ফল পাকতে দাও।'

নীলমণি পালটা জবাব দিত হেসে, 'পাকার ভরসায় বসে থাকলে যে কোনদিন ঝড়ে ফল এমনিতেই পড়ে যাবে হে!' ইন্দুমাসির সঙ্গে তার মেয়ের তখনকার সম্পর্কের কথা ভেবেই বলত সে কথাটা।

শিতিকণ্ঠ কোনো জবাব দিত না।

নীলমণির কেমন দ্বিধা হত। বলত, 'আমাদের কোনো সমাজ নেই, ছুট সমাজ্ঞী, এতেই কি তুমি...!'

'রাম রাম! ও আবার কী বলছ নীলু! ওসব সমাজফমাজে আমার কাঁচকলাটি হবে। না হে, কথা তা নয়। আসলটি হল কনক। সে যখন রাজি হবে, আমি হাজির হব।'

কনকই রাজি হচ্ছিল না। ইন্দুমাসির চেষ্টার শেষ ছিল না। মেয়েকে কত কী বোঝাত! মেয়ে অবুঝ।

এরপর থেকেই ধীরে ধীরে ইন্দুমাসির মন পালটাতে লাগল। স্বভাব রুক্ষ হয়ে উঠল। কেমন এক সন্দেহ আর রাগ তাকে খেপিয়ে তুলতে লাগল।

শিতিকণ্ঠ কেন, কনক যদি অন্য কাউকে বিয়ে করত—তাতেও মাসি আপত্তি করত না। কিন্তু কনককে কিছুতেই নোয়ানো গেল না।

নীলমণি নিজে কনকের সঙ্গে কথা বলেছে।

কনক তার জেদ ভাঙেনি। কথার জবাবও দিত না ভাল করে। রূঢ়ভাবে কিছু বলতে গেলে বলত, 'তোমার বাড়িতে যদি রাখতে ইচ্ছে না থাকে বলে দাও, আমি চলে যাব।'

'কোথায় যাবে?'

'রাস্তায় বেরিয়ে ঠিক করব।'

'মেয়েরা রাস্তায় বেরিয়ে কোথায় যায়?'

কনক ঘুড়িয়ে জবাব দিত। 'এ বাড়ি আমার বাবার নয়, এখানে আমি নিজের জোরে থাকতে পারি না। পেতেও পারি না। মা আমায় নিয়ে এসেছিল। মা বলতে পারে, এ তার দ্বিতীয় স্বামীর বাড়ি। আমি কিছু বলতে পারি না। তোমার বাবা আমার বাবা নয়, তোমার বাড়িঘর আর মায়ের বাড়িঘর

থেকে আমায় তাড়িয়ে দিলে আমি চলে যাব। তারপর কী হবে—সে জেনে তোমাদের কী দরকার।'

ইন্দুমাসি ভেতরে ভেতরে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে জ্বলছিল বোধ হয়। জ্বলতে জ্বলতে তার মাথার গোলমাল শুরু হল। শেষ পর্যন্ত মাসি একদিন মেয়েকে যেন আর সহ্য করতে পারল না। তাকে টেনে নিয়ে এল বারান্দায়। মেয়েকে অনাবৃত করে দেখতে চাইল সে কত কী লুকিয়ে রেখেছে ভেতরে। হয়ত আক্রোশ আর ঘৃণার বশে ইন্দুমাসি মেয়ের গলা টিপে ধরত। বা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিত।

নীলমণি শেষটুকু আর গড়াতে দেয়নি।

এরপরই মাসি তার যা বলার নীলমণিকে বলে পুরী চলে গেল। সেখানে মাসি কেমন ছিল বলা মুশকিল। খোঁজখবর করেও নীলমণি সব জানতে পারত না। সে আজও জানে না ইন্দুমাসি সমুদ্রের জলে ভেসে গিয়েছিল নাকি আত্মহত্যা করেছিল।

কিন্তু নীলমণি তার আগে থেকেই কনককে আর জোর করে কিছু বলেনি। তার ভয় ধরে গিয়েছিল। ভয়, ভাবনা, দ্বিধা।

তার চেয়ে এই ভাল। কনক থাক। নিজের মতনই থাক। সে একেবারে মূর্খ নয়, লেখাপড়া শিখেছে খানিক, বোধবুদ্ধি আছে ; স্বভাবটিও হালকা নয়। নিজের চারপাশে যে বেড়াটি বেঁধে রেখেছে তা ডিঙিয়ে যাওয়া কঠিন। অথচ কনক সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করতে পারে, স্বাভাবিক ভাবেই। তার গাম্ভীর্য অন্য ধরনের। নীলমণি নিজেই ঠাট্টা করে বলে, মুখটিতে তোমার মেঘ জমে থাকে না—এটাই ভাল কনক ; রোদটি আকাশে লেগে থাকলে তবেই না ভাল লাগে। তা কনকের মুখে সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্যটি রয়েছে। সে চঞ্চল নয়, চপল নয়, কিন্তু লাবণ্যময়।

নীলমণি আরও একটি জিনিস লক্ষ করেছে। ইন্দুমাসির সঙ্গে শেষের দিকে তার মেয়ের যা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল তাতে কনক দিন দিন কঠিন, অত্যন্ত গম্ভীর, একা একা হয়ে উঠেছিল। মাসি মারা যাবার পর কনকের সেই অবস্থাটি পালটাতে শুরু করে। এখানে আসার পর কনক যেন কত পালটে গিয়েছে। তার ক্ষোভ নেই, বিরক্তি নেই, উদ্বেগ নেই। সে সহজ স্বাভাবিক। পরিশ্রমও কম করে না এখানে। নিত্যদিনের কাজকর্ম তো আছেই—তার ওপর রয়েছে নীলমণির কাজে হাত লাগানো, গাছগাছড়া শেকড়বাকড় এটিসেটি নিয়ে যারা আসে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, দামদস্তুর করে টাকাপয়সা মেটানো।

মাধবের সঙ্গে কনকের একটা গোপন শলাপরামর্শও হয়—ওষুধপত্রের বেচাকেনার দাম নিয়ে—নীলমণি সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু কনক বা মাধব তাকে এই পরামর্শের মধ্যে ডাকতে চায় না। বংশী আর তার বউও কনকের কথাতেই চলে ; এই যে নীলু ঠাকুরের আখড়াটি এমন পরিচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—তার যেটুকু শ্রী—সবই কনক আর বংশীর দৌলতে !

নীলমণি কনককে নিয়ে আর ভাবে না। নিজের মতনই থাকুক কনক, স্বস্তিতে থাকুক—নীলমণি তাকে আর উত্যক্ত করবে না। বয়েসও তো কম হল না কনকের। তিরিশ ছাড়িয়ে গেল।

ব্যাগ গোছানো হয়ে গিয়েছিল কনকের।

নীলমণি বলল, "আমাদের সঙ্গে এ-খেলাটি কে খেলল বলো তো ?" বলে হাসল।

কনক বলল, "আমারও মাথায় আসছে না।"

"তা যেই খেলুক, সে গেল কোথায় ? আসবে কবে ?"

কনক জায়গামতন ব্যাগটি রেখে দিল। দিয়ে বলল, "আসবে কাল পরশুর মধ্যেই। জিনিস ফেলে গেল, না এসে যাবে কোথায় ?"

নীলমণি মাথা নাড়ল।

কনক আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকার পর নীলমণি যেন সামান্য পায়চারি করল। তারপর এগিয়ে গিয়ে কাঠের তাক থেকে একটি বই টেনে নিল। পড়বে কিছুক্ষণ।

চার

তখনও ভাল করে রোদ ওঠেনি, 'কুসুম-ভোর'। আকাশ যেন সদ্য ঘুমভাঙা চোখ মেলছে। চারপাশ কুয়াশা জড়ানো ; ঘাস লতাপাতা হিমে ভিজে রয়েছে, কার গলা বুঝি নীলমণির ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

ঘুমভাঙা আলস্যের মধ্যেই নীলমণি শুনল কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাইছে—'ফুটেছে কমলকলি, আপনি এসে জুটলো অলি। সে কেন শুনবে মানা, মিছে তাকে বলাবলি। ফুটেছে কমলকলি...'

নীলমণির ঘোর ভেঙে গেল। কার গলা ! কে গাইছে ? ইন্দ্রদা না ? ইন্দ্রদা !

স্বপ্ন দেখছে না তো নীলমণি !

বিছানায় উঠে বসল সে। গান আরও স্পষ্ট, আরও জোর; 'ফুটেছে কমলকলি, আপনি এসে জুটলো অলি...'

ইন্দরদা ! এ-গান সে-ই শুধু গায়।

নীলমণি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে জানলার কাছে গেল। দুটি জানলার কোনোটাই এখনও পুরোপুরি খুলে রাখা যায় না। মাঝরাতে জঙ্গলের শীত আর হাওয়া এসে শরীর কনকনিয়ে দেয়। একটা জানলার সামান্য খোলা থাকে।

গায়ে চাদর জড়াতে জড়াতে নীলমণি জানলার পাট খুলে দিল। ওই তো ইন্দ্রদা। বারান্দায় উঠে পড়েছে। গান গাইছে চেঁচিয়ে : 'যারে যে ভালবাসে সে যায় তার পাশে। জেনো লো প্রেম যেখানে, সেখানে ঢলাঢলি। ...ফুটেছে কমলকলি...।'

ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল নীলমণি। "ইন্দরদা !"

ইন্দ্র তখনও গান থামায়নি। বরং আরও জোরে গাইতে লাগল : 'যারে যে ভালবাসে সে যায় তার পাশে। জেনো লো প্রেম যেখানে, সেখানে ঢলাঢলি...'

নীলমণি হাসতে লাগল। বিচিত্র বেশ ইন্দ্রর। পরনে এক মোটা পাজামা, গায়ে খদ্দরের পুরু পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির ওপর করকরে এক জহরকোট, মাথায় টুপি, গলায় মাফলার, একটা বেয়াড়া রঙের গরম চাদরে গা-কোমর জড়ানো। পায়ে মোজা আর কাপড়ের মোটা জুতো। কাঁধে মোটাসোটা ঝোলা। বগলে এক কম্বল। বান্ডিল করা।

নীলমণি এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে বলল, "গান থামাও তো। সাতসকালে হচ্ছেটা কী ?"

ততক্ষণে কনকও তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। বাসী কাপড়, সামান্য এলোমেলো, গায়ে চাদর। চাদরে মাথার খানিকটা ঢাকা। কপালে গালে চুলের গুচ্ছ।

ইন্দ্র দু' পলক দেখল কনককে। তারপর হেসে কিছুটা পিঠ নুইয়ে মাথা নিচু করে যেন যাত্রার কায়দায় কুর্নিশ জানাল। গান গেয়ে গেয়ে বলল, "ফুটলো কমলকলি, আপনি এসে জুটলো অলি। আহা এই ভোরে কনকবালার মুখটি দেখে প্রাণটি ভরে গেল।"

কনক হেসে ফেলল।

নীলমণি বলল, "মজাটি তবে তুমিই করেছিলে ?"

"আমি তো মজারই লোক। নিজে মজি অপরকে মজাই। তুমি কোন মজাটির কথা বলছ নীলুবাবু ?"

"ব্যাগটি স্টেশনে ফেলে দিয়ে গেলে ?"

ইন্দ্র তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল নীলমণিকে। "ব্যাগ! কই না! আমি তো ফেলে যাইনি কিছু।"

নীলমণিও অবাক। "তুমি ফেলে যাওনি ?"

মাথা নাড়ল ইন্দ্র।

"তোমার জিনিসপত্র কই ?"

কাঁধের ঝোলাটি দেখাল ইন্দ্র, আর বগলের কম্বলটি। কম্বলটি গুটিয়ে পাট করা, দড়ি দিয়ে বাঁধা।

নীলমণি বলল, "তুমি নও! তা হলে... ? আশ্চর্য!" বলে কনকের দিকে তাকাল।

ইন্দ্র বলল, "হয়েছেটা কী ?"

নীলমণি বলল, "কে একজন স্টেশনে তার ব্যাগ রেখে দিয়ে গিয়েছে। বলেছে এখানে পৌঁছে দিতে। স্টেশনের মাস্টারবাবু কাল ব্যাগটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ....কার ব্যাগ বুঝতে পারছি না। হুট করে তুমি এসে হাজির হলে ভাবলাম তোমারই ব্যাগ। আমাদের সঙ্গে বুঝি মজা করছিলে!"

ইন্দ্র কনকের দিকে তাকাল। বলল, "ছোট জিনিস ফেলে যাবার পাত্তর আমি নই গো নীলুবাবু! ফেলেই যদি যাব, বড় জিনিস রেখে যাব, না কি গো কনকবালা!"

কনক হাসল। বলল, "তা হঠাৎ বুঝি আমাদের মনে পড়ল ?"

"কথাটি তুমি বললে ঠিকই, তবে আমার একটি জবাব আছে। এই যে আকাশটি দেখছ, এর মধ্যেও একটি হঠাৎ থাকে। হঠাৎ মেঘ হয়, মেঘ ডাকে, বৃষ্টি নামে ; আমার হঠাৎটিও তেমন, ছিল সবই, হুট করে চলে এলুম।"

নীলমণি হাসতে হাসতে বলল, "তা তোমার ঝোলাটি, বগলের কম্বলটি নামাবে, না, দাঁড়িয়ে থাকবে ঠায় ?"

ইন্দ্র বগল থেকে কম্বলের বান্ডিলটি নামাল। নীলমণি হাত বাড়িয়ে নিল সেটি।

"ইন্দরদা, তুমি কি পথ ভুলে চলে এলে ?"

ইন্দ্র তার কাঁধ থেকে ঝোলাটি নামাচ্ছিল। এটিও ব্যাগের মতন দেখতে। মোটা কাপড়ের। মোটামুটি ভারী। ঝোলা নামাতে নামাতে ইন্দ্র বলল, "পথ

ভুলে নয় নীলুবাবু, পথ খুঁজে। কদিন আগে ব্যান্ডেল স্টেশনে সুখময়বাবুর সঙ্গে দেখা। গাড়ি আর আসে না। দুজনে ছিলাম অনেকক্ষণ। তিনি বললেন, তুমি এখন দিব্যি এক আশ্রম বানিয়েছ! মনোহর আশ্রম। গাছ লতাপাতা ফুল পাখি, বনজঙ্গল নদী..., জায়গাটিতে এলে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়।...তারপর শুনলাম, তোমার এই আশ্রমটিতে দোলের সময় উৎসব হয়। রাধাকৃষ্ণর মন্দির বানিয়েছ নাকি নীলুবাবু?" হাসতে হাসতে মজার গলায় বলছিল ইন্দ্র।

নীলমণি হেসে বলল, "না, মন্দির নেই। এখন পর্যন্ত শখ হয়নি বানাবার। এই সময়ে এখানে এসে থিতু হলাম। জায়গাটি বড় ভাল। বসন্তকালে চারদিকে রঙ ধরে যায়। দু' একজনকে হাতেপায়ে ধরে ডাকলাম। তারা এল। তারপর ওই—দু চারটি দিন বন্ধুবান্ধবে মিশে হইরই হয়। ভাল লাগে।"

ইন্দ্র বলল, "তা ভাল। বেশ করেছ।...আমি কিন্তু উৎসব করতে আসিনি। এসেছি আমার কমলকলিটিকে দেখতে।" বলে কনকের দিকে তাকিয়ে হাসল। "ফুটলো কমলকলি, আপনি এসে জুটল অলি।...সুখময় বললেন, কলিটি এখন পুরোপুরি ফুটে গিয়েছে..."

কথা থামিয়ে কনক রগড় করে বলল, "গন্ধ পেয়েছ নাকি?"

"গন্ধে কি যায় আসে। যারে যে ভালবাসে সে যায় তার পাশে। জেনো লো প্রেম যেখানে সেখানে ঢলাঢলি।"

নীলমণি হেসে উঠল জোরে। কনকও।

ইন্দ্র কনককে বলল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ ভালবাসার কথা বলব, কনক। রাতের গাড়ি, মাঝরাতে স্টেশনে নেমেছি। কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিলাম স্টেশনে। কী শীত। ভোর ফুটতেই হাঁটা শুরু করলাম। তা নীলমণিবাবুর নামডাক ভালই হয়েছে। স্টেশনের খালাসি আর চা-অলা বলে দিল ঠাকুরের আখড়াটি কোথায়। আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। ছোটাপথে সোজা নীলুঠাকুরের আখড়ায়।...এখন যে আর শরীর বইছে না। হাত মুখটি ধুই। একটু চা-মুড়ি খাওয়াও কনকসখি।"

কনক আর দাঁড়াল না। রোদ উঠে আসছে। বংশীর বউ সুবলা কুয়াতলায় এসেছে জল তুলতে। সুবলাকেই বলবে কনক উনুনটা ধরিয়ে দিতে। উনুন ধরতে ধরতে কনকের বাসী কাপড়চোপড় ছাড়া হয়ে যাবে।

নীলমণি বলল, "এসো ইন্দরদা। ঘরে চলো।"

"ঘরে নয় হে। একটু রোদে দাঁড়াই। বেশ লাগছে। গায়ের শীতটুকু রোদে শুকিয়ে নিই।"

নীলমণি বলল, "তা দাঁড়াও। তোমার জিনিসগুলো ঘরে রেখে দিই।"

ইন্দ্রর ঝোলা আর কম্বলের পুঁটলি নিয়ে নীলমণি ঘরে গেল জিনিসগুলো রাখতে। ইন্দ্র মাঠে নেমে গেল। রোদের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সে যেন জায়গাটা ভাল করে দেখছিল। মাঠ ঘাস, লতাপাতা, ফুলের গাছ, সবজিবাগান, লম্বামতন একচালা, বংশীর ঘর। দেখতে দেখতে পেয়ারাগাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আকাশ ততক্ষণে রোদে ভরে এল, সূর্যটি নরম অথচ উজ্জ্বল। পাখি উড়ে যাচ্ছে, চড়ুইয়ের দল গাঁদাফুলের ঝোপের পাশে ঝাঁক বেঁধে নামল, আবার উড়ে গেল। প্রজাপতি উড়ছে ফুলের বাগানে। পাখি ডাকছিল।

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে পেয়ারাগাছের নিচু ডাল দুলিয়ে যেন একটু খেলা করল। তারপর নিমগাছের দিকে তাকাল। নিমগাছটি কচি। দাঁতনের কাঠি নেবার জন্য গাছের দিকে এগিয়ে গেল।

বেলার দিকে বারান্দায় বসে নীলমণি আর ইন্দ্র কথা বলছিল। মাধবের লোক দুটি এসে গিয়েছে। মাঠ পরিষ্কার করছিল। শীতের সময় মরা ঘাস কোথাও কোথাও শুকিয়ে মাটি যেন। সামান্য পরিষ্কার না করে দিলে সবুজ ঘাস গজাতে দেরি হবে। রুক্ষ জমি-মাটি শক্ত। শুকনো পাতা জড় করছিল বংশী। সকালের দিকটা তার বাগান নিয়ে কেটে যায়। বিকেলে সুবলাকে নিয়ে জল দেয় বাগানে। বংশীর ছেলেটা খেলা করছে মাঠে।

ইন্দ্র নিজেই বলল, তার সামান্য কাজও ছিল এদিকে। জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের শরিকী মামলা মোকদ্দমা। ইন্দ্রর সইসাবুদের দরকার ছিল। ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে হাত ধুয়ে সে চলে এসেছে। আসার ইচ্ছে অনেকদিন ধরেই, মাঝে মাঝে এর ওর মুখে ভাসাভাসা খবর পায় নীলমণিদের। কিন্তু সঠিকভাবে কিছু জানত না। সুখময়ের সঙ্গে দেখা হবার পর সব জানতে পারল। তখন থেকেই ইন্দ্র ঠিক করে নিয়েছিল—সে এখানে আসবে।

নীলমণি বলল, "কত দিন পরে দেখা হল, ইন্দরদা?"

"বছর তিনেক পর। তোমরা এখানে আসার আগে দেখা হয়েছিল। কথাও হয়েছিল।"

"তুমি বারণ করেছিলে আসতে। বলেছিলে, জায়গা পালটালেই কি ভাল

লাগবে। নতুন জায়গাতে মানাতে পারব কী ? ....আমি কিন্তু ভাল আছি ইন্দরদা।"

"দেখছি তাই।"...ক মুহূর্ত থেমে বলল, "কনক ?"

নীলমণি তাকাল। বলল, "খারাপ দেখলে ?"

ইন্দ্র সিগারেট খায়। সিগারেট বিড়ি যা জোটে। পকেটে সিগারেট ছিল। সস্তা সিগারেট। ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরিয়ে ইন্দ্র বলল, "দেখা আর হল কই! দুটো দিন দেখি।"

"তুমি থাকবে তো। দোল পর্যন্ত ?"

"মন বসলে থাকব, না বসলে চলে যাব। ধরে নাও থাকব।" ইন্দ্র বলল।

"তুমি থেকে যাও। আমাদের খুব ভাল লাগবে।"

পাঁচ

দুটি দিন থাকা হয়ে গেল ইন্দ্রর। মানুষটি সত্যিই মজার। নীলমণি আর কনকের দিন কাটত নিজেদের মতন করে। নিরিবিলিতে। শান্ত, সরলভাবে। ইন্দ্র আসার পর কেমন এক সাড়া জাগল। ইন্দ্র হাসছে হো হো করে, হাসছে তো হাসছেই, ওর হাসি যেন থামতে চায় না। গল্পও জানে বটে মানুষটা—কতরকম গল্প, বলতেও পারে রসিয়ে। ছোট কথাই কেমন বড় হয়ে যায়। আর গান! ইন্দ্রর যে কত গান জানা আছে কে জানে! কেমন করে এসব গান জানল সে বোঝাই যায় না। এটা অবশ্য ইন্দ্রর বরাবরের গুণ।

দু দিনেই মাধব ভক্ত হয়ে উঠল ইন্দ্রর। এখন সে নিত্য আসছে। চালা মেরামতের লোক আনল এবেলা তো অন্য বেলায় চাল ডালের বস্তা আনল গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে। সে গাড়িও সেরকম, ককিয়ে ককিয়ে চলে, গোরু দুটো পাঁজরা-সার। আর মাত্র দিন পাঁচেক পরে পূর্ণিমা। ব্যবস্থা না সেরে রাখলে হয়!

মাধব আসত আর ইন্দ্রর সঙ্গে মজে যেত। ইন্দ্রকে 'মহারাজ' বলে ডাকতে শুরু করে দিল।

ছেলেমানুষিও আছে ইন্দ্রর। মাধবকে বলল, ও মাধবচন্দ্র—দুটি লাল নীল সবুজ কাগজ আনতে পার না! পতাকা হবে, শিকলি হবে, তোমার নীলুঠাকুরের আখড়াটি সাজানো হবে হে!

মাধব বলল, এ এমন কী কথা! কালই আনব। বলেন যদি হ্যাজাক মেজাকও আনতে পারি। রাত্তিরে জ্বলবে দু চার ঘণ্টা।

ইন্দ্র মাথা নাড়ল। বলল, এবারটায় থাক। আসছে বছর দেখা যাবে। এবারে পতাকা আর শিকলি হোক।

নীলমণি খুশি হল। ইন্দ্রদা তা হলে থেকে যাচ্ছে দোল পর্যন্ত। ও যা মানুষ, এই আছে, তার পরই নেই।

ইন্দ্র আছে বলেই নীলমণির এই জায়গাটি আরও সাফসুফ, ঝকমকে হয়ে উঠতে লাগল। যতক্ষণ মাধব আছে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না ইন্দ্র। এটা সেটা করে।

কনক হেসে বলল, "তুমিও কি আখড়ার মানুষ হলে?"

ইন্দ্র বলল, "মানুষ হলাম না চোর হলাম কে বলতে পারে?"

"মানেটি বুঝলাম না।"

"নামটি আমার ইন্দ্র। গৌতমমুনির আশ্রমে গিয়ে যে-কাজটি সে করেছিল—তুমি তো জান গো কনকবালা!"

কনক হেসে বলল, "সে কাজটি তুমি পারবে না। তোমায় যে গৌতমের বেশ ধরতে হবে। সে মন্ত্রটি তোমার জানা নেই।"

ইন্দ্র যেন সায় দিয়ে মাথা নাড়তে লাগল। বলল, "ঠিক কথা। যথার্থ কথা। দেবতাদের ভেলকি কি মানুষ জানে। তবে আমি বলি কী কনকসখি, বেশ ধরার কথাটি হেঁয়ালি। গৌতমমুনির বউটি মুনিবাবাজীর তপস্যা আর দাড়িগোঁফ জটা দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্রমশাই যখন সামনে এসে দাঁড়ালেন, বেচারি অহল্যার ভেতরটি ছটফট করে উঠল। তা মুনির বউ বলে কথা, স্বর্গের অপ্সরা তো নয় যে দেবরাজকে এসো প্রাণেশ্বর বলে দু হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকবে। ডাকটি ঠিকই ছিল। রামায়ণটি পড়ে দেখো। গৌতমবেশধারী ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও অহল্যা তাকে বাধা দেয়নি। নিজের সম্মতি জানিয়েছিল। তারপর মনপ্রাণ দেহটি জুড়িয়ে গেলে শান্ত হয়ে বলেছিল, আমি কৃতার্থ হয়েছি সুরশ্রেষ্ঠ। 'কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো'—মানে, এবার আপনি পালিয়ে যান মশাই, নিজেকে এবং আমাকে গৌতমের ক্রোধ থেকে রক্ষা করুন।"

কনক শুধু হাসে।

ইন্দ্র বলল, "অহল্যা কথাটির মানে জান? জান না? যার কোনো পাপ নেই সে হল অ-হল্যা। তা যার অমন পাপটি থাকল, সে অহল্যা হল কেমন করে? পাপটি তার ছিল। মানুষের দেহটির তলায় পাপ না থাকলে সেটি জীবন হয় না। শিশু বয়সের দেহে আর মৃত মানুষের দেহটিতেই শুধু পাপ থাকে না,

কেননা তাতে তার নিজের জীবনটি নেই। ভগবানের এইটেই লীলা।

ইন্দ্র হাসতে থাকে। কনক কিছু বলে না। এত তত্ত্বকথায় তার কী দরকার।

মাধব কাগজ আনল রঙিন। লাল নীল সবুজ হলুদ।

ইন্দ্র যেন ছেলেমানুষ। মাধবেরও শখ কম নয়। রঙিন কাগজের পতাকা হচ্ছে, শিকলি হচ্ছে। বংশীর ছেলেটা ঠায় বসে থাকে, কখনো বা রঙিন কাগজের টুকরো নিয়ে ছোটাছুটি করে মাঠে বাগানে। কনককেও মাঝে মাঝে এসে বসতে হয় ইন্দ্রর হাঁকডাকে, কাগজ কাটতে হয় কাঁচি দিয়ে, লেই তৈরি করে দিতে হয়।

এমন সময় এক সন্ধেবেলায় আরও একজনের আবির্ভাব ঘটল।

নীলমণি বুঝি আশাই করেনি, স্বপ্নেও নয়, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাত ধরল, "তিলক। তিলক—তুই?"

ইন্দ্র কাছেই ছিল। মাধবও। মাধব আজকাল সন্ধে উতরে না যাওয়া পর্যন্ত নড়ে না। তার সাইকেলে আলো লাগিয়ে নিয়েছে। চেনা রাস্তা ধরে চলে যেতে অসুবিধে হয় না তার। নীলুঠাকুরের চেয়েও এখন তার বড় আকর্ষণ ইন্দ্র। ইন্দ্রর গল্প আর গান শুনতে শুনতে মাধব যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়।

ইন্দ্র আর মাধব দু'জনেই তিলকের দিকে তাকাল।

নীলমণি তিলকের হাত ধরে টানছে। "আয়—আয়—", দরজার কাছ থেকে টানতে টানতে ভেতরে আনল তিলককে। "তুই কেমন করে এলি? কে তোকে আমার কথা বলল! আমাকে তুই অবাক করলি! স্বপ্নেও ভাবিনি...আশ্চর্য!"

ঘরের মধ্যে লণ্ঠন জ্বলছিল।

তিলক কিছুক্ষণ যেন নীলমণিকেই দেখল। তারপর ইন্দ্র আর মাধবকে। একটু হাসল।

নীলমণি ইন্দ্রকে বলল, "ইন্দরদা, আমার বন্ধু তিলক। আমরা বলতাম রাজতিলক। ওর কপালে দাগটা দেখছ না!" বলে হাসতে লাগল। আবার বলল, "আমার স্কুলের বন্ধু। পরেও বন্ধুত্ব ছিল। বাড়িতে আসত যেত। তারপর বেপাত্তা!" বলে তিলকের দিকে তাকাল। "ইন্দরদা। আর ও হল মাধব।

ইন্দ্র বলল, "নামটি যেন শুনেছি নীলুবাবুর মুখে। তা ভালই হল।"

নীলমণি তিলককে বলল, "তুই এলি কেমন করে ? কে তোকে আমার কথা বলল ?"

তিলক বলল, "বেণুবউদি। বেণুবউদি এখানে আসে.... ।"

নীলমণি মাথা নাড়ল। বেণুদিদি রায়দার স্ত্রী। পর পর দু বছরই এসেছে দোলের সময়। এবারও আসার কথা। রায়দা আর বেণুদিদি যেন টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ দু'জন। বাচ্চাকাচ্চা নেই। ভেতরে ক্ষোভ থাকলে বাইরে তা চোখে পড়ে না। দু'জনেই চাকরি করে। আর ছুটিছাটায় ঘুরে বেড়ায়। ওদের চিঠিপত্রও কখনো কখনো পায় নীলমণি। বেণুদিদি কনককেও এক আধটা চিঠি লেখে দু চার মাস অন্তর।

কনককে ডাকতে হবে। নীলমণি কনককে ডাকতেই বাইরে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে তিলককে বলল, "তুই নিজে নিজেই চিনতে পারলি ?"

"চিনব না কেন ? সহজ ব্যাপার।...এই লাইন দিয়ে আমিও আগে গিয়েছি কতবার !"

"ও! তা হলে তুই ?"

"আমি ? কী আমি !" তিলক তাকাল। বুঝতে পারছিল না।

নীলমণি হাসতে হাসতে বলল, "তা হলে তুই-ই ব্যাগটা ফেলে গিয়েছিস ! মজা করছিলি আমাদের সঙ্গে।" বলতে বলতে সে তিলকের চশমার দিকে তাকাল।

তিলক বেশ অবাক হল। "ব্যাগ ? কিসের ব্যাগ ?"

নীলমণিও ধোঁকা খেয়ে গেল। "তুই সেদিন একটা ব্যাগ স্টেশনের প্লাটফর্মে ফেলে দিয়ে যাসনি ! বলেছিলি—এখানে পৌঁছে দিতে, তুই ঘুরে আসছিস ?"

তিলক যেন ধরতেই পারছিল না নীলমণি কী বলছে ! বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। "বুঝতে পারলাম না কী বলছিস ?"

নীলমণিও হতবুদ্ধি। মাধবের দিকে তাকাল। মাধবই স্টেশন থেকে বয়ে এনেছিল ব্যাগটা। "মাধব, কী ব্যাপার বলো দেখি ! তিলকও বলছে ব্যাগ সে ফেলে যায়নি। তবে কি মাস্টারবাবু ভুল বললেন ?"

মাধব জোরে জোরে মাথা নাড়ল। বলল, "না। মাস্টারবাবুকে স্টেশনের কুলি যা বলেছে—তিনি তাই বলেছেন। মাস্টারবাবুর কাছে আমি খোঁজ নিয়েছি, ঠাকুর।"

তিলক বলল, "হয়েছে কী !"

নীলমণিই বলল যা ঘটেছে। তারপর বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার তো! ব্যাগটা ইন্দরদার নয়, তোরও নয়। তবে কার?"

তিলক হাসতে হাসতে বলল, "আমার মোট আমি একটা লোককে দিয়ে বইয়ে এনেছি। এখনও সে দাঁড়িয়ে আছে। পয়সা মেটানো হয়নি। দাঁড়া পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আসি।" বলে তিলক ঘরের বাইরে গেল।

নীলমণি বলল, "ইন্দরদা, এ কেমন ভুতুড়ে ব্যাপার হল?"

ইন্দ্র হেসে বলল, "তোমার অতিথিরা সবাই তো আসেনি এখনও। দেখোই না শেষ পর্যন্ত যার জিনিস সে নিজেই খোঁজ নিতে আসবে!"

নীলমণি কী বলতে যাচ্ছিল, ইন্দ্র বাধা দিল। বলল, "আমরা তো উটকো লোক। যারা আসে বরাবর তারা আসুক। তারপর বোঝা যাবে।"

নীলমণি আর দাঁড়াল না, কনককে ডাকতে গেল।

ইন্দ্র একটা সিগারেট ধরাল ধীরেসুস্থে। বারান্দায় তিলকের গলা। ইন্দ্র বলল, "মাধবচন্দর, তুমি বাপু জিনিসটি খাওয়ালে না! কতরকম জল আছে জান? বৃষ্টির জল, নদীর জল, ডাবের জল আর গঙ্গাজল!"

"আজ্ঞে, গঙ্গাও তো নদী! সে জল এখানে পাই কোথায়?"

"গঙ্গার আরেক নাম সুরধুনী। ধুনীটি আমার দরকার নেই হে। শুধু সুরা একটু হোক। আজ বাদে কাল ভদ্দরলোকেরা চলে আসবেন। মেয়েরা আসবেন। তার আগে বাপু দিশিগঙ্গা নিয়ে এসো এক আধ বোতল। দুই ভাইয়ে মিলে জুত করে খাই। তবে তোমার নীলুঠাকুরের আখড়ার বাইরে গিয়ে। কেমন?"

মাধব হাসতে লাগল।

ইন্দ্র বলল, "আর একটি জলের কথা বলতে ভুলে গেছি। সেটি অশ্রু-জল। কে জানে—সেটিও দেখব কি না!"

ছয়

সামান্য রাত হয়ে এসেছিল।

ইন্দ্র এসে ডাকল, "কনক?"

ঘরেই ছিল কনক। নীলমণির ঘরের গায়ে ছোটমতন এক বাড়তি ঘর। তার পরেই কনকের ঘর। টানা বারান্দার ওপাশে রান্না-ভাঁড়ার।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল কনক।

"কী করছিলে?" ইন্দ্র বলল।

"এমনি একটু শুয়েছিলাম !"

"তোমার খাটুনি বেড়ে যাচ্ছে..."

"না। এ আর কী !... সবাই এসে পড়লে খাটুনি বাড়ে। তেমন আবার লোকও থাকে—লীলাদিরা...।"

"তা হলে এসো বাইরে পায়চারি করি খানিক।"

বাইরে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে রয়েছে। আজ দ্বাদশী তিথি। দু'দিন পরেই পূর্ণিমা। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় ধোয়া। সামনের মাঠে বাগানে ঈষৎ কুয়াশা জড়ানো কিরণ ঝরে পড়ছে যেন আকাশ থেকে।

কনক বলল, "তুমি উঠে এলে ?"

"ওরা ওদের গল্প করছে। মাধব চলে গেছে অনেকক্ষণ। নীলুদের কথার মধ্যে বসে থেকে কী করব ! চলে এলাম।"

কনক বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "এখনও ঠাণ্ডা আছে অল্প। তুমি আবার ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবে বাইরে ঘুরলে !"

মাথা নাড়ল ইন্দ্র। হেসে বলল, "না গো কনকবালা, এ হল কুলিমজুরের শরীর, গরিব মানুষের। তোমাদের মতন আরামের দেহ নয়।"

কনকও পালটা জবাব দিল, "আমরা বনজঙ্গলে থাকি, দেহাতি মানুষ ; আমাদের সবই সয়। তোমরা হলে শহুরে লোক। আসতে না আসতেই কাশি বাঁধিয়েছ।"

ইন্দ্র বলল, "হাঁচি কাশি থাকবে না শরীরে, তবে আর মানুষের দেহ হল কেন গো কনকবালা !" বলে কনককে ডাকল, "এসো।" বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত এগুতে এগুতে আবার বলল, "কাশির দোষ কী ! তোমাদের ওই ধর্মশালাটির দুটি জানলা ভালমতন বন্ধ হল না। খুলে রেখে দিলাম। মাঝ আর শেষরাতের কনকনে হাওয়া লেগে গলাটি খসখস করতে লাগল। ও কিছু নয়। আজ ঠিক হয়ে গেছি।"

মাঠে নেমে কনক বলল, "বর্ষার পর প্রত্যেকবার জানলাগুলো ওইরকম হয়। কাঁচা কাঠ, বুনো, এখনও ঠিক হল না। ...তা এখন তো ঠিক করে দিয়েছে।"

মাথা হেলালো ইন্দ্র ; দিয়েছে। লম্বামতন ঘরটিই এখানকার অতিথিশালা। ইন্দ্র ঠাট্টা করে বলে ধর্মশালা। ওই চালার তলাতেই থাকছে ইন্দ্র। অসুবিধা কিছু নেই। সরু তক্তাপোশের ওপর বিছানা। দড়ি-টাঙানো হয়েছে জামাকাপড় রাখার জন্যে।

ইন্দ্র বলল, "আজ একজন সঙ্গী পাওয়া গেল! রাতটি কাটবে ভাল।"

"কে?" কনক বলল, অন্যমনস্কভাবেই।

"কে! সে কী! তোমাদের তিলকবাবু!"

"ও!...হ্যাঁ।"

ইন্দ্র ঠাট্টা করে বলল, "একেই বলে কপাল, বুঝলে কনকসখি। প্রাণটি চেয়েছিল তোমাকে, সঙ্গিনীটিকে ; এসে জুটল এক সঙ্গী। মনটি আমার হায় হায় করছে গো!"

কনক হেসে ফেলল।

মাঠ দিয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে হেঁটে যেতে যেতে ইন্দ্র গান করে বলল, "অনুগত জনে কেন তুমি এত করো প্রবঞ্চনা/আমায় মারিলে মারিতে পার/রাখিলে কে করে মানা।"

কনক আর জোরে হাসছিল না। মুখে হাসি লেগেছিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে কাঠের ছোট ফটক পর্যন্ত গেল ইন্দ্র। তারপর ওপাশ দিয়ে গাছতলার দিকে।

মরা শীতের বাতাস নয় বসন্তের বাতাসই আসছিল। তবু বাতাসের মধ্যে মৃদু শীতলতা রয়েছে।

কনক আবার চুপচাপ।

ইন্দ্র মাঝে মাঝে কনককে দেখছিল। তার মুখ। কনক চুপচাপ, অন্যমনস্ক।

"কনক?"

"উঁ?"

"এ-বেলায় তোমায় যেন কেমনটি দেখছি।"

কনক তাকাল। তার পরই মুখ ফিরিয়ে নিল। "কেন?"

"সে-কথাটি তুমিই বলবে!"

"কই, আমি এ-বেলায় কেমনটি হলাম কখন?"

ইন্দ্র হালকা গলায় বলল, "আমার প্রাণটিকে তুমি ফাঁকি দিতে পার, চোখ দুটিকে পার না।"

কনক চুপ করে থাকল। তার গায়ে হালকা রঙের শাড়ি জ্যোৎস্নায় প্রায় সাদাটে দেখাচ্ছে। মাথার খোঁপাটি ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। কনকের কাঁধ সামান্য চওড়া, ভরা।

ইন্দ্র যেন গল্পই করছে, সহজভাবে বলল, "ওই তোমাদের রাজতিলকটি

এসে পড়ে তোমায় মুশকিলে ফেলে দিয়েছে নাকি ?"

তাকাল কনক। "আমায় ? কেন ?"

"এমনি বলছি। মনে হল, তুমি ওকে দেখে আহ্লাদে গলে গেলে না !"

"বাঃ, আহ্লাদে গলবো কেন !"

"আমার বেলায় গলেছিলে—" ইন্দ্র কৌতুক করে বলল, "আমায় দেখে তোমার কী মুখের চেহারা, যেন কমলকলিটি ভোরের রোদে হেসে উঠেছিল !"

কনক একটু হেসে বলল, "তুমি যে কীসব বলো, ইন্দ্রদা !"

"যথার্থ কথাটি বলি।...তুমি আমার চোখ দুটিকে ঠকাতে চাইছ !... ওই রাজতিলককে দেখে তুমি খুশি হওনি।"

কনক কথা বলল না।

ইন্দ্র বলল, "এতক্ষণ বসে বসে ওদের কথা শুনছিলাম। পুরনো গল্প করছে। ওরা কম বয়েসের বন্ধু, স্কুলটুল থেকে পড়ার সময় থেকে। তাই না ?"

"হ্যাঁ।"

"একই জায়গায় থাকত। তিলকের বাবার নাকি পয়সাকড়িও ছিল যথেষ্ট।"

"ছিল। দুর্নামও ছিল।"

"কিসের দুর্নাম ?"

"সব দিকের দুর্নাম ছিল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও বনিবনা হত না।"

"স্ত্রী ?"

"মারা গিয়েছিল।"

"তুমি ওকে প্রথম থেকেই দেখেছ ?"

"হ্যাঁ। মায়ের সঙ্গে ও-বাড়িতে আসার কিছুদিন পর থেকেই দেখেছি।"

ইন্দ্র হাঁটছিল। নিমগাছের ছায়া মাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়াল এবার। বলল, "ও নাকি হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায় ?"

কনক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। পরে বলল, "সে ওদের বাড়ি আর পরিবার নিয়ে নানা গণ্ডগোল হচ্ছিল। মামলা মোকদ্দমা, থানা, বড় ভাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, জেল হল তার, মেজ বোন বাপেরবাড়িতে এসে আত্মহত্যা করল,...অনেক কাণ্ড। সেই সময় ও বাড়ি থেকে চলে যায়। বেপাত্তা কি না জানি না। চাকরি-বাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেছে শুনেছিলাম। কেউ বলত চা-বাগানে, কেউ বলত আন্দামানে।...আমি জানি

না।”

“শুনলাম আন্দামানে বেশ ক' বছর ছিল।”

“তা হবে।”

“চেহারাটি এখনও ভাল আছে। ভালই দেখতে।”

কনক হঠাৎ বলল, “তুমি কী জানতে চাইছ ইন্দ্রদা ?”

ইন্দ্র হেসে ফেলল। তারপর কনকের কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিল একটু। বলল, “হিংসে আমার হবে গো কনকবালা। তবু আসল কথাটি বলো তো ? তিলক কি তোমায় তার প্রেম নিবেদন করত ?”

কনক কথা বলল না। ইন্দ্রর হাতও সরিয়ে দিল না কাঁধ থেকে। দশ বিশ পা হেঁটে এসে বলল, “পুরনো কথা জেনে কী লাভ তোমার।”

“তবু শুনি।”

খানিকটা ইতস্তত করে কনক বলল, “করতে চাইত অনেক কিছুই। মায়ের কাছে নানা কথা বলত। দু'বার আমায় বড় অপ্রস্তুতে ফেলেছিল। একদিন আমি ওকে মায়ের কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে বলেছিলাম—ওর পকেটে হাত দিয়ে দেখতে।...এসব কথা আমার ভাল লাগছে না ইন্দ্রদা। শুধু একটা কথা তোমায় বলি।”

“বলো ?”

“ও একদিন আমায় একটা সোনার হার দিতে এসেছিল। আমি নিইনি।...তখন ও আমায় টিটকিরি দিয়ে বলল, সময় থাকতে নিয়ে নাও, এরপর আর সোনা জুটবে না, পরে যে আসবে সে হয়ত রুপো দেবে। তোমার এই রূপ কদিন। মেয়েদের বয়েস বাড়লে দাম কমে যায়। শরীরে ভাটা নামলে আর তোমাদের জোয়ার আসে না। তোমারও আসবে না।...তা ছাড়া তোমার কোনো পরিচয় নেই। তুমি ভদ্রসমাজে জায়গা পাবে না।”

ইন্দ্র বলল, “বুঝেছি।...তা তিলকবাবুটি কি এরপর বাড়ি ছাড়া ?”

“তখনই নয়, পরে চলে গেল। ওদের বাড়িতে হাজার গণ্ডগোল। ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি, মেজো ভাই নেশাভাঙ করে বেড়াত। গাড়ি চাপা পড়ল। বেঁচে গেল প্রাণে, একটা পা বাদ দিতে হল।”

ইন্দ্র এবার কনককে নিয়ে ফিরতে লাগল। ফিরে আসতে আসতে বলল, “তুমি কি ভাবছ, ওই তিলক নতুন করে তোমায় জ্বালাতে এসেছে ?”

“আমার খারাপ লাগছে।”

“ক্ষমাঘেন্না করে দাও। দুটি তো দিন। তারপর ও চলে যাবে।”

কনক চুপ করেই থাকল।

গোটা মাঠ ঘুরে বাগান ঘুরে আবার কনকের ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্র নীলমণির ঘরের দিকে তাকাল। আলো জ্বলছে ঘরে। দু বন্ধু গল্প করছে এখনও।

ইন্দ্র হঠাৎ বলল, "কাল আবার কারা আসবে ?"

"কাল ! কাল হয়ত লীলাদিরা চলে আসবে।"

"কাল আর পরশু ! তার পরই চাঁদের হাট বসে যাচ্ছে এখানে—" বলে হাসতে লাগল ইন্দ্র।

কনকও মাথা নাড়ল। কাল যারা আসতে না পারল পরশু সকালের গাড়িতে নিশ্চয় চলে আসছে।

"ইন্দ্রদা ! তুমি কদিন থেকে যাও না।"

"থাকছি তো !"

"আমি বলছি, ভিড় ফাঁকা হয়ে যাবার পরও দু চারদিন থেকে যাও। তোমার এমন কী কাজ !"

ইন্দ্র বলল, "দু চার দিনের কথা কেন বলছ ! তুমি রাখলে বরাবরই থাকতে পারি। রাখিলে রাখিতে পার..." বলেই ইন্দ্র গান ধরল উঁচু গলায় : "আমায় মারিলে মারিতে পার/রাখিলে কে করে মানা/ অনুগতজনে কেন তুমি এত কর প্রবঞ্চনা/ বিনা অপরাধে বধ, এ কি রে তোর বিবেচনা...."

গান গাইতে গাইতে বারান্দায় উঠল ইন্দ্র। কনকও।

নীলমণির ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুই বন্ধু।

তিলক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ইন্দ্র আর কনককে।

নীলমণি হাসতে হাসতে বলল, "ইন্দরদা, কে তোমায় প্রবঞ্চনা করছে ?"

হাসতে হাসতেই ইন্দ্র বলল, "আমার ভাগ্য। আর ভালবাসার মানুষটি গো !"

কনক নিজের ঘরে চলে গেল।

কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিল নীলমণি। বলল, "তোমার এই গানটি কি ভালবাসার ? না, দেহতত্ত্বের ?"

"এক ঢিলে দুই পাখি। যে যেমন ভাবে নেয়। তবে কি জান নীলুবাবু, ভালবাসার তত্ত্বটি দেহ থেকেই আসে। মুশকিলটা কোথায় হয় জান ? ভালবাসাটি যখন দেহ ভিন্ন আর কিছু দেখে না—তখন সেটি কাঁচা ভালবাসা। যেমন সোনাটি। ওটি তুমি দেহে রাখো, দেখাবে ভাল। কনককে তাই

বলছিলাম—সোনাটি রূপোটি দেহের বাইরে থাকে। এটি শোভা। অন্তরে প্রাণে কি সেকরার সোনা রাখা যায় গো! সেখানে অন্য সোনা।"

ইন্দ্র হাসছিল মাথা দুলিয়ে।

তিলক দেখছিল ইন্দ্রকে।

সাত

দোলের আগের দিনই নীলমণির অতিথিশালাটি ভরে গেল। বলরামবাবু যেন শোভাযাত্রা করে হাজির হলেন সকালের গাড়িতে, তিনি আর তাঁর গৃহিণী লীলাদির সঙ্গে দুটি নতুন মানুষ—লীলাদির ভাইবোন। মতিলাল বলে এক বন্ধুও। দুদিনের জন্যে আসা—তবু জিনিসপত্রের পাহাড় বয়ে এনেছেন যেন। নিজেদের মোটঘাট তো আছেই তার সঙ্গে বাড়তি কিছু, নীলমণিদের জন্যে। লীলাদি যখনই আসেন কনকের জন্য এটিসেটি নিয়ে আসেন। কোনোটা কনকের ব্যক্তিগত, কোনোটা বা তার সংসারে কাজে লাগবে বলে।

সন্ধের গাড়িতে এল রায়বাবুরা। কর্তা গিন্নি। এল শিতিকণ্ঠ। মাধুরী এবার এসেছে তার এক ভাইকে সঙ্গে করে, আবিরলাল। কম বয়েসী ছেলে, দেখতে সুন্দর, মেয়েদের মতন এক মাথা চুল, গলায় হার। ডান হাতে লোহার বালা। ছেলেটা কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে এসেছে। ছবি তোলার শখ।

শিতিকণ্ঠ কল্পনাও করেনি এখানে এসে সে ইন্দ্রকে দেখতে পারে। অবাক হয়ে গেল। "আরে ইন্দ্রদা, তুমি? তুমিও এসেছ!" ইন্দ্র বলল, "এসে পড়লাম। দেখতে এলাম নীলুবাবু কেমন আখড়া বানিয়েছে। যা দিনকাল—শেষ পর্যন্ত এখানে এসেই না মালা জপতে হয়।"

শিতিকণ্ঠ বলল, "সত্যি ইন্দ্রদা, নীলু তো জায়গাটি দিব্যি করে ফেলেছে।"

নীলমণির জায়গাটি বেশ দেখাচ্ছিল। মাধব আর ইন্দ্র মিলে রঙিন কাগজের পতাকা টাঙিয়েছে দিনের বেলায়। কাগজ টাঙিয়েও যেন শখ মেটেনি মাধবের, দেবদারু গাছের পাতাও টাঙিয়েছে দড়ি বেঁধে, কিছু ফুল। রঙিন কাগজগুলো আজ হয়ত সারা রাতের হিমে ভিজবে। ভিজুক। কাল শুকিয়ে যাবে চড়া রোদে।

বলরামবাবুও খুশি। ইন্দ্রর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। পরিচয় হল।

লীলাদিদি এসে পর্যন্ত কোমরে আঁচল জড়িয়ে বসে পড়েছেন কাজে। হাত-মুখে জল দিয়ে ট্রেনের কাপড়চোপড় বদলে সেই যে বসেছেন—আর ওঠবার নাম নেই।

নীলমণিও তার অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত। কনক বসেছে লীলাদিদির সঙ্গে—রান্নাবান্না নিয়ে, মাধুরীও হাত লাগিয়েছে। বেণুবউদি অতিথিশালা নিয়ে ব্যস্ত।

শিতিকণ্ঠ আসতেই নীলমণি তাকে ধরেছিল। ব্যাগের কথা জিজ্ঞেস করল।

শিতিকণ্ঠ অবাক হয়ে বলল, "তোমার মাথা খারাপ। আমি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ব্যাগ ফেলে রেখে চলে যাব! সে-মানুষ আমি নই। এ-রকম মজা আমি করি না।"

"আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি?"

মাথা নাড়ল শিতিকণ্ঠ। "না ভাই, আমি নই। সংসারী মানুষ এখন, চালাক চতুর হতে হয়েছে।....দেখো—অন্য কার; আমার নয়—এটুকু বলতে পারি।"

শিতিকণ্ঠর নয়, ইন্দ্রর নয়, তিলকেরও নয়। তবে কার? আর কার হতে পারে?

বলরামবাবু বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, ব্যাগটা ভুল করে এখানে এসে পড়েছে। হয় তোমাদের স্টেশনের খালাসি ভুল শুনেছে, না হয় মাস্টারবাবু!"

নীলমণি বলল, "মাধব মাস্টারবাবুকে ভাল করে জিজ্ঞেস করেছিল—উনি বললেন আমাদের..."

রায়বাবু বললেন, "জিনিসগুলো একবার তবে দেখা যাক নীলুবাবু! যদি হদিশ করা যায়!"

নীলমণির ঘরেই ছিল ব্যাগটা। ব্যাগ দেখা হল, ব্যাগের মধ্যে জিনিসপত্র—কেউ কোনো হদিশ করতে পারল না।

বলরামবাবু বললেন, "গোটা ব্যাপারটাই ভুল। খালাসি বেটা কানে কম শোনে নিশ্চয়। সে ভুল শুনেছে। মাস্টারবাবুর আর দোষ কী!...ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমরা তো সবাই এসে গিয়েছি। আমরা যখন বলছি আমাদের নয়—তখন ও-জিনিস আমাদের কারও নয়। মাস্টারবাবুকে ওটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো নীলুবাবু। কাল তো আর হবে না। পরশু-তরশু দিয়ো।"

কথাটি ঠিকই। রায়বাবুরও সেই মত। যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া ভাল।

পরের দিনটি দোলোৎসব।

নীলমণির আখড়াটি সামান্য বেলা থেকেই জেগে উঠল। সারাটি বছর যে-জায়গাটি শান্ত, প্রায়-নির্জন, কোলাহলহীন হয়ে পড়ে থাকে—সেই জায়গাটি কোলাহলে ভরে গেল। লীলাদিদিরা দোল শুরু করার আগেই তাঁর ভাইবোন আর আবিরলাল নেমে পড়ল মাঠে। বংশীর ছেলে রঙ মাখতে লাগল সকাল থেকেই। মাধব এসে পড়ল সময়মতন। তারপর বেলা খানিকটা গড়াতে না গড়াতে রঙে আবিরে ছোটাছুটি কলরবে নীলমণির আখড়াটি উৎসব আর আনন্দে মুখর হয়ে উঠল।

রঙ খেলা শেষ হতে হতে বেলা বাড়ল। লীলাদিদির শখ চাপল—উড়নি নদীতে স্নান করতে যাবেন।

নদীতে এখন জল নেই লীলাদিদি!

জল ছাড়া নদী হয় নাকি! যা আছে তাতেই হবে।

বয়সে কেউ বুড়ো হয়নি যে হুজুগে মাতবে না। সাবান গামছা শাড়ি জামাকাপড় নিয়ে পুরুষ মেয়েরা চলল উড়নি নদীতে স্নান করতে। কনকও গেল। থাকল নীলমণি আর মাধুরীদি। মাধুরীদির পা মচকেছে রঙ নিয়ে ছোটাছুটি করতে করতে। থাকল বংশী আর তার বউ। ছেলেটাও।

আবিরলাল যেন শতখানেক ছবি তুলে নিয়ে যাবে এখান থেকে এমনই তার উৎসাহ।

দুপুরের রোদে রঙমাখা শাড়ি জামা, ধুতি পাজামা পাঞ্জাবি উড়তে লাগল নীলমণির আখড়ায়।

সন্ধেবেলায় গান-বাজনা।

ফাঁকা মাঠে, জ্যোৎস্না ধারার তলায়, মাদুর আর সতরঞ্চি পেতে বসে গান। বেণুবউদি গাইতে পারে। আবিরলালও কম যায় না। বলরামবাবু সব গানেতেই গলা মেশাতে যান। তারপর নিজেই বলেন, 'এ কি—তোমাদের সিনেমার গান হচ্ছে যে লোকে হাউসে বসে শুনবে। এ হল আমাদের মনের খুশির গান। আহ্লাদ করে গাইবে সব। কাম্ অন্ লেডিস অ্যান্ড বয়েজ, লেট আস সিং...সং অফ আওয়ার হ্যাপি মোমেন্টস...।' নীলমণিকে সব গানের সঙ্গেই তার এস্রাজের ছড়ি টানতে হয়।

ইন্দ্রই আসর মাতালো। হেসে বলল, "রাধাকেষ্টর গান গাই তবে..." বলে গান ধরল, "কী করি সহচরি, মরি লো মরি মরি...।"

কনক শুনছিল আর ঠোঁট টিপে হাসছিল।

গান থামলে লীলাদিদি বলল, "ও মশাই মরিটরি নয়, আরও একটা শোনান।"

ইন্দ্র বলল, "তবে, ভজন গাই।" বলে সে এক ভজন গাইতে লাগল।

তিলক উঠে গিয়েছিল আগেই। গানে তার মন ছিল না। এই উৎসবে তার কোনো গা নেই। আনন্দ নেই। বরং সে কোথাও যেন ঘা খেয়ে বিরক্ত তিক্ত হয়ে উঠেছে।

শিতিকণ্ঠ বসে ছিল নীলমণির পাশে। হাসিখুশি মুখ। মাঝে মাঝেই মাথা দুলিয়ে তারিফ করছিল। 'ইন্দ্রদা—দারুণ!'

মাধব গ্লাস দুই সিদ্ধি খেয়েছে নিজে। বলরামবাবুকেও খাইয়েছে। রায়দা সাবধানী লোক। এক গ্লাস খেয়েছে। তিনজনে গায়ে গায়ে বসে সিদ্ধির নেশায় দুলছিল আর তাল দিচ্ছিল গানের সঙ্গে।

হঠাৎ হাসি শুরু হল। বলরামবাবুদের হাসি।

লীলাদিদি বললেন, "নাও এবার ওঠো, সিদ্ধিখোররা হাসতে শুরু করেছে। এখন তবে হাসিই চলুক।"

গানের আসর ভাঙল।

শিতিকণ্ঠ বলল, "ইন্দ্রদা, তুমি এখনও তাজা আছ! আমরা বুড়ো হয়ে গেলাম।"

ইন্দ্র বলল, "আমি মন্ত্র জানি যে। তোমরা জান না।"

.আট

উৎসব ফুরলো। দু তিনটি দিন। পলাশবন আর মউরি মাঠের দিক থেকে মাঝ বসন্তের যে-বাতাস এতদিন ছুটে আসছিল সেই বাতাসে এখন চৈত্রের রুক্ষতা অনুভব করা যাচ্ছিল। নীলমণির গৃহবাসটি আবার কলরবহীন। শান্ত। নিরিবিলি। মাধবদের টাঙানো রঙিন পতাকাগুলি হিমে রোদে বাতাসে রঙ জ্বলে গিয়ে সাদাটে হয়ে এসেছে, ছিঁড়ে ফেটে গিয়েছে শিউলি, দেবদারুর পাতা আর ফুল শুকিয়ে উড়ে গিয়েছে বাতাসে। দড়িগুলো ছেঁড়া। বড় শূন্য দেখাচ্ছিল যেন।

ইন্দ্র বলল, "নীলু, এবার আমি যাই।"

নীলমণি বলল, "ওরা যেতে না যেতেই তুমি যাবে! থাকো না আরও দু

চারদিন।”

ইন্দ্র হাতের আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে হিসেব করে বলল, “আমি এসেছি সবার আগে, তোমরা না ডাকতেই। তোমার অতিথিরা দিন দুই হল বিদায় নিয়েছে। আমি এখনও আছি। আর তো থাকা যায় না। কাল আমায় যেতে হবে।”

নীলমণি বলল, “কনককে বলেছ ?”

“পাকা করে বলিনি। বলব আজ।”

“কখন যাবে কাল ?”

“মাধব বলছিল সকালের গাড়িটাই ভাল।”

“তা বেশ। যাবে যখন যেও।...আমাদের বড় খারাপ লাগবে ইন্দরদা !”

“লাগবে না। আজ সন্ধেবেলায় অনেক গল্পগুজর করা যাবে,” ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলল।

সন্ধেবেলায় নীলমণির ঘরে বসে গল্প-গুজব হচ্ছিল। মাধবও ছিল। এবার উঠল। বলল, “আজ একটু তাড়া আছে ঠাকুর। আমি উঠলাম।”

নীলমণি বলল, “এসো।” বলে মুখ ফেরাতে গিয়ে ঘরের একপাশে রাখা ব্যাগটা চোখে পড়ল। জলচৌকির ওপর রাখা আছে। পাশে কাঠের আলনা ; নীলমণির জামা-কাপড় চাদর ঝুলছে, আলনার গায়ে গায়ে এক টেবিল। টেবিল ছুঁয়ে জানলা।

নীলমণি মাধবকে বলল, “ভাল কথা, ব্যাগটি তুমি নিয়ে গেলে না, মাধব। মাস্টারবাবুকে ফেরত দিয়ে দিতে। বলতে আমাদের জিনিস নয়। ভুল করে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।”

মাধব বলল, “পরে নিয়ে যাব।” বলে ও দরজার দিকে এগুতে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ইন্দ্রর দিকে তাকাল। “কাল সকালে আমি আসছি মহারাজ। আপনি বেরিয়ে পড়বেন না। আমি আপনাকে পৌঁছে দেব। চলি।”

মাধব চলে যাচ্ছিল, ঘরের চৌকাটের কাছে কনক। কনককে পথ দিয়ে বাইরে চলে গেল সে। সামান্য পরেই সাইকেলের ঘণ্টি শোনা গেল।

কনক ঘরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল একপাশে।

নীলমণি তখনও অন্যমনস্কভাবে ব্যাগটা দেখছিল। হঠাৎ বলল, “এ বড় অবাক কাণ্ড, ইন্দরদা ! কার জিনিস, কে ফেলে গেল, কেনই বা ফেলে গেল, বলে গেল আসব—অথচ এল না ! আশ্চর্য ! এখন তো মনে হচ্ছে ভুল করেই জিনিসটা এখানে চলে এসেছিল !”

ইন্দ্র নীলমণির দিকে তাকিয়ে থাকল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মুখে কেমন এক হাসি ফুটলো। কৌতুকের। একটু যেন রহস্যও রয়েছে।

নীলমণি বলল, "তুমি হাসছ ?"

কনককে ইশারায় কাছে ডাকল ইন্দ্র। পাশে এসে বসতে বলল। হাসিটি কিন্তু আরও স্পষ্ট, চোখ দুটি যেন কৌতুকে মাখামাখি হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লণ্ঠনের আলোয় ইন্দ্রর মুখটিও সহাস্য দেখাচ্ছিল।

ইন্দ্র বলল, "গল্পটি তবে তুমি জান না ?"

"কিসের গল্প ?"

কনক এগিয়ে এসে ইন্দ্রর পাশে বসেছে ততক্ষণে।

ইন্দ্র বলল, "পুরাকালে বারাণসী থেকে অনেকটা দূরে এক মুনিঋষির চমৎকার একটি তপোবন ছিল। মুনির কয়েকজন শিষ্যও থাকত সেই তপোবনে। গুরুগৃহে থাকা আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান অর্জন করাই ছিল তখনকার রেওয়াজ।... তা একদিন এক ছোকরা শিষ্য, যুবক তপস্বীই বলতে পার, বা কাঁচা সন্ন্যাসী—গুরুর আশ্রম থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ দেখে একঝাঁক রাজহংসের মধ্যে একটি সোনালী হাঁস ঠোঁটের ডগায় এক ফুলের মালা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। শিষ্যটি তো অবাক। ফুলের মালা ঠোঁটে করে সোনালী হাঁস উড়ে যায় এমন দৃশ্য তো সে আগে দেখেনি। এ বড় অলৌকিক দৃশ্য। বড়ই কৌতূহল হল শিষ্যটির। সে তখন হাঁসের ঝাঁকটির পিছু পিছু ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে পথ ফেলল হারিয়ে, সন্ধে হয়ে গেল, রাত হল—গভীর এক জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল শিষ্যটি। ফেরার আর পথ নেই। রাত্তিরটি বনের মধ্যেই কাটল। পরের দিন সে পথভোলা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে—ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে মাঝদুপুরে এক ছায়ায় গিয়ে বসে পড়ল। দেখে, গাছতলায় কে যেন কাঠকুটো, মাটির পাত্র, চাল ডাল আলু ফল সাজিয়ে রেখেছে। পূর্ণ জলপাত্র রয়েছে পাশে। আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থাও। শিষ্যটি চারপাশে তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। অপেক্ষা করল। কেউ এল না। এদিকে খিদে তেষ্টায় সে বেচারি তো মরে যাচ্ছে। নিজের পেট ভরাবার আয়োজন রয়েছে সামনে, অথচ অন্যে যে-অন্নজলের ব্যবস্থা করে গেছে, তার খাদ্য সে খায় কেমন করে! সে না সন্ন্যাসী, তপস্বী! অধর্মাচরণ যে বড় পাপ!... তা শেষ পর্যন্ত শিষ্যটি আর ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করতে পারল না। ধর্মচ্যুত হতে হয় এই ভয়ে সে হেঁকে ডেকে বলল, 'এই অন্ন, ফল, জল, অগ্নি কার ? আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

আমি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত। যিনিই এই অন্নজলের অগ্নির আয়োজন করে থাকুন—তিনি আমার কথার উত্তর দিন। অনুমতি দিন অন্নজল গ্রহণ করতে'।" ইন্দ্র হঠাৎ চুপ করে গিয়ে সকৌতুক মুখে হাসতে লাগল।

নীলমণি বলল, "তারপর?"

ইন্দ্র বলল, "তারপর সেই নির্জনে হঠাৎ কার যেন গলা শোনা গেল। অদৃশ্য মানুষটি বলল, হে নবীন সন্ন্যাসী, আমি অগ্নি। আমি সর্বজনের। তুমি আমার দাক্ষিণ্য গ্রহণ করতে পার।...শিষ্যটি চমকে গেল। কিন্তু শুধু অগ্নি নয়, অগ্নির পর গলা শোনা গেল অন্নদেবতার। দেবতা বলল, আমিও সকলের, ক্ষুধার্ত জনের। তুমি আমায় ভোজ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পার। ...বনদেবতা বলল, আমার রাজত্বে গাছে গাছে কত ফল ধরে, পশুপাখি মানুষ সেই ফল খায়। তুমি আমার গাছের ফলগুলি খেতে পার।... আর জলের দেবতা বললে, সৃষ্টির আদি থেকে আমি জীবজগতের। জলের কি অধিকার-বিশেষ আছে সন্ন্যাসী! তুমি ওই জল পান করতে পার।"

"বাঃ! তারপর?"

"শিষ্যটি আগুন জ্বালাল, মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটিয়ে নিল, ফলপাকড় যা ছিল খেয়ে নিয়ে জলপান করে গাছতলায় শুয়ে পড়ল। দিব্যি একটা ঘুম মেরে সে আবার তার গুরুর আশ্রমের পথ ধরল।"

"আর সেই সোনালী হাঁস? মালা?"

ইন্দ্র হেসে উঠল। "আর কি সে সোনালী হাঁসের পেছনে ছোটে! মালাটি তো তাকে কম ভোগ ভোগালো না। কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এল!... কী পেল সে?" বলে ইন্দ্র কনককে দেখল একবার, তারপর নীলমণির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমায় কয়েকটি কথা বলি, নীলু! তুমি যদি ওই হাঁসের মালাটির জন্যে বসে থাকো—তুমি ঠকবে। ওটি ভ্রম। মোহ। ছলনা। জানি না তুমি ও মালাটির জন্যে এতকাল এত কিছুর পর শেষ পর্যন্ত এখানে এসে বসে আছ কিনা! যদি থেকে থাকো, তুমি কিন্তু ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়েছ... !"

ইন্দ্রর কথার মাঝখানে কনক উঠে দাঁড়াল। কিছু বলল না। চলে গেল।

নীলমণি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। ইন্দ্রকে দেখছিল।

ইন্দ্রও কথা বলছিল না।

নিস্তব্ধ ঘর। লণ্ঠনটি জ্বলছে একপাশে। ছায়া জমে আছে দেওয়ালের এখানে ওখানে। মাঠ থেকে মৃদু এক শব্দ ভেসে আসছিল, হয়ত চৈত্ররাতের

বাতাসে গাছের পাতায় শব্দ হচ্ছিল।

নীলমণি হঠাৎ বলল, "ইন্দরদা, আমি তো মালার জন্যে বসে নেই।"

"তা হলে কিসের জন্যে বসে আছ? তোমার চারপাশে কোনো আয়োজনেরই তো অভাব রাখেনি কনক। অগ্নি, অন্ন, ফলমূল, জল—সবই তো সে সাজিয়ে রেখেছে। তার দেহ, তার ভালবাসা, তার মায়া, মমতা তার নিবেদন—কোন্‌টি সে তোমার জন্যে রাখেনি! অন্য আর কারও জন্য কনক তার আয়োজন সাজিয়ে রাখেনি। তুমি সবই জান, তবু..."

"জানি। কিন্তু আমার ভয় হয়, দ্বিধা হয়...। ইন্দুমাসিও আমাকে বলেছিল—কনককে যেন বরাবর কাছে রাখি। বলেছিল, ভালবাসার তিনটি ঘর। একটি দেখা যায়—অন্য দুটি চোখে পড়ে না। সেখানে নাকি বড় অন্ধকার।...কনক যদি কখনো তার..."

বাধা দিয়ে ইন্দ্র বলল, "নীলু, তোমার মাসি তোমায় কী বলেছিল জানি না। আমি বলি, দেহ আর রূপ যদি ভালবাসার প্রথম ঘরটি হয় তবে তার অন্য দুটি ঘর হল—মন আর হৃদয়। প্রথমটি দৃশ্য, অন্য দুটি দেখা যায় না। সেখানেই তো তোমার প্রাণটিকে পাবে।"

নীলমণি কোনো কথা বলল না। ইন্দ্রকে দেখছিল।

ইন্দ্র এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, "একটু বাইরে যাই।..." বলে ইশারায় জলচৌকির ওপর রাখা ব্যাগটি দেখাল। বলল, "ওটি ভুল করে এখানে আসেনি, নীলু। আমি ফেলে দিয়ে গিয়েছিলাম। ওর মধ্যের জিনিসগুলি তুমি ভাল করে দেখোনি। ও-সবই তোমার।"

"আমার?"

"চার বছর আগেকার নীলুর মাপজোক, চোখের হিসেবে সামান্য ছোটবড় হতে পারে। ধুতি চাদরে হবে না। হয়ত জামায় হবে। তবু সুখময়বাবুর কাছে আমি একটা আন্দাজ নিয়ে নিয়েছিলাম...তোমাদের সমস্ত কিছুর। মনটি বড় উতলা হয়েছিল তখন থেকে। তাই তো এলাম।"

নীলমণির গলায় যেন স্বর ফুটছিল না। কোনো রকমে বলল, "কিন্তু চশমা? চশমা তো আমি পরি না ইন্দরদা!"

"ওটি ঘষা কাচের চশমা। দেখা যায় না। তোমার চোখ দুটি তো ওই রকমই ছিল। অন্ধ তুমি। কাছের জিনিসও দেখার চোখ তোমার ছিল না।"

ইন্দ্র আর দাঁড়াল না, ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

কনককে দেখা গেল বাইরে। মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। একা।

তৃতীয়া তিথির চাঁদ উঠেছিল আকাশে। জ্যোৎস্না ফুটেছে। চৈত্রের এলোমেলো বাতাস দিচ্ছিল।

ইন্দ্র মাঠে নামল। ধীরে ধীরে কনকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কনক মুখ ফেরাল না। দাঁড়িয়ে থাকল আগের মতনই।

ইন্দ্র কনকের কাঁধে হাত দিল। গাঢ় গলায় বলল, "কনকসখি, ভালবাসা জিনিসটি এই রকমই। দেবতারা সমুদ্রমন্থন করে অমৃত তুলেছিলেন। ভালবাসাটিও যে মন্থন করে তুলতে হয় গো! তার অনেক দুঃখযন্ত্রণা মনোকষ্ট। কত হতাশার পর হয়ত সে তোমার কাছে ধরা দেয়, আবার দেয়ও না। ভগবান যখন আমাদের হৃদয়টি দিলেন শেষ পর্যন্ত, তখন বলে দিয়েছিলেন দেহের কোথাও তোমার স্থান নেই গো, তুমি শূন্য। তবু তুমিই হলে দেহ আর আত্মার মধ্যে একমাত্র পূর্ণ।"

কনক মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

ইন্দ্র কনকের ভিজে গাল নিজের হাতে মুছিয়ে দিতে দিতে গাইল : "অনুগত জনে কেন করো তবে এত প্রবঞ্চনা..."

কনককে নিয়ে বারান্দার দিকে আসার সময় ইন্দ্রর চোখে পড়ল—নীলমণি তার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে।

যুধিষ্ঠিরের আয়না

গগনচন্দ্র গিয়েছিল শহরে। বড়দিনের ফূর্তি করতে।

পৌষ মাস। পূর্ণিমা। গাছপালা মাঠঘাটের যেন সাড় নেই শীতে। হিমে সব কিছু ভেজা, কুয়াশাও ঘন। কনকনে হাড়-চেরা হাওয়া দিচ্ছিল পৌষের।

খেস্টান-পাড়ার কাছাকাছি এসে গগনচন্দ্র তার মোটরবাইক নিয়ে কাঁটা আর কুলঝোপের গায়ে ছিটকে পড়ল।

তারপর আর হুঁশ ছিল না তার।

হুঁশ এল যখন, তখন দেখল, কে যেন তাকে ঝোপের কাঁটা সরিয়ে হাত ধরে টেনে তুলছে।

গগনচন্দ্র প্রথমটায় উঠতে পারছিল না। হাত পা নড়ছে কই! কোমর-পিঠ ভারী। মাথায় ঘোর লেগে আছে।

লোকটা অল্পক্ষণ টানাটানির পর গগনচন্দ্রকে বসিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে নিজের হাত-পায়ে সাড় পাচ্ছিল গগন। মাথাও খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এল। কোথায় কোথায় লেগেছে বুঝতে পারছিল না।

"আমি ধরে থাকি, আপনি উঠে দাঁড়ান, বাবু।"

লোকটা গগনের হাত ধরেই থাকল। বরং আরও জোর করেই ধরল।

গগনচন্দ্র উঠে দাঁড়াল। কাতরাচ্ছিল খানিকটা।

পায়ে কোমরে লেগেছে। বাঁ দিকের হাতে, পিঠে। খানিকটা বেঁকে এক পাশে হেলে দাঁড়িয়ে ঝোপের দিকে তাকাল গগন। কুলঝোপই বেশি, কাঁটাগাছ কম, তার পাশেই জংলাপাতার ঝোপ। পাতার ঝোপটাই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

হাত পা খেলিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে গগনচন্দ্র দেখে নিল, কোথায় কোথায় লেগেছে। মনে হল, হাত-পা ভাঙেনি, মাথাতেও চোট লাগেনি। ছিটকে

পড়ার দরুন ব্যথা লাগছিল, জোর ব্যথাই, তবে সে বেঁচে গেছে।

এমন সময় গগনচন্দ্রের কানে এল, খোল করতাল খঞ্জনি বাজিয়ে গান হচ্ছে কোথাও, কাছাকাছি।

গানটাও মোটামুটি শোনা গেল। 'প্রেমের রাজা জনম নিল বেথেল গোশালাতে, ভয় ভাবনা দূর হল ভাই আলোর মহিমাতে।'

গগনচন্দ্র বুঝতে পারল। "খেস্টান পাড়া না ?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"বড়দিনের গান হচ্ছে !'

হিম আর কুয়াশার জন্যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পাড়াটা বোঝা যাচ্ছে। ছোট পাড়া। চালাবাড়ির মতন একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে, ফাঁকফোকর দিয়ে দু-চার ছটা আলোর রেখা। ওই বাড়ির মধ্যেই গানের আসর বসেছে। অনেকেই গান গাইছে একসঙ্গে। কীর্তনের ঢঙে। খোল করতাল বাজছে।

গগনচন্দ্র দু-চার পা হাঁটবার চেষ্টা করল। বাঁ দিক চেপে পড়েছিল বলে ওই পাশটাতেই বেশি ব্যথা। তবে পা ফেলতে পারছে কোনো রকমে। হয়ত গোড়ালির কাছটায় মচকেছে।

"হাঁটতে পারবেন, বাবু ?"

"লাগছে। তবে পারব।" বলে গগনচন্দ্র নিজের পোশাক দেখে নিল। মাথায় তোর মোটা মাফলার আর লোমওঠা পুরু চামড়ার টুপি ছিল। দুটোই ঠিক আছে। গায়ে না-হোক তিন প্রস্থ শীতের জামা। তুলোর গেঞ্জি, পুরো হাতা সোয়েটার, তার ওপর গলাবন্ধ কোট, গলায় মাফলার। পরনে প্যান্ট। পায়ে মোজা জুতো।

গগনচন্দ্র নিজেই বলল, "কোনো রকমে বাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়।"

"পারবেন হাঁটতে ?"

"খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পারব মনে হচ্ছে। এই শীতে আর তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।"

"চলুন তবে।"

"আমার মোটর বাইক ?"

"আমি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাব।"

"পারবে ?"

"দেখি না কেন ?"

লোকটাকে এবার ভাল করে দেখল গগনচন্দ্র। তেমন স্বাস্থ্যবান নয়, তবে

রোগা বলা যাবে না। আলখাল্লা ধরনের এক জামা, বোস্টম বৈরাগীরা যেমন পরে। মাথায় তুলো-ওঠা হনুমান টুপি, তার ওপর মামুলি এক মাফলার জড়ানো। কান মাথা গাল জাপটে রাখা। পরনে ধুতি না পাজামা বোঝা যায় না।

"আমার বাড়ি এখান থেকে সিকি মাইলটাক। পারবে যেতে ?"

"আপনি পারলে আমিও পারব।"

"তবে চলো।"

লোকটা ঝোপের পাশ থেকে মোটরবাইক উঠিয়ে নিতে লাগল।

কাঁচা রাস্তা। কোথাও ইটের টুকরো, কোথাও পাথরের টুকরো, কোথাও-বা মাটি, কয়লার গুঁড়ো। গর্তের আর শেষ নেই।

গগনচন্দ্র খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। কনকনে হাওয়া, হিম যেন নাকেচোখে ঢুকে যাচ্ছে। এপাশে ওপাশে এবড়োখেবড়ো মাঠ, কোথাও তেঁতুলগাছের তলায় অন্ধকার, কোথাও-বা নিমগাছের আঁধার। অন্য গাছপালাও আছে। মাঠময় কুয়াশা ভেজানো জ্যোৎস্না।

হাঁটতে কষ্টই হচ্ছিল গগনচন্দ্রের। আজ সে শহরে বড়দিন করতে গিয়েছিল। রসময় তাকে ডেকেছিল : 'আসবে হে বাপ, খাওয়া-দাওয়া করব। নবতারা মুরগির রুস্টু করছে নিজের হাতে। দু বোতল মালু। প্রভাকর নিমাইচাঁদ থাকবে। বিকেল বিকেল চলে এসো।'

শহরে ক'জন বন্ধু আছে গগনচন্দ্রের। প্রভাকর তার স্কুলের বন্ধু। ওর বাপকাকার মিষ্টির দোকান। শহরের পুরনো দোকান। 'দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। নিচে ব্র্যাকেটে লেখা : 'শক্তিগড়'। মানে শক্তিগড়ের ঘরানার ময়রা ওরা। দোকান এখনও আছে। বিক্রিবাটাও বেশ। বাপকাকাই ব্যবসাটা দেখে।

তবে প্রভাকর তাদের জাত-ব্যবসায় যায়নি। এখানে ওখানে হাত লাগিয়ে শেষে এক মালখানা খুলেছে। মালখানা বলাই ভাল। সকালের দিকে চা ওমলেট ; বিকেলে চপ কাটলেট ডিম—এসব নিতান্ত পোশাকি ব্যাপার, সন্ধে থেকে বোতল গ্লাস সোডা আর ঝাল কাবাব, আলুভাজা।

প্রভাকরের বুদ্ধি আছে। শহরের মাঝমধ্যিখানে মালখানা খুলে বসেনি। বাপের মুখোমুখি কি বসা যায় ? শেষ-বাজারে পুরনো সাহেব ক্লাবের উলটো দিকে তার 'মেরি রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড ড্রিংকস' খুলে বসেছে। ওস্তাদ ছেলে প্রভাকর। বাপকাকার চোখের সামনে 'বার' খুললে হুজ্জোতি বাড়ত। বাইরে

ড্রিংকস, ভেতরে মাল। পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিয়েছে, ঝঞ্ঝাট করে কী লাভ !

নিমাইচাঁদও গগনচন্দ্রের বন্ধু। তবে স্কুলের নয়। নিমাইচাঁদের হল মোটর গাড়ির টায়ারের ব্যবসা। মোটামুটি পুরনো টায়ার নতুনের মতন করে সে বেচে। কম্পানির বাতিল টায়ার কেমন করে সে জোগাড় করে কে জানে ! দিল্লি থেকেও তার মাল আসে। আবার চোরাই টায়ারও আছে।

নিমাইচাঁদের টায়ারের দোকানের পাশে এক খোলার চালের ঝুপড়িঘর। সেখানে মোটর বাইক, স্কুটার, মপেড সারানো হয়। মিস্ত্রি রেখেছে নিমাইচাঁদ। ভালই চলে তার ব্যবসা। নিমাই আবার রগচটা, গুণ্ডা ধরনের, ব্যবসা করতে বসেও মিঠে বুলি সে আওড়ায় না। তবে হ্যাঁ, খদ্দেরকে সে ঠকাতে চায় না। সাফসুফ কথা বলে। নিমাইচাঁদ এমনিতে দিলখোলা, কথাবার্তাও মজা করে বলতে পারে।

বন্ধুদের মধ্যে রসময় হল রসের রাজা। ওর নাম রসরাজ হলেও হতে পারত। খাসা চেহারা, কারখানার স্টোরে, বলা হয় ওয়ার্কশপ স্টোরস, যত লোহা-লক্কড়ের মালপত্র ঢোকে লরি করে, নাট বল্টুর বস্তা থেকে যাবতীয় যা কিছু তার খবরদারি রসময়ের হাতে। সে পয়লা নম্বর ইনসপেক্টার। ভালই ঘুষ খায়। নিজে খায়, ওপরঅলাকেও খাওয়ায়।

সে যেমনই হোক রসময় কিন্তু রাজা লোক। খাও দাও ফুর্তি করো—এই তো জীবন। হাসো হুল্লোড় করো, নাচো গাও—নয়ত শালা জীবন কিসের ! রসময়ের কথায় বার্তায় সব সময় হাসির ছোঁয়া, শব্দগুলোও বানায় ভাল, রোস্টকে বলে 'রস্টু', মালকে 'মালু'।

রসময়ের বাড়িতে এসেছে নবতারা। চব্বিশ ছাব্বিশ বয়েস। টকটকে ফরসা রং, মুখ গোল, বড় বড় চোখ, চোখের মণি কটা রঙের। গড়ন খানিকটা ভারী। মাথার চুল যেন কোমর ছাড়িয়েছে, তেমন ঘন। বুক বলো, পিছন বলো—সবই ভার-ভারিক্কি।

নবতারা এসেছে মাস ছয়েক হয়ে গেল। রসময় বলে, তার মামাতো বোন। ওর কোনো মামা মাসি ছিল না। অন্তত নিজের তো নয়ই। তবু কোন সম্পর্কে মামাতো বোন জুটে গেল রসময়ের কে জানে !

তা নবতারাকে রসময়ের কাছে মানিয়েছে ভাল। রসময়ের মতনই সে হাসিখুশি, হালকা স্বভাবের। সাজগোজেও নজর আছে।

গগনচন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করতে গিয়েছিল শহরে। রসময়ের বাড়িতে

জমিয়ে ফুর্তি হল। খাওয়া-দাওয়া মদ্যপান। নবতারা আবার গান গেয়ে শোনাল—'কে এলে মোর-ঘুমঘোরে'।

দেখতে দেখতে রাত বারোটা বাজতে চলল।

প্রভাকর তখন গড়াগড়ি যাচ্ছে কাশ্মীরি সতরঞ্জিতে। নিমাইচাঁদ যাত্রার ঢঙে কবিতা আওড়াচ্ছে, 'বল বীর চির উন্নত মম শির।'

গগচন্দ্রের কী খেয়াল হল সে বাড়ি ফিরতে চাইল।

রসময় মাতাল গলায় বলল, নেহি যায়গা...মর্ যায়গে শালে।

নিমাইচাঁদ বলল, কোথায় যাবি ! আয় আমরা এখানে লটকে যাই।

গগনচন্দ্রর নেশা হয়েছিল, কিন্তু সে মাতাল হয়নি। মদ খাওয়ায় সে এখনও ততটা রপ্ত হয়ে ওঠেনি বলে কমই খায়।

এক একসময় মানুষের মাথায় ভূত চাপে। গগনচন্দ্রের মাথাতেও চাপল। বাড়ি সে যাবেই।

বন্ধুরা টানাটানি শুরু করল। যাস না শালা, মরে যাবি। ব্লাডি, বাইরে বরফ পড়ছে। তোর চোখ ঢুলুঢুলু। এত রাতে তুই বাইক হাঁকিয়ে বাড়ি যাবি কীরে ! রাস্তায় উলটে গিয়ে মরে পড়ে থাকবি।

আমি যাব।

তোর বউ একটা রাত দিব্যি একা থাকতে পারবে।

আমি ঠিক চলে যাব।

শালা, তোর বউয়ের পেটের বাচ্চা কি খসে যাচ্ছে যে তুই যাবি ! মরতে চাস !... তো ঠিক আছে, তুই তারার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়। আমি কিছু মনে করব না। তা বলে তোকে আমি মরতে দিতে পারি না।

গগনচন্দ্র শুনল না। বরং একশো টাকার বাজি রেখে তার মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মাইল চারেক পথ। শহর ছাড়াতে মাইলটাক। তারপর দু মাইল মতন পাকা রাস্তা। বাকিটাই কাঁচা। গ্রাম আর কোলিয়ারির রাস্তা।

বারো আনা পথ পার হয়ে এসে শেষমেষ এই অঘটন।

"বাবু ?"

গগনচন্দ্রর খেয়াল হল। নেশা এখনও আছে খানিকটা, তবু ব্যথাটাই বেশি লাগছিল। গোড়ালিটা কী ফুলে যাচ্ছে ? কোমর টনটন করছিল।

"বাবু হাঁটিতে কষ্ট পাচ্ছেন, আমার কাঁধ ধরুন।"

"চলো তুমি। আর শ দুই গজ!"

"চলুন তবে।"

হঠাৎ যেন মনে পড়ল গগনচন্দ্রের। "তোমার নাম কী হে?"

"যুধিষ্ঠির।"

"যুধিষ্ঠির কী? মানে পদবি?"

"বিশ্বাস।"

"তুমি এত রাতে ওখানে এলে কেমন করে?"

"আজ্ঞে, গান শুনতে এসেছিলাম। একটি বার বাইরে এলাম জল ফেলতে। দেখি গাড়ি উলটে আপনি পড়ে গেলেন।"

"ও!....তুমি গান শুনছিলে। খেস্টান পাড়ায় থাক?"

"না আজ্ঞা। আমার এক চেনা জন থাকে!"

গগনচন্দ্র একটু দাঁড়াল। গোড়ালির সঙ্গে হাঁটুটাও গিয়েছে নাকি? দেখার উপায় নেই। মনে হচ্ছে, হাঁটু ক্রমশই ফুলে যাচ্ছে, বেশ ব্যথা। পিঠ কোমরও টনটন করছে। তিন—চার প্রস্থ গরম জামাকাপড় না থাকলে কুলের কাঁটায় কেটে-ছড়ে সারা গা রক্তারক্তি হয়ে যেত।

যুধিষ্ঠিরের কাঁধে হাত না রেখে পারল না গগনচন্দ্র। "তুমি কি খেস্টান?"

"বাপ-মা যা হয় ছেলেও তো তাই, বাবু!"

যন্ত্রণার মধ্যেও গগনচন্দ্র একটু যেন হাসল। "নামটি কিন্তু যুধিষ্ঠির গো!...না না, আমি তোমায় ঠাট্টা করছি না। এখানে সবাই তো ওই রকম।"

যুধিষ্ঠির কিছু বলল না।

গগনচন্দ্রও আর ঠাট্টা-তামাশা করল না। এখানে খেস্টান পাড়ার সবাই ওই রকমই। কৃষ্ণপদ দাস, শিবপদ মণ্ডল, ভবানীচরণ বিশ্বাস, কালীনাথ সরকার আরও কত। মেয়েরাও কেউ সাবিত্রী, কেউ দুর্গাবালা। গগনচন্দ্রের বন্ধু ছিল। যাকোব কান্তিনাথ বিশ্বাস, তার মায়ের নাম বীণাপাণি। নিষ্ঠাবান কৃশ্চান। কান্তিনাথ জামালপুর থেকে রেলের অ্যাপ্রেনটিসশিপ পাস করে মোগলসরাই চলে গিয়েছিল। তারপর সে কোথায় আছে কে জানে!

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল গগনচন্দ্র। বলল, "ওই যে আমার বাড়ি।"

যুধিষ্ঠির মাথা নাড়ল।

দুই

সকালে বোঝা গেল গগনচন্দ্র তিন চার জায়গায় বেশ চোট পেয়েছে। বাঁ পায়ের গোড়ালি বেশ ফুলে ঢোল। বদখত চেহারা হয়েছে। হাঁটুও জখম। ফুলেছে, নীল হয়ে গেছে। কোমর নোয়ানো যাচ্ছে না। পিঠ জুড়ে ভীষণ ব্যথা। ডান হাতের কনুই আর বুড়ো আঙুলও জখম।

কাছাকাছি ডাক্তার বলতে বিজয়হরি। কানে কালা, বুড়ো। একসময় কোলিয়ারির ডাক্তার ছিল। বর্ধমান স্কুলের পাস করা। পুরনো ডাক্তার। হাতযশ আছে।

বিজয়হরি এসে দেখে গেলেন গগনচন্দ্রকে। বললেন, দু-চার দিন যাক, দেখো ফোলা আর ব্যথা কমে কি না ! না হলে শহরে গিয়ে ছবি করাতে হবে। বলে বিজয়হরি তাঁর পুরনো চিকিৎসা-ব্যবস্থা লিখে দিলেন ফর্দর মতন করে। লোশন, অ্যাসপিরিন বড়ি, পট্টি, বার্লসিটে মেলাবার জন্যে আর-এক রকম বড়ি, একটা মলম। বললেন, হাঁটাচলা করবে না। পট্টি বেঁধে বিছানায় শুয়ে থাকবে ; চেয়ারেও বসে থাকতে পার তবে পা ঝুলিয়ে রাখবে না।

বিজয়হরি চলে গেলে রোহিণী স্বামীকে কয়েক পলক দেখল। তারপর বলল, "নাও, এবার পা মাথায় নিয়ে বসে থাকো। ঠিক হয়েছে। তখনই বলেছিলাম, শীতের মধ্যে রাত জেগে ফুর্তি করতে যেতে হবে না। শুনলে আমার কথা ! ইয়ার বন্ধুরা নিশিডাক ডাকল। তা এবার সেই আকাশের তারাটিকে ডাকো, সে এসে তোমার পা নিয়ে বসে থাকুক কোলে করে। লজ্জাও করে না। ছিছি !"

যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছে গগনচন্দ্র, তার ওপর ওই ঠেস দিয়ে নবতারার কথা তোলায় সে রেগে গেল। বলল, "কেন, তুমি আছ কী করতে ?"

"তোমার পা আমার কোলে তুলে বসে থাকতে বয়ে গেছে !"

"কোন্ রাজরানীর কোল তোমার !"

"তোমারই বা কোন রাজপুত্তুরের পা ?"

"বাজে ঝগড়া করো না। পা আমার ভেঙেছে তোমার নয়। আমার পা নিয়ে আমি বসে থাকব, তুমি তোমার পা নিয়ে নেচে বেড়াও গে যাও ! যেমন স্বভাব তেমনই মুখ। শালা বিয়ে করে পাঁকে পড়ে গিয়েছি।"

রোহিণী ঠোঁট-পাতলা, কিন্তু দাঁত ধারালো। বলল, "তাই নাকি ! পাঁকে পড়েছ ! তা এই পাঁকে যখন ডুবে থাকো হাত-পা ছড়িয়ে তখন তো মুখের বচন অন্য রকম শুনি। কত কী মধু ঝরাও মুখে, এই পাঁকের মুখে-বুকে পদ্মগন্ধ

ছোটে। জিবের জলটিও শুকোতে পায় না...”

রোহিণীকে আর কথা শেষ করতে দিল না গগনচন্দ্র, খেপে গিয়ে বলল. “চলে যাও, আমার সামনে দাঁড়াবে না।”

রোহিণী চলে যেতে যেতে বলল, “কালই আমি মায়ের কাছে চলে যাব।”

“যাও যাও, যেখানে খুশি চলে যাও। শালা বউ না ধিনিকেষ্ট!”

রোহিণী চলে গেল।

মাথাটা গরমই হয়ে থাকল গগনচন্দ্রের। তার বউ যে সুন্দরী সবাই জানে। একেবারে নিখুঁত না হোক, রীতিমত সুন্দরী। গায়েগড়নে সুন্দর, মানানসই। মুখ ঝকঝকে। যেমন কপাল, তেমনই নাক-চিবুক। চোখ দুটিই যা একটু বেশি বড়-বড়। চোখের পাতা সামান্য মোটা, কী ঘন পলক চোখের পাতার। গলা লম্বা। ভরা শক্ত বুক। ছিপছিপে শরীর। কোমর মাঝারি। রোহিণীর গায়ের রঙ ফরসা।

বিয়েটা দিয়েছিল বাবা। নিজের পছন্দে। মধুডাঙার মেয়ে। ধনী নয় মোটামুটি চলে-যায় গোছের পরিবার। জ্ঞাতি গোষ্ঠীও বড়। রোহিণী এ-বাড়িতে এসেছিল একুশ বছর বয়েসে। এখন তার বয়েস চব্বিশ হল। এখানে পা দিয়েই সংসারের চাবির গোছা আঁচলে বেঁধেছিল রোহিণী। গগনচন্দ্রের মা নেই। সেই মড়কের বছরে মা মারা গেল। বছর ছ' সাত হতে চলল। ছেলের বিয়ে দিয়ে বাবা যখন বেশ খুশিতেই আছে তখন একদিন সন্ন্যাস রোগে চোখ বুজল আচমকা। বউ আনার পরের বছর। এখন বাড়িতে শুধু গগনচন্দ্র আর রোহিণী।অন্যদের মধ্যে জ্ঞাতি সম্পর্কের এক কম বয়েসী বিধবা দিদি, দু-তিনজন কাজকর্মের লোক।

বাবা বেঁচে থাকলে রোহিণীর কর্তামি যে কমত তা নয়, তবে এখন যেন ও সাপের পাঁচ পা দেখেছে। গগনের ওপর বড় বেশি খবরদারি করতে চায়। কথায় লাগাম নেই।

গগনচন্দ্র কিন্তু বউকে ভালবাসে। রোহিণীও কি ভালবাসে না? যথেষ্টই বাসে। তবে দু'জনের মধ্যে খটাখটিও লাগে। তা তো লাগবেই। দু'জনেরই কম বয়েস, মাথার ওপর গুরুজন নেই। পাড়ার এক ঠাকুমা—মতিঠাকুমা খুব রসিক, মুখেও কিছু আটকায় না। ছড়া কাটে কত রকম, পদ্য বলে। আবার গানও গায় বুড়ি হেসে হেসে। মতিঠাকুমা বলে, 'বুঝলি শালা, নাতি। নাতবউয়ের ওই চেহারা—অমনটি তুই পাবি কোথায়! আমার আর কী রূপ ছিল বল। তাতেই তোর ঠাকুরদা রস করে গান গাইত : তুমি আমার ঘরকন্না

তুমিই আমার ঘুঁটি, ধান ভানতে তুমিই ঢেঁকি, গলা কাটতে বঁটি। ...বউ সামলে চলবি নাতি, নয়ত গলায় কোপ পড়বে।'

গগনচন্দ্র ভালই জানে, তার বউ শুধু বঁটি নয় আশবঁটি।

পায়ের শব্দ পেল গগনচন্দ্র।

"দাদাবাবু ?"

হলধর ঘরে এল। বাইরের মহলের কর্তা। গগনদের দত্ত-কম্পানির লোক। সর্বেসবাই বলা যায়। পুরনো কর্মচারী। বাবার পেয়ারের 'হলো'। বাবা নেই, হলধর আছে। এ-বাড়িতেই থাকে। থাকবেও বুড়ো হয়ে না-মরা পর্যন্ত।

গগনচন্দ্র বলল, "কী হল ?"

"যে-লোকটা তোমায় নিয়ে এসেছিল সে এখনও বসে আছে। দেখা করে যাবে বলছে।

"যুধিষ্ঠির ! আছে এখনও ? ডাকো তাকে।"

হলধর চলে যাচ্ছিল, গগনচন্দ্র বলল, "ওকে চা-টা খাইয়েছ সকালে !"

"খাইয়েছি।"

"ডাকো।"

চলে গেল হলধর।

সামান্য পরে যুধিষ্ঠিরকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে হলধর চলে গেল আবার।

গগনচন্দ্র দেখল যুধিষ্ঠিরকে। রাত্রে তার মাথা চোখ যেন পরিষ্কার ছিল না। থাকার কথাও নয়! নেশার ঘোর হয়ত সামান্যই ছিল—কিন্তু ব্যথা যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছিল, যুধিষ্ঠিরকে দেখেও ঠিকমতন দেখা হয়নি। এখন সকালের আলোয় ভাল করে দেখল। মাথায় মাঝারি, রোগাটে চেহারা, ঘাড় পর্যন্ত রুক্ষ চুল, কিছু বোধ হয় পাকা রঙ ধরেছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রঙটি ঠিক কালো নয়, তামাটে। শুকনো মুখ, লম্বাটে। চোখ দুটি বুজে আসছে। গায়ে এক আলখাল্লা। মনে হল, ভুট-কম্বলের কাপড় কেটে আলখাল্লাটি বানানো। একটি মাফলার। টুপিটা মাথায় নেই। হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুধিষ্ঠির।

গগনচন্দ্র বলল, "বসো।"

যুধিষ্ঠির বসল না। দাঁড়িয়ে থাকল। "কেমন আছেন বাবু ? ডাক্তারবাবু কী বললেন ?"

"ওষুধপত্র লাগাতে বললেন। খাবার ওষুধও দিয়েছেন। বললেন, ক'দিন দেখতে। ব্যথা না কমলে শহরে গিয়ে ছবি করাতে হবে।"

"তা ঠিক—" যুধিষ্ঠির দু পা এগিয়ে এসে গগনচন্দ্রর পা দেখল। বলল, "ভাঙেনি। ভাঙলে আপনি এতটা পথ হেঁটে আসতে পারতেন না।"

"না ভাঙলেই বাঁচি।"

যুধিষ্ঠির দাঁড়িয়ে থাকল।

গগনচন্দ্র কী বলবে বুঝতে পারছিল না। "চা-টা খেয়েছ!"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"কাল তুমি ওই সময়টিতে না থাকলে কী হত জানি না!"

যুধিষ্ঠির কিছু বলল না। একটু যেন হাসল।

"বসো না তুমি!"

ঘরের কোণে টুল ছিল। সরে গিয়ে টুলের কাছে দাঁড়াল যুধিষ্ঠির। বসল না।

"তুমি এখন যাবে কোথায়?"

ঘর দেখতে দেখতে যুধিষ্ঠির বলল, "কিছু ঠিক নেই বাবু!"

গগনচন্দ্র খানিকটা অবাক হল। "তোমার বাড়ি কোথায়?"

যুধিষ্ঠির আবার একটু হাসল। ঘাড় নাড়ল। বলল, "নিজের ঘরবাড়ি নাই। এখানে ওখানে দিন কেটে যায়। একটা তো মানুষ, যখন যেখানে ঠাঁই পাই থেকে যাই।"

গগনচন্দ্রের মনে হল, মানুষটি তো অদ্ভুত। বে-ঠিকানার লোক, নিরাশ্রয়। অথচ কথা শুনে মনে হয় না, কোনো আফসোস রয়েছে।

"তুমি করো কী?" গগনচন্দ্র বলল।

যুধিষ্ঠির একইভাবে বলল, "যখন যা হাতে জোটে। কাঠকুটোর কাজ জানি, রঙের কাজ জানি। ছবি বাঁধাই পারি, বাবু।"

গগনচন্দ্র হেসে বলল, "কেমন ছবি বাঁধো?"

"যে যেমন বাঁধতে দেয়। লক্ষ্মীর পট, মা দুর্গার পট, রাধা-কেষ্টর ছবি...।"

"যিশুর ছবি?" গননচন্দ্র একটু মজা করল।

"আজ্ঞা হাঁ। যে যেমন দেয়। মেরী মায়ের ছবি, সাধু পল...। মানুষের ছবিও বাঁধি। ফটো। গাছপালা নদী আকাশের ছবিও।"

গগনচন্দ্র পায়ের গোড়ালিতে হাত বোলাতে বোলাতে কী যেন ভাবছিল। যুধিষ্ঠিরকে তার বেশ লাগছে। সরল, সাদাসিধে। বলল, "তুমি এখন আবার

যাবে কোথায় ?"

যুধিষ্ঠির নিজের চোখ মুছতে মুছতে হাই তুলল। বলল, "ওইখানেই যাব একবার। আমার ঝোলাটি পড়ে আছে। আমায় গান গাইতে ডেকেছিল। আজকের দিনটি থাকতে পারি..."

"তুমি গান গাও ?" গগনচন্দ্র বেশ অবাক।

"ডাকলে গাই, না-ডাকলেও গাই। প্রভুর গান।"

"আচ্ছা আচ্ছা !" গগনচন্দ্র কৌতুক বোধ করছিল। "কাল তুমি কোন গান গাইলে যুধিষ্ঠির ?"

"গোশালার গান।...'আজি আকাশেতে জ্বলে তারা/ আজি পথ চলি আসে কারা,/ আজি মেষ ফেলি রাখালেরা/ চলে গোশালায়....' "

গগনচন্দ্র জোরেই হেসে উঠল। মানুষটা কী সরল, অকুণ্ঠ। বৃথা লজ্জা নেই। "বাঃ, তুমি তো গানটি ভাল বললে গো ! লেখাপড়া জান ?"

"বাংলা অক্ষর পড়তে পারি।"

কী যেন একটু ভেবে গগনচন্দ্র হঠাৎ বলল, "যুধিষ্ঠির, তুমি আমার এখানে থাকবে ? থাকো না।"

যুধিষ্ঠির এবার গগনচন্দ্রকে দেখতে দেখতে হাসল একটু। বলল, "আমায় রেখে আপনি কী করবেন ?"

"করব আবার কী ! থাকো !... মানুষটি তুমি বেশ হে ! কাল তুমি না থাকলে আমি কাঁটাঝোপে পড়ে থাকতাম। মরেই যেতাম ঠাণ্ডায়।... থাকো তুমি।"

যুধিষ্ঠির ভাবল সামান্য ; বলল, "আপনি থাকতে বলছেন বাবু, থাকলাম। কাজ কী করব ?"

"কাজের লোক অনেক আছে, তোমায় কিছু করতে হবে না।"

যুধিষ্ঠির মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না বাবু, কাজ না করে খেতে নেই। প্রভু যিশু বলেছেন, নিজের রুটির জন্যে কাজ করবে। রুগ্ন আর শিশুরা কাজ করবে না—; আমি জোয়ান-মানুষ, আমি কেন কাজ করব না ?"

গগনচন্দ্র হেসে ফেলল। "তুমি তো বেশ জ্ঞানের কথা বলতে পার ! ঠিক আছে, কাজের একটা ব্যবস্থা হবে তোমার। বাড়ি আছে, দোকান আছে। অ্যাসবেসটাস শিট, টিনের শিট, পাইপ, লোহা-লক্কড়ের দোকান আমাদের। লোকজন খাটে। তুমি এখানেই থেকে যাও। এখনকার মতন তো থাকো। তারপর তোমার মন না-চাইলে চলে যেও। কেমন ?"

যুধিষ্ঠির রাজি হয়ে গেল। মাথা নাড়ল। "আমার ঝোলাটি তবে নিয়ে আসি?"

"এসো।"

চলে গেল যুধিষ্ঠির।

তিন

বড়দিন কাটল। সাহেবি নতুন বছর পড়ল। পৌষের বাতাসে গাছের পাতা খসে উড়ে যাওয়ার মতন নতুন বছরের দিনগুলিও উড়ে যেতে লাগল! দেখতে দেখতে মাঘ মাস।

মাঘ মাসে শীত এখানে যেন থিতু হয়। পৌষে শীতের বোধহয় খানিকটা চাঞ্চল্য থাকে। মাঘ একেবারে ঘন। সকাল দুপুর তবু রোদ থাকে, বিকেল ফুরোলো কি কনকনে হাড়-জমানো শীত মাঠঘাট গাছপালা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে ধীরে ধীরে। আকাশ থেকেও হিম ঝরে; বৃষ্টির ফোঁটা নয়, হিমের বিন্দু ঝরে-ঝরে ভিজে যায় গাছের পাতা, মাঠের ঘাস। কুয়াশা নিবিড় হয়ে জমে থাকে চারপাশে।

গগনচন্দ্র পা কোলে নিয়ে বসে থাকল দিন পনেরো। তার কাপল ভাল হাড়গোড় ভাঙেনি পায়ের। পরের সাতটা দিন পা নামিয়ে লেঙচে লেঙচে হাঁটল দশ বিশ পা। ততদিনে পিঠ কোমরের ব্যথা মরেছে বারো আনা। কালশিটেও মিলিয়ে এসেছে। মাঝে ক'দিন জ্বরও হয়েছিল গগনচন্দ্রের। ঠাণ্ডা-লাগার জ্বর। সে-জ্বর সেরে গেল। হপ্তা তিনেক পরে অনেকটাই যখন সুস্থ সে, রোহিণী বলল, "কই, তোমার ইয়ার-বন্ধুরা তো খোঁজ নিতে এল না—তুমি মরলে না বাঁচলে?"

রসময়রা কেউ আসেনি সত্যি কথাই। না আসার বড় কারণ—তারা জানেই না সেদিন ফেরার পথে গগনচন্দ্র মোটরবাইক থেকে ছিটকে পড়েছিল। কেমন করেই বা জানবে? কেউ কি তাদের খবর দিয়েছে! গগনচন্দ্রও কাউকে দিয়ে খবর পাঠায়নি। লজ্জা করেছে। দোষ বন্ধুদের নয়, তারই দোষ। সে কানে তোলেনি বন্ধুদের কথা, সাহস আর মেজাজ দেখিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। এখন কোন লজ্জায় খবর দেয়ে যে—আমি উলটে পড়েছি রে—পা জখম, এসে দেখে যা।

বউয়ের কথা হজম করে নিয়ে গগনচন্দ্র বলল, "ওরা জানে না।"

"জানাতে কতক্ষণ! কাউকে পাঠিয়ে দাও।"

"সে দেখা যাবে।"

রোহিণী ঠোঁট টিপে হাসল। সে জানে, স্বামী এই পড়ে যাবার ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করবে যতটা পারে। পুরুষমানুষটির কোনো কোনো ব্যাপারে বেশ অহঙ্কার আর অভিমান আছে। তার ধারণা, ওর মতন পাকা মোটর সাইকেলঅলা এ-তল্লাটে নেই। রাস্তা যেমনই হোক, সকাল হোক আর দুপুর হোক, রাত হোক—ঝড়বৃষ্টি কাদা যেমনই হোক বাবু ঠিক কায়দা-কৌশল করে বাইক নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এ নিয়ে রোহিণী কত ঠাট্টাই করে স্বামীকে। বলে, 'তুমি বাবা-ঠাকুরের ব্যবসাটি নিয়ে বসে আছ কেন, সার্কাস পার্টিতে চলে যাও না, না হয় হিন্দি সিনেমায়—তোমার দু-চাকা নিয়ে খেলা দেখাবে !'

গগনচন্দ্র মাথা নাড়ে। 'যাব, একদিন পিছলে যাব। তোমার সঙ্গে ঘর করা তো যাবে না। সার্কাস পার্টিতেই ভিড়ে যাব।'

'আ-হা-রে, সেদিন যে কবে আসবে ! আমি একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বসে দিন কাটাতে পারব ! তোমার ফরমাস খাটার হাত থেকে বাঁচব, বাবা !'

স্বামী-স্ত্রীর এই হাসি-তামাশার মধ্যেও রোহিণী মনে মনে স্বীকার করে নেয়, তার পুরুষমানুষটি সত্যিই ভাল ভটভটি চালায়। এ-তল্লাটে অমন দেখা যায় না। অবশ্য এখানকার তল্লাটই বা কী, কতটুকু, কটাই বা ভটভটি ! কোলিয়ারির দিকে তিন চারটি, লালা মারোয়াড়ির বাড়িতে তার ছোট ছেলের একটা, আর পাল কন্ট্রাক্টারের ছোট ভাইয়ের একটা। পালরা অবশ্য এখানে থাকে না।

রোহিণী ঘর গুছিয়ে চলে যাবার আগে স্বামীর সঙ্গে খুনসুটি ঝগড়া করছিল। এ রকম রোজই হয়। সকালে দুপুরে রাত্রে। না হলে দিন যেন মজার হয় না। গগনচন্দ্রের ভাষায় 'পান্‌সে'; আর রোহিণীর ভাষায় 'স্যাঁতসেতিয়ে থাকে'।

বন্ধুদের খবর দেওয়ার কথাটা হয়ত তামাশা, কিন্তু রোহিণীর অন্য উদ্দেশ্য ছিল। স্বামীর পা এখন নিশ্চয়ই অনেকটাই ভাল, তবু তার ধারণা, শহরে গিয়ে একটা কি দুটো ছবি করিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ, সবটুকু ফোলা এখনও যায়নি গোড়ালির, ব্যথাও নয়। কোমরেও একটা ফিক ব্যথা লেগে আছে গগনচন্দ্রের।

শহরের বন্ধুরা খবর পেলে দেখতে আসবে গগনচন্দ্রকে। তখন ছবির কথা তুললে—তারাই টেনেটুনে নিয়ে যাবে তাকে।

রোহিণী বলল, "ডাক্তারবাবু যা যা করতে বললেন করলে, এখনও ফোলা ব্যথা যায়নি পুরোপুরি। অন্য একজন কাউকে দেখানো ভাল।"

"সেরে তো আসছে!"

"সারা দিন উঃ আঃ করছ, লেঙচে হাঁটছ—শেষ পর্যন্ত লেঙড়া হয়ে থাকবে নাকি? একবার দেখাতে ক্ষতি কিসের?"

"কাকে?"

"শহরের ডাক্তার নেই! আমি বলি কী, তোমার বন্ধুদের খবর দি—তারা গাড়িটাড়ি জোগাড় করে আসুক। তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনুক।"

গগনচন্দ্র বলল, "গাড়ি এখানেও পাওয়া যায়। কোলিয়ারির মহেশ্বরকে খবর দিলে সে জিপ নিয়ে আসবে।"

"যাবে কার সঙ্গে?"

"যুধিষ্ঠির থাকবে সঙ্গে।"

যুধিষ্ঠিরের কথায় রোহিণী বলল, "লোকটা সারাদিন কী করে বুঝি না।"

"কেন, ওর কাজ করে। আমি তো বলে দিয়েছি—বাড়িতে কাঠকুটোর মেরামতির কাজগুলো আগে শেষ করবে। তারপর বাড়িতে যা পুরনো ছবিটবি আছে সেগুলো নতুন করে বাঁধাবে। যুধিষ্ঠিরকে যা বলেছি তাই করছে।" গগনচন্দ্র বাড়িতেই রেখেছে যুধিষ্ঠিরকে, দোকানে লাগায়নি। নিজে যখন দোকানে গিয়ে বসবে তখন না-হয় নিয়ে যাবে তাকে। নতুন লোককে তার অসাক্ষাতে দোকানে পাঠানো উচিত হবে না।

রোহিণী বলল, "খুটখাট করে কী করছে জানি না। তবে বাড়ির কেউ খুশি নয়। রাস্তা থেকে উটকো লোক ধরে এনে এভাবে না ঢোকালেই পারতে।"

গগনচন্দ্র অসন্তুষ্ট হল। বলল, "আমার বাড়ি, আমি যাকে খুশি ঢোকাব, কার কী বলার আছে!"

"আমার আছে। বাড়ি আমারও।" রোহিণী চটে গেল। "আমি এ-বাড়ির ময়না-ঝি নই যে ও আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে, আর কী রকম অসভ্যের মতন মুখ টিপে টিপে হাসবে।"

গগনচন্দ্র থ' হয়ে গেল! কী বলছে রোহিণী? মাথা খারাপ হয়ে গেল তার! সাদাসিধে সরল একটা মানুষ, একেবারে মামুলি, ভিখিরি গোছের, চালচুলো নেই লোকটার, সেই লোক কি কখনও এ-বাড়ির মালিকানীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারে, আর হাসতে পারে! গগনচন্দ্র বিশ্বাস করল না। তার মনে হল, পুরনো লোক যারা এ-বাড়িতে আছে বছরের পর বছর,

কাজ করুক না-করুক, ফাঁকি মেরে বউদিমণির মন জুগিয়ে দিব্যি জায়গা জুড়ে বসে আছে—তাদের ঠিক সহ্য হচ্ছে না যুধিষ্ঠিরকে। এ-রকম হয়। খুবই স্বাভাবিক। ঈর্ষা। এই জন্যেই যুধিষ্ঠিরকে সে এখনও দোকানে পাঠায়নি।

গগনচন্দ্র বলল, "তুমি কী ! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? ওই লোকটা একটা বাউন্ডেলে, ভিখিরি। ওর বয়েস আমার চেয়ে বেশি। চল্লিশ অন্তত। ও তোমায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। অসম্ভব।"

"তবে আমি মিথ্যে কথা বলছি ?" রোহিণীও রুক্ষ গলায় বলল।

গগনচন্দ্র কোনো জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না। রোহিণী মিথ্যে বলছে না হয়ত, কিন্তু ভুল করছে। বা কেউ তার কান ভাঙিয়েছে। "তোমায় কেউ বলেছে ?"

"না। আমার চোখ নেই ?"

"তুমি থাক অন্দরমহলে, ও রয়েছে বাইরে—?"

"বাইরে কতক্ষণ থাকে, ভেতর বাড়িতেই ঘোরেফেরে, কাজ করে।"

"আগে কই এ-কথা তো বলোনি ?"

"আগে কী বলব ! ক'দিন এসেছে ও ! তোমায় দেখব, না তোমার যুধিষ্ঠিরকে দেখব ! নজর করিনি। আজ ক'দিন নজরে পড়ছে।"

গগনচন্দ্র চুপ করে থাকল। খারাপ লাগছিল তার। মানুষটাকে তো গগনচন্দ্র ভাল বলেই জানে। শুধু ভাল নয়, কথাবার্তাও বলে বেশ। মাঝে মাঝে গগনচন্দ্র তাকে ডেকে পাঠিয়ে গল্প করে। আবার নিজেও এসে হাজির হয় যুধিষ্ঠির। আচারে ব্যবহারে নম্র ; সহবত জানে।

রোহিণী বলল, "ওর হাবভাব দেখে আমার মনে হচ্ছে, ও যেভাবে সব দেখেশুনে নিচ্ছে এই বাড়ির, একদিন চুরি ডাকাতি করে পালাবে। গয়নাগাঁটি আর আমি আলমারিতে রাখব না ; বাবাঠাকুরের পুরনো সিন্দুকে রাখব।"

বিরক্ত হয়েও গগনচন্দ্র বলল, "বাজে কথা বলো না। তোমার বাড়িতে একটা লোক এসে থাকছে ক'দিন—তাতেই তোমার মনে হচ্ছে সে চোর ডাকাত !"

"আমার না হয় কুচ্ছিত মন হল, তোমার দিদিকে ডাকব ?"

"কমলাদিদি ?"

"দিদি বিধবা মানুষ। গয়নাগাঁটি পরে না। হাতে সরু সরু দু'গাছা চুড়ি, আর গলায় একটা হার। সেই হার গত পরশু কোথায় হারিয়ে গেল। দিদি আমায় প্রথমটায় বলেনি। পরে যখন সারা বাড়ি খোঁজ হচ্ছে—তোমার ওই যুধিষ্ঠির হারটা এনে দিল। বলল, কলঘরের বাইরের নালায় পড়েছিল।"

কমলাদিদি নিজের নয়, আশ্রিতা। বাবাই আশ্রয় দিয়েছিল। বিধবা মেয়ে, বয়েস কম, কোথায় ভেসে বেড়াবে! দেখতে মাঝারি। তবে খুব চাপা, তার ভেতরের কথা আঁচ করা যায় না। গগনচন্দ্রের বিয়ের আগে দিদির সঙ্গে ভাবসাব ভালই ছিল। আড়ালেই বেশি। বিয়ের পর দিদি সাবধান হয়ে গিয়েছে। গগনচন্দ্রও আর সেই ঝোঁকটা অনুভব করে না—আগে যা যা করত। কমলাদিদিও সরে গিয়েছে। আগে তার একটা অধিকার-বোধ জন্মে গিয়েছিল—গগনচন্দ্রকে কোনো কোনো ব্যাপারে বাধ্য করত, রাগ অভিমান দেখাত। রোহিণী এ-বাড়িতে আসার পর থেকে বড় অদ্ভুতভাবে নিজেকে পিছিয়ে নিল দিদি। গুটিয়ে নিল, আড়াল করে ফেলল। এখন গগনের ঘরে একা কখনো আসে না। এই যে গগনচন্দ্র হাত-পা পিঠ জখম করে বিছানায় পড়ে থাকল, কমলাদিদি ক'বার আর নিজে ঘরে এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছে গগনের। বার কয়েক মাত্র, তাও রোহিণীর সামনে। খোঁজ-খবর যা করার রোহিণীর কাছেই করে অন্দরমহলে।

গগনচন্দ্র স্ত্রীকে দেখল অন্যমনস্কভাবে। বলল, "ঝট করে একটা লোককে চোর ঠাওরানো ঠিক নয়। তোমরা নিজেরা সাবধান নও, ভুল করে এটা-সেটা ফেলে রাখো যেখানে সেখানে। কী ঘটেছে না জেনে আমি নিরীহ একটা মানুষকে চোর বলতে পারব না।"

"তা হলে ডাকি দিদিকে?"

"কোনো দরকার নেই।"

রোহিণী সামান্য দাঁড়িয়ে চলে যেতে যেতে বলল, "নাম যুধিষ্ঠির হলেই ধম্মপুত্তুর হয় না।"

চলে গেল রোহিণী।

মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল গগনচন্দ্রের। যুধিষ্ঠির মানুষটার মুখে গায়ে যেন নোংরা মাখিয়ে দিয়ে গেল তার বউ। একটা ভাল মানুষকে তুমি ওভাবে ইতর চোর বদমাশ করতে পার না। সে তোমার বাড়িতে আছে, দুটি খাচ্ছে বলেই তার ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান থাকবে না, সে মন্দ মানুষ হয়ে যাবে!

যুধিষ্ঠির লোকটা যে অকর্মণ্য তাও নয়। গগনচন্দ্র দেখেছে, মানুষটার চোখ আছে, বোধবুদ্ধি আছে, হাতের কাজ ভাল। এ-বাড়িও তো কম পুরনো হল না। দরজা জানলা, ছিটকিনি, হুড়কো—কত কী খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নষ্ট হয়েছিল। যুধিষ্ঠির তো একে একে অনেক কিছুই সেরে ফেলল। তা ভালই হল। চৈত্র মাসে বাড়িতে কলি ফেরানোর কাজ হবে, তার আগে মেরামতির

ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে। ও দিকে আসবাবপত্রেরও সেই অবস্থা। এটা ভেঙেছে, ওটা হেলে পড়েছে, কোনোটার ডালা খুলে গেছে, রঙচঙ বলে কিছু নেই আর। তা এসবেও একে একে হাত দিতে শুরু করেছে যুধিষ্ঠির। নিজের মনে কাজ করে আর বিড়ি খায়।

যদি পয়সার কথা ওঠে—এসব মেরামতিতেও তো গগনচন্দ্রের পয়সা লাগত—তবে সে হাসে, যেন ও আবার কী কথা বাবু! নিজের কাজ দিয়ে যুধিষ্ঠির দুটো খায়। তা হলে অকারণ তার নামে এত অপবাদ কেন?

সংসারে মেয়েরা এই রকমই হয়। খুঁত ধরে আর সন্দেহ করে। তাদের মন বড় ছোট। চোখের পাতাও থাকে না অনেকের।

গগনচন্দ্র বেশ বিমর্ষ হয়ে বসে থাকল।

চার

একবার কিছু শুরু করলে রোহিণী যেন থামতে জানে না।

পরের দিন আবার। "তোমার যুধিষ্ঠির ভেবেছে কী! দিনের মধ্যে দশবার ছুতো করে-করে মেয়েদের সামনে এসে দাঁড়ায়! ছেঁড়া কাপড় দাও, সোডা থাকলে সোডা দাও, সাবান দাও...! কোন কাজটা ও করে! সারাদিন ঠুকঠুক আর আমাদের দিকে নজর...!"

গগনচন্দ্র বিরক্ত বোধ করে। বলে, "কী করে গিয়ে দেখলেই পার!"

আসলে যুধিষ্ঠির কাপড়ের টুকরো, সোডা-সাবান চায় ময়লা চিটি কাঠকুটো ধুয়ে সাফ করে নিতে। পরিষ্কার না হলে সে কেমন করে বুঝবে কোন দরজার কী অবস্থা, কোন জানলার পাল্লা চিড় ধরা! আসবাবপত্রের বেলাতেও তাই। সাফসুফ না করে কাজ করা যায়! রঙ কি এমনি এমনিই হয় পুরনো কাঠে। পুডিংও সে নিজের হাতে তৈরি করে নেয় খড়িমাটি আর তেল দিয়ে।

রোহিণীর সঙ্গে খানিকটা কথা কাটাকাটি হয়ে যায় গগনচন্দ্রের।

পরের দিন আবার। রোহিণী বলল, "তোমার যুধিষ্ঠির বিড়ি খায় দেখতাম, তাড়ি খায় জানতাম না।"

"তাড়ি!"

"ময়নাকে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাড়ি আনিয়েছে।"

"গগনচন্দ্র ঠিক যেন বুঝতে পারল না। গাঁয়ের লোক যুধিষ্ঠির, তাড়ি খেজুর রস খেতেই পারে। চাই কি ফটক বাজারের দিকে ভাটিখানাতেও যদি যায়—যেতে পারে। তবে ময়না-ঝিকে দিয়ে তাড়ি আনানোর কথাটা কি

সত্যি !'

এই ভাবে চলতে লাগল।

রোহিণীর ঘোরতর সন্দেহ, কাজের নাম করে যুধিষ্ঠির যে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ায় তার পিছনে কোনো অভিসন্ধি রয়েছে। বাড়ি পুরনো, ঘরদোর যথেষ্ট না হলেও শোওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে খুপচি ঘর পাঁচ ছ'টা। কত কী পড়ে থাকে সেখানে। এমনকি, গগনচন্দ্রের দোকানের খুচরো কিছু মালও মজুত থাকে।

ঝামেলাটা ভাল লাগছিল না গগনচন্দ্রের। মাঝে মাঝে সে যুধিষ্ঠিরকে ডেকে পাঠায়। ভাবে, তাকে কিছু বলবে। যুধিষ্ঠির সামনে এসে দাঁড়ালে কিছুই বলতে পারে না। অস্বস্তি হয়, লজ্জা করে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মানুষটাকে। সরল চোখে সে চেয়ে আছে, নিরীহ মুখ। গগনচন্দ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে যুধিষ্ঠির নিজেই কথা শুরু করে দেয়। নানান গল্প ফাঁদে।

দিনসাতেক এইভাবেই কাটল।

গগনচন্দ্র এবার হাঁটিতে পারছে। অবশ্য খোঁড়াতে হচ্ছে সামান্য। বিজয়হরি ডাক্তার টিপে টিপে পা দেখল। বলল, "ফোলা এখন থাকবে খানিকটা। গরম জল ঠাণ্ডা জল করো; চলে যাবে ফোলা। দু-দশ পা হাঁটো বাইরে গিয়ে। আর ক'দিন পরে দোকান যেতে পারবে। তবে বাপ, তোমার দু-চাকাটি এখন চড়বে না বেশ কিছুদিন।"

গগনচন্দ্র ভেবেছিল, দোকানে গিয়ে বসতে পারলে যুধিষ্ঠিরের একটা ব্যবস্থা করবে। বড় না হলেও 'দত্ত সন্স' দোকানটা ছোট নয়। বাবার আমলের দোকান। পুরনো। আগে ছিল ঢেউ খেলানো টিনের বাজার, তারপর এল অ্যাসবেসটাস শিট বা চাদরের বাজার, সেই সঙ্গে সরু মোটা পাইপ। এ ছাড়া টুকটাক কিছু। বাবা ধীরে ধীরে দোকানটা গুছিয়ে ফেলেছিল। তিন-চারজন কর্মচারী খাটে। গগনচন্দ্র অবশ্য নিজে দোকানে বেশিক্ষণ একনাগাড়ে বসে না। সে এ-কোলিয়ারি, সে-কোলিয়ারি, ছোটখাটো কারখানায় ঘুরে বেড়ায় মোটরবাইক করে, অর্ডার ধরে। আজকাল অ্যাসবেসটাস চাদরের চাহিদা ভাল।

তা দোকানে যেতে যেতে এখনও দিন দশ পনেরো।

যুধিষ্ঠির ততদিনে দরজা জানলার কাজকর্ম অনেকটাই সেরে ফেলেছে। ফেলে ভাঙাচোরা আসবাবপত্রে হাত দিয়েছে।

রোহিণী রোজই কথা ওঠায়। গগনচন্দ্র শোনে। স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি

হয়। তার পর তার মনে হয়, রোহিণীর চোখের সামনে থেকে যুধিষ্ঠিরকে সরিয়ে দিলে মুখ বন্ধ হয়ে যাবে ওর। দোকানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেবে যুধিষ্ঠিরকে, কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা করে দেবে মানুষটার। বউয়ের কথায় একটা নিরীহ্ নিরপরাধ মানুষকে সে তাড়াতে পারে না।

দিন কয়েক পরে রোহিণী অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে বলল, "এবার কী করবে ?"

"কিসের কী করব !"

"তোমার যুধিষ্ঠির দিদির ঘরে গিয়ে চুপ করে বসেছিল।"

গগনচন্দ্র যেন কানে শুনতে পায়নি। "কার ঘরে ? কী বললে ?"

"কানে শোনো না। বলছি, ওই যুধিষ্ঠির দিদির ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে ছিল।"

বিশ্বাস হল না গগনচন্দ্রের। "কবে ?"

"আজ বিকেলে।"

"দিদি দেখেছে ?"

"কী কথা ! দিদি দেখবে না তো কে দেখবে ? দিদির ঘর।"

"কে বলল, দিদি বলেছে ?"

"ডাকব দিদিকে ?" রোহিণী রাগে কাঁপছিল, তার কথায় এত অবিশ্বাস তার স্বামীর !

"থাক্", গগনচন্দ্রের কানমাথা যেন জ্বলে যাচ্ছিল। কমলাদির ঘরে বিকেলে ঢুকে কী করছিল যুধিষ্ঠির ? কী দরকার ছিল তার ও-ঘরে ঢোকার ! তুমি বাইরের লোক, ঘরের এক বিধবার ঘরে লুকিয়ে কেন ঢোকো তুমি !

রোহিণী বলল, "আরও আছে। শুনলে তোমার মাথায় রক্ত চড়বে কিনা জানি না, আমার তো মাথা আগুন হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে লোকটাকে জুতোপেটা করে তাড়িয়ে দি বাড়ি থেকে।"

তাকাল গগনচন্দ্র। "আবার কী ?"

"ময়না-ঝিকে পাঁচটা টাকা দিয়েছে।"

"টাকা ! কেন ?"

"সে তোমার যুধিষ্ঠির জানে।" বলে এক মুহূর্ত থেমে রোহিণী আবার বলল, "ময়নার রোজই টাকা দরকার। আজ পাঁচ টাকা দাও, কাল দশ টাকা দাও। একটা না একটা ছুতো। মাসের মাইনে আগে-আগেই নিয়ে নেয় সব। তার ওপরও রয়েছে পাঁচ দশ টাকা। আমার কাছে টাকা চেয়েছিল সকালে।

আমি দিইনি। গালমন্দ করেছি। শুনেছে তোমার যুধিষ্ঠির। ময়নামাগীও বলতে পারে। তা ওই যুধিষ্ঠিরের দয়ার প্রাণ কেঁদে উঠল। জোয়ান মাগী, কলসির মতন পেছন—, তায় আবার তাড়ি-মাড়ি এনে দেয় ; টাকা কেন দেবে না। ছিছি, আমার ঘরসংসার বাড়ি নষ্ট করে দিলে গো ! মান মর্যাদা আর রাখল না !"

গগনচন্দ্র চুপ। মুখ লালচে হয়ে উঠল। মাথা কান দপদপ করছিল। শেষে বলল, "আচ্ছা, দেখছি।"

"দেখাদেখির কী আছে ! তাড়াও ওকে। বদমাশ, হারামজাদা মিনসে। বাইরে গোবেচারি, ভেতরে ডুবে ডুবে জল খায়।"

সন্ধেবেলায় ডাক পড়ল যুধিষ্ঠিরের।

গগনচন্দ্র প্রথমে কিছু বলতে পারল না। লোকটাকে দেখল। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, "তোমার কাজকর্ম কতদূর ?"

যুধিষ্ঠির বলল, "বাকি ছিল খানিকটা। তা বাবু, আমি একটা কথা বলি ?"

"বলো !"

"আমি ক'দিন ঘুরে আসি। অন্য একটি কাজ আছে বাইরে।"

"কী কাজ ?"

কী কাজ তা বলল না যুধিষ্ঠির। হাসল একটু। ভাবটা এই, ছোটখাট কাজের কথা কী আর বলবে !

গগনচন্দ্রও যেন কোনো কৌতূহল বোধ করল না জানার। নিতান্তই বুঝি কথার কথা হিসেবে জানতে চেয়েছিল 'কী কাজ' করতে চলেছে যুধিষ্ঠির। মনে মনে সে স্বস্তি পাচ্ছিল ; নিজের মুখে তাকে বলতে হল না কিছুই যুধিষ্ঠিরকে, তাকে তাড়িয়ে দিতে হল না বাড়ি থেকে, নিজেই চলে যাচ্ছে যুধিষ্ঠির !

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল গগনচন্দ্র। যুধিষ্ঠির কি বুঝতে পেরেছে তার আচার ব্যবহারে গগনচন্দ্র অসন্তুষ্ট ? বিরক্ত ? বাড়ির মধ্যে যেসব অন্যায় যুধিষ্ঠির করছে—বাড়ির মালিকের কানে সেসব কথা উঠছে রোজই। এরপর আর এখানে ওর জায়গা হবে না ! বুঝেশুনেই তবে যুধিষ্ঠির কাজের ছুতো দেখিয়ে মানে মানে পালিয়ে যেতে চাইছে।

তা যাক ; ভালই হল। গগনচন্দ্রকে আর রূঢ় হতে হল না।

"আমি তবে যাই, বাবু ?"

"তা যাও !... কাল সকালে যাবে তো ?"

"আজ্ঞা না, এই সন্ধেকালেই যাব।"

"এখন কেন ? কাল সকালে যেও।"

"সন্ধেকালেই হাঁটিতে-চলতে ভাল লাগে। সামনে পূর্ণিমা। জোছনার আলো আছে। শীতও ফুরলো। দু-তিন ক্রোশ হাঁটা কিছুই নয়।"

গগনচন্দ্র বলল, "এসো তবে।"

যুধিষ্ঠির খুব বিনীতভাবে হাত জোড় করে গগনচন্দ্রকে নমস্কার জানাল। বলল, "ঘর থেকে আমার ঝোলাটি নিয়ে আমি চলে যাব।... ওই দেখো, একটি কথা বলতে ভুলে গেছি, বাবু। উই যে উত্তরের ঘরটি আছে আজ্ঞা কোঠার শেষে, উই ঘরটিতে ভাঙাচোরা জিনিস গুদাম করে রাখা। হাতড়ে-হুতড়ে আমি দেখেছি। একটি কথা বলি বাবু, উই ঘরে একটি পুরানো আরশি আছে। হাতখানেক লম্বা। ফুলকাটা কাঠ দিয়ে বাঁধানো। ওটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পারা উঠে গিয়েছিল অনেক জায়গায়। আমি ওই আরশিটি ঠিক করে দিয়েছি। বাবু উটি কিন্তু বড় ভাল আরশি। অমনটি আর পাবেন না। পুরানো হলেই কি জিনিস খারাপ হয়! পারলে উটি এনে ঘরে কোথাও রেখে দেবেন।"

গগনচন্দ্র শুনল, কিছু বলল না। সে কোনো খোঁজ রাখে না আয়নার। এই বাড়ির কোথায় কোন জঞ্জালে কী পড়ে আছে কে তার খোঁজ রাখে!

যুধিষ্ঠির মাথা নুইয়ে আবার বলল, "আসি বাবু!"

"এসো। তা এ-দিকে এলে এসে দেখা করে যেও।"

"আজ্ঞা," যুধিষ্ঠির ঘাড় নেড়ে জানাল আসবে। তারপর চলে গেল ঘর ছেড়ে।

গগনচন্দ্র চুপ করে বসে থাকল।

ঘরের বাইরে ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না ফুটে উঠছে। আজ পূর্ণিমা নয়, দিন দুই তিন বাকি। জানলা দিয়ে তাকালে মনসাতলার মাঠ চোখে পড়ে, মস্ত এক শিমুলগাছ, তার অন্য পাশে ঝিরিকাঁটার জঙ্গল। ফাল্গুনের বাতাস আসছিল। শীত নেই, আবার পুরোপুরি বসন্তও নয়। রাত বাড়লে মাঠের ওপর পাতলা কুয়াশা নামে।

ভাল লাগছিল না গগনচন্দ্রের। মানুষটা তবে চলেই গেল।

আরও খানিকটা পরে গগনচন্দ্রের নজরে পড়ল, যুধিষ্ঠির মাঠ ভেঙে চলে যাচ্ছে। ঝোলাটা তার কাঁধেই ঝুলছিল। ওর গায়ে এখন আলখাল্লার মতন

জামাটা নেই, সাধারণ শার্ট পাঞ্জাবি কিছু একটা পরে আছে। যেতে যেতে একবার দাঁড়াল যুধিষ্ঠির, পিছনে ফিরে তাকাল না, দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে লাগল।

রোহিণী ঘরে এল। সাঁঝ করে গা-ধুয়েছে। ভাল গন্ধ সাবান ছাড়া চলে না তার। দু'দিনে সাবান ফুরোয়। মাথার তেলেও সুগন্ধ। চোখমুখ সবসময় ঝকঝকে রাখে। নিজের শরীরের ব্যাপারে রোহিণীর নজরটি কম নয়।

সদ্য-ধোওয়া গা, ভিজে শাড়ির ওপর ডুরে-কাটা সবুজ গামছা জড়ানো, কপালের চুলের গুচ্ছ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কাছে এসে রোহিণী বলল, "আপদ বিদায় নিয়েছে?"

গগনচন্দ্র বলল না কিছু।

স্বামীকে চুপচাপ দেখে রোহিণী গায়ের কাছে এসে সামান্য নুয়ে পড়ে যেন সামান্য মজার গলায় বলল, "গন্ধটা ভাল না? নতুন আনিয়েছি। তোমার তো আবার নাক নেই। দেখো তবু...।"

রোহিণী আরও নুয়ে পড়ল। গা বুক হাত যেন গগনচন্দ্রের মুখের কাছে নামিয়ে ছুঁইয়ে দিল। দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

গন্ধ পাচ্ছিল গগনচন্দ্র, চোখেও দেখছিল।

"ভাল গন্ধ!"

"শুধুই গন্ধ! আর কিছু না?"

"তুমিও।"

রোহিণী যেন খুশি হয়ে ছেলেমানুষের মতন আলতো করে চুমু খেল গগনচন্দ্রকে।

পাঁচ

কোথাও কোথাও আগুন লাগলে যেমন দাউ দাউ করে সেটা ছড়িয়ে যায়, এবারের গরমটা যেন সেইভাবে গনগনে আকাশ থেকে ছুটে এল। চৈত্র মাস শেষ হবার আগেই মাঠঘাট পুড়তে লাগল, গাছপাতা শুকিয়ে ঝলসে খয়েরি হয়ে যাচ্ছিল। যত রোদের তাত-তেজ, ততই গা-জ্বালানো বাতাস।

গগনচন্দ্র একেবারে স্বাভাবিক। তার পায়ে ব্যথা-বেদনা নেই আর। মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র। কাজে অকাজে। একদিন শহরে গিয়ে বন্ধুদের জানিয়ে এল, শিগগির একদিন হাসপাতালের লেডি ডাক্তারের কাছে আসতে হবে রোহিণীকে নিয়ে।

বন্ধুরা গগনচন্দ্রের পিঠ চাপড়ে নাচতে নাচতে বলল, জয় গগন ! দারুণ শট্ দিয়েছিস তো এবার। দেখিস বাবা, সামলে।

গগনচন্দ্রের একটা চাপা দুঃখ আছে। বিয়ের পরের বছর রোহিণী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। বাবাও ঠিক তখন মারা গেল। কী হয়েছিল কে জানে—সদ্য অন্তঃসত্ত্বা রোহিণী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। যেটি এসেছিল সেটি নষ্ট হয়ে গেল। তারপর বছর দুই বাদে আবার এই। রোহিণীর হিসেবমতন মাস আড়াই হয়ে গেল।

মনে মনে একটু ভয় থাকলেও গগনচন্দ্র মোটামুটি খুশি। বাবার বড় সাধ ছিল নাতির মুখ দেখে যাবে। নাতি না হোক নাতনি। বাবার সে-সাধ মেটেনি।

প্রথমটির জন্যে গগনচন্দ্রের আফসোস সামান্য ছিল—তবে সে উতলা হয়নি। কীই বা তার বয়েস, আর রোহিণীরই বা কত বয়েস—যে দু'জনকে হাহুতাশ করতে হবে ! গাছের প্রথম ফল অনেক সময়েই থাকে না, পুষ্ট হবার আগেই পড়ে যায় মাটিতে। গগনচন্দ্রই তার মায়ের তৃতীয় সন্তান। আগের দুটি এসেছে গিয়েছে। এ-রকম হয়। ভগবানের খেলা, কী আর করা যাবে !

চমৎকার লাগছিল গগনচন্দ্রের। রোহিণীও যেন নতুন করে কিছু পেয়েছে তার শরীরে। মুখটি আরও আহ্লাদে ভরে গেছে। স্বামী যেন তার কাছে এখন 'রাত-বেলার' শশী। কথাটা রোহিণী নিজেই বলে স্বামীর সোহাগ গায়ে মনে মাখতে মাখতে, নিজেকেও মাখাতে মাখাতে।

গগনচন্দ্র বেজায় ফুর্তিতে আছে। মাঝে মাঝে আজকাল কমলাদিদিকে বলে, 'একটু নজর রেখো। বউ যা জল ঘাঁটাঘাঁটি করে—গরমের দিন—সর্দিগরমি না ধরিয়ে বসে। কলঘরটায় শ্যাওলা জমতে দেবে না।'

কমলাদিদি মাথা নাড়ে। হাসে মুখ টিপে। হাসিটা যেন কেমন ! সরল, না, চাপা বোঝা যায় না।

এই চৈত্র মাসেই বাড়িতে কাজ শুরু হয়েছিল। কলি ফেরানোর কাজ। বছর দুই অন্তর না হোক অন্তত তিন বছরের মাথায় চুনকামের কাজ হয় এ-বাড়িতে। পুরনো বাড়ি, সাদামাটা শোভা, তবু তার চেহারাটি মাঝে মাঝে ঘষে মেজে না দিলে কী হয় !

বাবার আমলেও নিয়ম ছিল, চৈত্র মাসে কলি ফেরানোর। বাড়ির কাজ শেষ করে মিস্ত্রি-মজুররা চলে যেত দোকানে। তো বাবা বেঁচে থাকতে, গগনের বিয়ের আগে, কর্তা নিজেই ঘরদোর মেরামতি রঙচঙ করিয়ে ছিল বাড়ির।

তারপর আর হয়নি। হব হব করেও আটকে যাচ্ছিল।

এবার রোহিণী গোঁ ধরল। ঘরদোরের দেওয়ালের চুন একেবারে হলুদ, বিবর্ণ হয়ে গেছে। বাড়ির বাইরের রঙও রোদে জলে ধুলোয় ময়লায় হতকুচ্ছিত। রোহিণী গোঁ না ধরলেও গগনচন্দ্র বাড়ি রঙয়ের কাজে হাত দিত। নতুন বছর পড়ার আগে রঙচঙ হয়ে গেলে ঘরবাড়ি দেখতেও সুন্দর লাগে।

ক'দিন ধরে কলি ফেরানোর কাজই চলছিল। তবে ধীরে সুস্থে। শুধু তো চুনকামের কাজ নয়, চুন করার আগে কিছু মেরামতিও থেকে যায় বালি সিমেন্টের। বাড়িটা এখন কেমন হতচ্ছাড়া চেহারা নিয়েছে, চুন বালি সিমেন্ট, বাঁশ, শনের পুঁটলি, বালতি এখানে-ওখানে, তারই সঙ্গে কত কী ডাঁই হয়ে পড়ে আছে ঘর-লাগায়ো ঢাকা বারান্দায়। এক একটা ঘরের জিনিসপত্র বার করে রাখা হচ্ছে বারান্দায়। টাল হয়ে পড়ে থাকছে। ঘর মেরামতি আর চুনকামের পর আবার সেসব জিনিসপত্র ঘরে ঢোকানো হচ্ছে। সারা বাড়িময় নতুন চুনের গন্ধ।

সেদিন দোকান থেকে খানিকটা তাড়াতাড়িই ফিরেছিল গগনচন্দ্র। কোনো কারণে নয়, এমনিই। ভেবেছিল সন্ধের পর বাড়িতে বসে বসে দোকানের হিসেবপত্র দেখবে। চৈত্র শেষ হয়ে এল। বৎসরান্তে একবার লাভক্ষতির হিসেবটা দেখতে হয় বইকি!

তখনও আলো মরেনি। চৈত্রের বেলা কি সহজে ফুরোয়!

বাড়িতে পা দিয়েই বড় মিস্ত্রি হরেনের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে পা বাড়াচ্ছে—নজরে পড়ল উত্তর দিকের এই বারান্দার শেষ ঘরের বাইরে—ঢাকা বারান্দায় রাজ্যের জঞ্জাল ডাঁই করা। মনে হয় যেন, ভেস্তুরের কোনো গুদোম থেকে কেউ টান মেরে সব বাইরে ফেলে দিয়েছে। ভাঙা খাটের বাজু, মশারির ছত্রি, ছেঁড়া নারকোল ছোবড়া, ভাঙা টুল, লোহার ছোট ছোট শিক, পাখির খাঁচা, তোবড়ানো বাক্স থেকে ফেঁসে যাওয়া ডুগি তবলা, ছেঁড়া চটি—কী নয়। আরও কত কিছু! গগনচন্দ্রের কেমন মজাই লাগছিল। এসব জিনিস জমিয়ে রেখে কী লাভ! কেনই বা জমানো আছে! সংসারী মানুষের এই হল স্বভাব। কোনো জিনিস ফেলতে প্রাণ ওঠে না। জমিয়ে রাখে। বাবার আবার এই দোষ খুবই ছিল। ভাঙা বালতিও ফেলতে দিত না। বলত, রেখে দাও—কখন কী কাজে লাগে।

চলেই আসছিল গগনচন্দ্র, হঠাৎ নজরে পড়ল, পা-ভাঙা পিঠ-ভাঙা একটা বেতের চেয়ারের ওপর ময়লা কাগজে মোড়া কী-একটা রয়েছে। কাগজ ছেঁড়া। একটা জায়গা চকচক করছিল। দু পা এগিয়ে পিঠ নুইয়ে জিনিসটা দেখল সে। আয়না নাকি ?

আয়না...আয়না। হঠাৎ গগনচন্দ্রের মনে হল, যাবার আগে যুধিষ্ঠির বলেছিল, উত্তরের এই জঞ্জাল-জমানো ঘরটিতে একটি আরশি আছে। পুরনো আয়না। কিন্তু ভাল আয়না। লতাপাতা-করা কাঠের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো। ওটির পারা উঠে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল অনেকটাই, যুধিষ্ঠির নতুন করে পারা লাগিয়ে আয়নাটি ঠিক করে দিয়েছে। 'আরশিটি বড় ভাল বাবু, পুরনো জিনিস, ফেলে রেখে নষ্ট করবেন না, ঘরে এনে রেখে দেবেন।'

এটি তবে সেই আরশি। যুধিষ্ঠির তো বেশ যত্ন করে কাগজ-মুড়ে রেখে গিয়েছে।

কী মনে করে হাত বাড়িয়ে আয়নাটি তুলে নিল গগনচন্দ্র, তারপর ঘরে চলে গেল।

ঘরে গিয়ে একপাশে রেখে দিল জিনিসটা। ওপর ওপর ধুলো পরিষ্কার করল কাগজের। পরে দেখা যাবে—জিনিসটি কেমন মূল্যবান।

জামাকাপড় আলনায় রেখে লুঙ্গি পরে গগনচন্দ্র স্নান করতে চলে গেল।

স্নান করতে করতে যুধিষ্ঠিরের কথাই ভাবছিল গগনচন্দ্র। মানুষটাকে আগে খুবই মনে পড়ত। মনে পড়লেই নিজের মন খুঁত খুঁত করত। যে যাই বলুক, তার মনে হত, যুধিষ্ঠির লোকটা ভাল ছিল। সরল মানুষ। তার কথাবার্তাও ছিল সরল। সাদাসিধে মানুষকে লোকে আজকাল ভুল ভাবে। গগনচন্দ্র বাস্তবিকই যুধিষ্ঠিরকে চোর, ছ্যাঁচড়া কি অসভ্য ধরনের মানুষ ভাবেনি। তার তো ভালই লাগত। এখন যদি বাড়ির লোক নিত্য কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে সে কী আর করতে পারে ! বাইরের একটা মানুষের জন্যে তো ঘরের স্বস্তি নষ্ট করা যায় না।

মনে মনে গগনচন্দ্রের খারাপ লাগত, দুঃখও হত যুধিষ্ঠিরের জন্যে। লোকটা একদিন তাকে বাঁচিয়ে ছিল। সেদিন যদি যুধিষ্ঠির ওই সময়ে কুল আর কাঁটাঝোপের কাছে গিয়ে হাত ধরে না টেনে তুলত তাকে—তবে তার পক্ষে উঠে দাঁড়ানো হয়ত সম্ভব হত না। পৌষের শীতে সারা রাত তাকে পড়ে থাকতে হত ঝোপের পাশে। নিউমোনিয়া হয়ে মরত গগনচন্দ্র। সত্যি বলতে

কি সেদিন ওই অবস্থায় যুধিষ্ঠিরকে না দেখলে তার নিজেরও সাহস ফিরে আসত না। এই জগতে এটা একটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার। সাহস পেলে ডুবন্ত মানুষও যেন বাঁচবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ে জলের ওপর ভাসতে চায়।

যুধিষ্ঠির বলেছিল, সে কী একটা কাজে যাচ্ছে, কাজ শেষ হয়ে গেলে—এদিক পানে এলে দেখা করবে। কিন্তু সে আর আসেনি।

গগনচন্দ্র নিজে মাঝে এর ওর কাছে খোঁজ নিয়েছে যুধিষ্ঠিরের। কেউ কিছু বলতে পারে না। শুধু বিষ্ণু বলে একজন বলেছিল, যুধিষ্ঠিরকে সে যেন দেখেছে। চাঁচুরিয়ার দিকে দিশি খ্রিশ্চানদের যে কবরখানা আছে, তার কাঠকুটো গাছপালার বেড়ার পাশে বসে কাজ করছিল বাগানের।

বিষ্ণুর কথা ঠিক হতে পারে, নাও পারে।

স্নান সেরে ঘরে ফিরল গগনচন্দ্র।

রোহিণী চা-জলখাবার নিয়ে বসে রয়েছে।

গা-মাথা ভাল করে মুছে চুল আঁচড়ে বসল গগনচন্দ্র।

রোহিণী জলখাবার চা এগিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার এই মিস্ত্রি মজুরের কাজ করে নাগাদ শেষ হবে?"

"হয়ে যাবে। আর বড় জোর হপ্তা খানেক। কেন?"

"দু চার দিনের জন্যে মাকে আনাতাম।"

"ও! উনি কি আসবেন? চৈত্র মাস!"

"থাকতে আসছে না। দু'চার দিনের জন্যে আসবে, চলে যাবে।"

"চৈত্র মাসের আর ক'দিন আছে জান?"

"দিন দশ বারো।"

"উনি আসতে পারলে আসতে বলো।"

"ঘর পরিষ্কার না হলে আসতে বলতে পারছি না। বাড়ি নরক হয়ে আছে।"

"তোমায় একবার শহরে নিয়ে যেতে হবে। হাসপাতালের লেডি ডাক্তারকে বলে রাখবে রসময়। তার সঙ্গে জানাশোনা আছে।"

"চৈত্র মাসে নয়। ক'টা দিন কাটুক, তারপর।"

কথাবার্তার মধ্যেই গগনচন্দ্রের জলখাবার চা খাওয়া শেষ হল। ও উঠে গেল টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে আসতে। রোহিণী থালা গ্লাস চায়ের কাপ প্লেট সরিয়ে ঘরের একপাশে রেখে দিচ্ছিল। যাবার সময় নিয়ে যাবে।

সিগারেট ধরিয়ে গগনচন্দ্র বিছানায় এসে বসল আরাম করে। সামান্য সময় শুয়ে থাকবে, আলস্য ভাঙবে, তারপর খাতাপত্র টেনে এনে বসবে।

হঠাৎ রোহিণী বলল, "ওটা কী ?"

তাকাল গগনচন্দ্র। রোহিণীর চোখে পড়েছে কাগজ-মোড়া আয়নাটা।

"আয়না।"

"আ-য়-না ! কিসের আয়না ? ওখানে কেন ? কে আনল ?"

"ওটা বাইরে জঞ্জালের মধ্যে পড়ে ছিল। মিস্ত্রিরা বার করে বাইরে রেখে দিয়েছে।"

"তুমি তুলে আনলে ?"

"পুরনো আয়না। বাড়িতে ছিল। যুধিষ্ঠির বলেছিল, খুব ভাল আয়না। পারা-টারা উঠে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ও ঠিক করে রেখে দিয়েছে। ঘরে এনে রাখতে বলেছিল।"

"ও, তোমার যুধিষ্ঠিরের আয়না।" বলতে বলতে দু চার পা এগিয়ে গেল রোহিণী। "দেখি কেমন আয়না ?"

গগনচন্দ্র বলল, "ধুলো ভরতি হয়ে আছে। পরিষ্কার করে নিতে হবে।"

রোহিণী এ-পাশ ও-পাশ তাকাল। আলনার র‍্যাকের তলায় একটা ফুল ঝেঁটা রয়েছে। মোছামুছির জন্যে খানিকটা ময়লা কাপড়ও পুঁটলির মতন করে রাখা।

কেমন এক কৌতূহলবশে রোহিণী ফুল ঝেঁটা আর ময়লা কাপড়ের টুকরো নিয়ে এল।

ধুলো-ময়লা রোহিণী বিশেষ পছন্দ করে না। খানিকটা আলগোছে আয়নার ওপরকার কাগজের ময়লা ঝাড়ল, তারপর কাগজটা ফেলে দিল সরিয়ে। বার কয়েক ঝেঁটা বুলিয়ে নিল আয়নাটায়। ময়লা কাপড় দিয়ে মুছে নেবে ওপরের কাচ।

গগনচন্দ্র আরাম করে সিগারেট টানছিল। গতকাল কালবৈশাখী উঠেছিল। বৃষ্টিও হয়েছে এক পশলা। ফলে আজ একটু ঠাণ্ডা ভাব আছে।

হঠাৎ বিশ্রী এক চিৎকার, যেন ভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে কেউ—, শুনে তাকাল গগনচন্দ্র। রোহিণী বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠেছে। বিশ্রী চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে আয়নাটা পড়ে গেল মাটিতে। কাচ ভাঙার শব্দ। পায়ের কাছে ভাঙা আয়না। ফ্রেমের কাঠ খুলে—জোড় খুলে ছিটকে গিয়েছে কিছু। কয়েকটা আয়নার টুকরো এপাশে ওপাশে ছড়ানো। রোহিণীর মুখ

অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। ভীষণ ভয় পাওয়ার মতন ; সেই সঙ্গে ঘেন্নায় যেন তার সারা মুখ বিকৃত। একেবারে ফ্যাকাশে মুখ, চোখ আতঙ্কে ভরা। কাঠের মতন দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ, তারপর যেন কাঁপতে লাগল।

কমলা বোধহয় কাছাকাছি কোথাও ছিল বাইরে, বা বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল কোথাও, রোহিণীর চিৎকারে ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল।

গগনচন্দ্র বিছানা থেকে নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি। "কী হয়েছে ?"

রোহিণী কথা বলতে পারছিল না।

গগনচন্দ্র কিছুই বুঝতে পারছিল না। আয়নার কাচের গায়ে কি মরা টিকটিকির বাচ্চা বা বিছে কি আরশোলা চিপটে ছিল ? রোহিণীর ভীষণ ভয় আর ঘেন্না এইসব পোকামাকড়ে।

কমলা বলল, "কী হয়েছে ?"

গগনচন্দ্র বলল, "ওই আয়নাটা দেখছিল। কী হল হঠাৎ..."

কমলা কোমর নুইয়ে তাড়াতাড়ি আয়নার টুকরো তুলে নিতে গেল। সাবধান হয়নি। হবার কথা মনে হয়নি। কেমন করে যেন তার হাত কেটে গেল কাচে। খারাপ ভাবেই কাটল। রক্তে তার হাত ভাসল। আয়নার টুকরোটাও লাল হয়ে গেল। কমলা যেন রক্ত ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না আয়নার কাচে।

ততক্ষণে গগনচন্দ্র রোহিণীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভূত দেখার মতন করেই দাঁড়িয়ে আছে রোহিণী। শুধু কাঁপছিল।

স্ত্রীর পায়ের দিকে তাকাল গগনচন্দ্র। রোহিণীর পায়ের কাছেই আয়নার বড় অংশটা পড়ে। ফেটে চৌচির। মাকড়শার জালের মতন দেখাচ্ছে চিড় ধরা, ফাটা অংশগুলো। আশেপাশে টুকরো কাচ ছিটিয়ে রয়েছে। মরা টিকটিকির বাচ্চা বা বিছে কী আরশোলা কিছুই দেখতে পেল না সে।

তা হলে ? তা হলে কী এমন হল যে রোহিণী ভয় পেয়ে হাত থেকে আয়নাটা ফেলে দিল ?

গগনচন্দ্র কিছুই বুঝতে না পেরে সাবধানে পিঠ নুইয়ে উবু হয়ে মাটিতে বসল। বসে ভাঙাফাটা চৌচির-হওয়া আয়নায় নিজের মুখ দেখার চেষ্টা করল। ভাঙা, আলগা, ফাটা, বিচ্ছিন্ন কাচের টুকরোগুলোর মধ্যে নিজের মুখটি ঠিকমতন দেখতে পেল না। হয়ত একটা চোখ, নাক কোথাও লম্বা হয়ে গেছে, কান নেই না আছে, গলা থুতনির তলা থেকে কাটা, গাল আধখানা আছে, বাকিটা কোথায় সরে গেছে কে জানে !

কমলার কাটা হাতের রক্তমাখা টুকরোটা মাটিতে পড়ে গেল।

তাকাল গগনচন্দ্র মুখ তুলে।

কমলার যেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। চোখে জল। শাড়ির আঁচল দিয়ে হাত বাঁধছিল। রোহিণীরও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ কেঁদে উঠল।

ছয়

গ্রীষ্ম কাটল, বর্ষা এল। বর্ষাও শেষ হয়ে সবে শরৎ দেখা দিয়েছে। আশ্বিনের শুরু। এক এক পশলা বৃষ্টি এখনও এলোমেলো ভাবে আসে আর যায়।

একদিন আচমকা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গগনচন্দ্রের।

তখন বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। দুপুরভোর বৃষ্টি হয়েছে। বিকেলে মেঘ কেটে আকাশ খানিকটা পরিষ্কার। মাঠেঘাটে জল, রাস্তায় কাদা। ডোবাগুলো ভরতি। পথের পাশের লতাপাতার ঝোপঝাড় ভিজে সপসপ করছে।

গগনচন্দ্র গিয়েছিল শ্রীপুর। কাজ সেরে তার মোটর সাইকেল নিয়ে ফিরছিল সাবধানে। হঠাৎ নজরে পড়ল, কে একজন আসছে মাঠ দিয়ে, গান গাইতে গাইতে।

প্রথমটায় না হলেও কয়েক মুহূর্ত পরে গগনচন্দ্র চিনতে পারল, যুধিষ্ঠির।

দাঁড়িয়ে গেল গগনচন্দ্র, মোটর সাইকেল পাশ করে রাখল।

যুধিষ্ঠির কাছে এল।

"যুধিষ্ঠির নাকি?"

কাছে এসে যুধিষ্ঠির দেখল গগনচন্দ্রকে। পিঠ কোমর ভেঙে নমস্কার জানাল হাত জোড় করে। "নমস্কার বাবু।"

"কেমন আছ? এদিকে কোথায়?"

"রামনগর গিয়েছিলাম। ফিরছি।"

"আছ কেমন?"

"তা আছি বাবু! দিন কেটে যাচ্ছে। তাঁর দয়ায় আছি।"

গগনচন্দ্র সামান্য নজর করে দেখল যুধিষ্ঠিরকে। গায়ের আলখাল্লাটা নেই। বাকি সব সেই রকম। গায়ে জামা, পরনে ময়লা ধুতি। কোমরের কাছে কোচার অংশটি জড়ানো। পায়ে ছেঁড়াফাটা চটি। হাতে ছাতা। ঝুলিটি পিঠে ঝোলানো।

"বাড়ির সব ভাল বাবু? ওনারা ভাল আছেন?"

গগনচন্দ্র একটা সিগারেট ধরাল। দুটো কথা বলতে চায় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। "সিগারেট খাবে একটা ? নাও... !"

যুধিষ্ঠির যেন কুণ্ঠার সঙ্গে সিগারেট নিল। ধরিয়েও নিল গগনের হাত থেকে দেশলাই নিয়ে।

"তুমি যাবে কোথায় ?"

"আজ্ঞা ঘুঘুলিয়া যাব। মণ্ডলবাবা খোঁজ করছিলেন। কাজ আছে বাবার।"

"তোমার পথটি অন্য দিকে হয়ে গেল, নয়ত আমার পেছনে বসে যেতে খানিকটা।"

"আমি চলে যাব। এক ক্রোশও পথ নয়। সাঁঝের আগেই পৌঁছে যাব।"

"তা যাবে।" গগনচন্দ্র একবার আকাশের দিকে তাকাল। টুকরো টুকরো হালকা মেঘ ভাসছে। বৃষ্টি আর বোধহয় আসবে না। বেলা পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর খানিকটা যেন ইতস্তত করে গগনচন্দ্র বলল, "সেই আয়নাটির কথা তোমার মনে আছে ?"

দু'পলক গগনচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠির বলল, "সেই আরশিটি ? আজ্ঞা হাঁ, মনে আছে বইকি !"

"ওটি কেমন আয়না গো ?"

"কেন বাবু ?"

"তোমার কথায় ঘরে এনে যেদিন রাখতে গেলাম, তোমার বউদিদিমণি আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেল ! সে-ভয় তুমি বুঝবে না। দু একদিনেও ভয় ভাঙল না। শরীর খারাপ হল। ডাক্তার-বদ্যি। শেষে....। তা শুধু বউদিদিমণির একার নয়, কমলাদিদিরও হাত কাটল, সে কী রক্ত ! কাটা হাত পাকল, পুঁজ হল। ভুগল মাস খানেক।"

"আহা... !"

"আমার পায়েও কাচের টুকরো ফুটে গিয়েছিল। ভোগান্তি আমারই কম হয়েছে।"

যুধিষ্ঠির চুপ করে থাকল। তার যেন কষ্টই হচ্ছিল কথাগুলো শুনতে শুনতে।

শেষে গগনচন্দ্র বলল, "তুমি বলেছিলে আয়নাটি পুরনো হলেও ভাল। তা ভাল কই দেখলাম না। ওটি মন্দই করল হে !"

যুধিষ্ঠির অল্পসময় চুপচাপ থাকল। তারপর বলল, "বাবু, সত্য কথাটা কী

জানেন ? একটা তবে গল্প বলি। কাকেদের স্বভাব আপনি জানেন। দশ বিশটা কাক একত্র হলে কান পাতা যায় না। তা বাবু, একদিন বিশ পঁচিশটি কাক এক নদীর তীরে বসে কা-কা করছিল। এই ওড়ে তো ওই বসে, আবার ওড়ে। এমন সময় একটি হাঁস এসে বসল কাছে। অনেক দূর থেকে উড়ে উড়ে আসছে। আজ্ঞা ধরুন, মানসসরোবর থেকে। হাঁসটিকে দেখে কাকের দল ঠাট্টা তামাশা করতে লাগল। তাকে জ্বালাতে লাগল। হাঁসটি ভাবল এখানে বসে দরকার নেই, অন্য কোথাও চলে যাই। তা হাঁসটি আবার উড়তে শুরু করলে—একটি কাক বলল, তুমি তো ওড়াই জান না বাপু ! একই ভাবে আকাশে ওড়ো। আমরা একশো রকম ওড়া জানি।" বলতে বলতে থামল যুধিষ্ঠির।

গগনচন্দ্রের মজা লাগছিল। কোথায় আয়না, আর কোথায় কাকের গল্প ! তবে যুধিষ্ঠির গল্পগুলো বলে ভাল। গগনচন্দ্র আগেও কত গল্প শুনেছে তার মুখে।

যুধিষ্ঠির বলতে লাগল, "হাঁসটিকে আর উড়তে দেয় না কাকটি। সারাক্ষণ এটি বলে সেটি বলে। তাকে গালমন্দ করে, আর নিজের ওড়ার গর্ব করে। শেষ পর্যন্ত কাক বলল, চলো তোমার সঙ্গে পাললা দিয়ে আমিও উড়ি। দেখবে কত রকম ভাবে উড়তে জানি আমরা। এই বলে কাক নানান কায়দা করে উড়তে উড়তে চলল। নদী শেষ হয়ে সাগর। কাকটি ততক্ষণে থকে গেছে। তা ছাড়া সাগর সে দেখেনি। জল আর জল। ভয় পেয়ে গেল কাক, থকেও গিয়েছিল। আর উড়তে পারল না। ঝপ করে সাগরের জলে গিয়ে পড়ল। পড়ে আর উঠতে পারে না, জলে চোবানি খেতে লাগল। হাঁসটি তখন পিছু পিছু ফিরে এসে বলল, ও ভাই কাক—এটি তোমার কী ধরনের ওড়া, জলের ওপর পাখা ঝাপটাচ্ছ। কাকটি তখন মরছে যে, কত আর পাখা ঝাপটাবে জলে। কাক বলল, ভাই—আমি মরছি, আমায় তুমি বাঁচাও। আমাকে আমার জায়গায় পৌঁছে দাও। ... হাঁসটি তখন তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে কাকটিকে তুলে নিয়ে নিজের পিঠের ওপর বসাল। তারপর একই ভাবে উড়তে উড়তে ফিরে এসে কাকটিকে তার দলবলের কাছে নামিয়ে দিল।"

গগনচন্দ্র বলল, "তা না হয় হল। কিন্তু হাঁসটির সঙ্গে আয়নার সম্বন্ধটি কোথায় ?"

যুধিষ্ঠির বলল, "সম্বন্ধটি একটু আছে, বাবু। মানুষের মধ্যে অনেকের ওই দোষটি থাকে। তারা দম্ভ করে, অকথা কুকথা বলে, অন্যকে বিনি-দোষে

ঠোকরায়। কেউ নিজেরটিকেই বড় বলে ভাবে, কেউ অন্যকে ছোট করে আনন্দ পায়। তাই না ?... এ হল মানুষের মুখ্যুমি। আকাশের হাঁসটি তো অন্যরকম, বাবু। তিনি তো কাক নন। তাঁর ওড়ার কি বিরাম আছে !"

গগনচন্দ্র একটু ঘাড় নাড়ল। কী বুঝল কে জানে !

"আমি তো কমলাদিদিমণির হার চুরি করিনি। তিনি কলঘরে হারটি হারিয়েছিলেন। আংটা ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিল। জলের সঙ্গে নালা দিয়ে বাইরে এসে ময়লায় আটকে গিয়েছিল।"

গগনচন্দ্র জানত না, রোহিণী বলেনি যে, কমলাদিদির হারের আংটা পলকা ছিল। "তুমি ময়নাকে টাকা দিয়েছিলে ?"

"আজ্ঞা হাঁ, দিয়েছি বাবু ! ময়নার মেয়েকে কুকুরে কামড়েছিল। ও ডাক্তারবাবুর কাছে যাবে। কেঁদেকেটে ক'টি টাকা চাইছিল বউদিমণির কাছে। বউদিমণি দিলেন না। আমি দিলাম। ...কাউকে না কাউকে তো দিতেই হয়। না দিলে সংসারে বাঁচা কেন !"

কুকুরে কামড়ানোর কথাও গগনচন্দ্র জানত না। তার খারাপ লাগল।

"যুধিষ্ঠির !... একটা কথা। তুমি নাকি কমলাদিদির ঘরে একলা একলা যেতে ? কেন যেতে ? কী ছিল সেখানে ?"

যুধিষ্ঠির একটু হাসল। বলল, "বাবু, ওই ঘরটি থেকে একটি গন্ধ পেতাম। গন্ধটি কেমন তা বোঝাতে পারব না। পোড়া গন্ধের মতন। আমি ঘরে গিয়েছিলাম গন্ধটির খোঁজ নিতে। দেখতে। গিয়ে দেখি ঘরের কোথাও কিছু নেই, তবু গন্ধটি আছে। ....কমলাদিদির কোন্ জিনিসটি পুড়ছিল—আপনি জানেন না, বাবু ?"

গগনচন্দ্র চমকে উঠল। মুখটি নামিয়ে নিল নিজের।

যুধিষ্ঠির নিজেই বলল, "তবে বাবু একটি কথা স্পষ্ট বলি, আপনি দোষ ধরবেন না। মানুষ বড় বোকা। এই যে আমাদের অঙ্গগুলি—এই হাতটি পা-দুটি পিঠটি মুখটি আমি সাবান মেখে বার বার পরিষ্কার করতে পারি। ভাল সাবানের সুবাসটিও ছড়াতে পারি অঙ্গ থেকে। কিন্তু ওটির বেলা কী হবে ?" বলে সে গগনচন্দ্রের দিকে তাকাল।

"কোনটি ?"

যুধিষ্ঠির নিজের বুক দেখাল। বলল, "এর তলায় যেটি আছে। প্রাণটি হৃদয়টি তো সাবান মাখিয়ে পরিষ্কার করা যায় না, বাবু। বাজারের তেলসাবান আতর মাখিয়ে কি তাতে গন্ধ ছোটানো যায় !... প্রভু তাই বলেছেন, নিজের

হৃদয়টি পরিচ্ছন্ন করো, অন্যগুলি তুমি তোমার হাত দিয়ে জল ঢেলে ধুতে পার, হৃদয়টি পারো না। সেটি তোমায় ভালবাসা মায়ামমতা দিয়ে ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। হৃদয় যদি নির্মল না হয়—একটি শিশুকেও তুমি চুম্বন করতে পার না।”

গগনচন্দ্র স্তম্ভিত। যুধিষ্ঠির এত কথা জানে? কে তাকে শেখাল? গেঁয়ো, গরিব, মূর্খ একটা মানুষ, ধুলোকাদায় যার পা-হাত মাখামাখি, পরনে যার ছেঁড়া ধুতি জামা—সে এত কথা শিখলো কেমন করে? কে তাকে শেখাল?

যুধিষ্ঠির বলল, “আপনি আরশিটির কথা বলছিলেন। ওটি তো পুরনো বাবু। আপনার বাপ পিতামহ, তাঁর পিতামহও জানতেন, এই সংসারে একটি আরশি আছে। নিজের মুখটি সেই আরশিতেই দেখতে হয় মাঝে মাঝে। দেখলে বোঝা যায়, কার মুখটি কেমন! ওটি তো আপনার অন্তরে আছে! নাই, বলুন!... আর ওই হাঁসটি, তিনি তো নিত্যকাল আকাশে উড়ে বেড়ান।... তা যাক বাবু আমি মুখ্য মানুষ। কত ভুল বললাম।”

গগনচন্দ্র কিছু বলল না।

এবার যুধিষ্ঠির যাবার জন্যে পা বাড়াল। “আসি বাবু, নমস্কার।”

আঁধার ঘনিয়ে আসছিল। আকাশে সন্ধ্যাতারাটি সবে ফুটল। বাতাস দিচ্ছিল শরতের।

গগনচন্দ্রের মনে হল, যুধিষ্ঠির যেন নিজেই সেই গল্পের হাঁস, এসেছিল হঠাৎ, তাদের বড় জব্দ করে চলে গেল। না, জব্দ করে নয়, বোধ হয় ডুবন্ত কাকের মতন তাকেও পিঠে করে তুলে এনে আবার বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা

নদী এখানে তেমন চওড়া নয়। তবে বাঁক খেয়েছে। বাঁকের ওপারে চারপাশের জমি নিচু, নদীর স্রোত সেখানে ছড়িয়ে গিয়েছে চর ডুবিয়ে।

এখন ভরা বর্ষা নয়। আষাঢ়ের মাঝামাঝি। প্রথম বর্ষার জল নামতে না নামতেই বরাকর নদী এমন জলভরা বড় একটা হয় না। এবার হয়েছে। গোড়ার বৃষ্টি দিন কয়েক ভালই হয়েছিল। এখন আবার শুকনো দিন। মেঘ হয়, বৃষ্টি হয় না, হলেও এক-আধ পশলা নরম বৃষ্টি।

আশেপাশে অর্জুন আর শিরীষ গাছ, একটা দুটো কলকে ফুলের ঝোপ। বেশ জঙ্গলমতন হয়ে গিয়েছে তিনতিড়ি কাঁটাগাছে।

নদীর পাড়ে পাথরের ওপর নন্দকিশোর বসে ছিল। বসে বসে নদী দেখছিল ; নদী, আকাশ, ওপারের ঝোপ-জঙ্গল।

সামান্য আগে গোধূলিবেলা নেমেছিল। দেখতে দেখতে গোধূলি মরল। আকাশ কালো হয়ে আসার আগেই চাঁদ উঠেছে। আজ পূর্ণিমা। কত পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসছিল, নদীর ওপার থেকে এপার, উড়ে এসে কোথায় গিয়ে বসছিল কে জানে। এপার থেকেও উড়ে যাচ্ছিল ওপারে। কিছু বক উড়ে গেল।

আকাশ আজ পরিষ্কার। কাছাকাছি কোথাও মেঘ নেই। বাতাসও রয়েছে। এলোমেলো, ঠাণ্ডা।

নন্দকিশোর সামান্য ইতস্তত করে অন্যমনস্কভাবেই একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেট খাওয়া তার বারণ। তবু এক-আধটা কখনো কখনো ধরিয়ে ফেলে, তিরিশ বছরের নেশা, ছাড়া সহজ নয় ; ছাড়তে গিয়েও যেন একটু মায়া লেগে থাকে।

সংসারটা অদ্ভুত। নন্দকিশোরকে এই সেদিন পর্যন্ত কেউ বড় একটা কিছু

ছাড়ার কথা বলত না। এটা ছাড়ো, ওটা ছাড়ো শোনা যেত না কারোর মুখেই। স্ত্রী মণিমালা শুধু বলত, বড় বেশি নেশা করছ আজকাল, অত খেয়ো না। সেটা ছিল মদের নেশা। স্ত্রীলোক বলে মণিমালা বুঝতে পারত না, নন্দকিশোর মদ বেশি খায় না। মাঝে মাঝে হয়ত পরপর দু-তিন দিন হয়ে যায়—এইমাত্র। সেটাও স্বেচ্ছায় নয়, দায়ে পড়ে। মেয়েরা মদের মাত্রা আর মদের গন্ধের তফাত বোঝে না।

নন্দকিশোরের নিজস্ব ডাক্তার হল তারই ছেলেবেলার বন্ধু পবিত্র। বাচ্চা বয়েস থেকে ধাত জানে নন্দকিশোরের। সেই পবিত্রও আগে কোনোদিন বলেনি, তুই এটা ছাড়, ওটা ছাড়। বরং বলত, 'তুই যে-ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিস চালিয়ে যা ; ঘোড়া যতক্ষণ ছোটে সে ঠিক আছে। শুলেই মরবে। খা-দা কাজকর্ম কর, ফুর্তি কর—জীবনটা যেমন করে কাটাচ্ছিস—এইভাবেই কাটিয়ে যা নন্দ। চমৎকার আছিস তুই। বয়েস তোকে ধরতে পারছে না। কী তোর এনার্জি ! খাটতেও পারিস বাবা ! তোকে হিংসে হয়।' সেই পবিত্র শালা এখন, অসুখের পর থেকে নিত্যিদিন খিচখিচ করে যাচ্ছে, এটা খাবি না, ওটা করবি না, রাত জাগবি না, মাথা গরম করবি না। পবিত্রকে দেখলেই নন্দকিশোর এখন বলে, "এই যে ডাক্তার নো, আয়। আবার কটা না পকেটে করে এনেছিস তোর বউঠানের হাতে গুঁজে দিয়ে যা।" পবিত্র মণিমালাকে রগড় করে বউঠান বলে, আবার নাম ধরেও ডাকে।

অসুখের পর থেকে বন্ধুরাও নন্দকিশোরকে যে যা পারছে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। এটা করো, ওটা করো। "তুমি কদিন কচি বেলপাতা সেদ্ধ করে জলটা খাও তো ;" "আমার বড় শালা একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেত নন্দ, এই যে লিখিয়ে এনেছি, ট্রাই করে দেখো" ; "নন্দদা, আমার অ্যাডভাইস হল যোগব্যায়াম। সিস্টেমটাকে টিউন্ করে দেয়।" যার যেমন ইচ্ছে বলে যাচ্ছে।

মণিমালার দু ভাই এখনও আসা-যাওয়া করে দিদির কাছে। তারাও কত রকম উপদেশ দিয়ে যায়। জামাইবাবু, একটা নীলাটিলা পরুন না ! কলকাতার ঘোষালমশাই বলছিলেন, "শনি বছর খানেক ট্রাবল দেবে এখন—তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এমনকি নন্দকিশোরের বড় মেয়ে। গত বছর যার বিয়ে হয়েছে, সে আর জামাই এল ছুটতে ছুটতে রাঁচি থেকে। বড় মেয়ে বলল, "বাবা, তুমি আমাদের কাছে চলো মাসখানেকের জন্যে। কুমারজি বলে একজন আছেন, গাছগাছড়ার

চিকিৎসা করেন। ধন্বন্তরি। অনেক বয়েস। সন্ন্যাসীর মতন মানুষ। তোমার কথা বলে এসেছি।”

ছেলে নিজে কিছু বলে না, মায়ের ওপর হাঁকডাক করে। “তুমি বাবাকে কড়া হাতে রাখতে পার না? বাবা যখন যা বলবে, খেতে চাইবে—মরজিমতন চলতে চাইবে—হতে দেবে না। বাবাকে সাবধানে না রাখলে বিপদ হবে।”

নন্দকিশোরকে এখন সবাই সাবধানে রাখার দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখার চেষ্টা করছে করুক! কিন্তু নন্দকিশোর নন্দকিশোরই।

পাখিরা আর নেই। আকাশজুড়ে জ্যোৎস্না ফুটে উঠছে। বাতাসে গাছপালার পাতা কাঁপার শব্দ হচ্ছিল। নদীর জলের শব্দ অতি মৃদু।

নন্দকিশোর সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। অর্ধেকও খায়নি। এই রকমই খায় দিনে দু-চারটে।

ঘড়িটা একবার দেখল। এখন তার ওষুধ খাবার কথা। পর পর দুটো। মিনিট দশ পনেরো অন্তর। ওষুধের সঙ্গে হরলিকস্। আগে পরেও খাওয়া যায় হরলিকস্। নন্দকিশোরের পাশেই ছোট বেতের বাস্কেটে সব গোছানো আছে। দুটো ফ্লাস্ক, জল আর হরলিকসের। গ্লাস আছে কাচের। মুখ-হাত মোছার জন্যে তোয়ালে। টর্চ। একটা ছাতাও রাখা আছে পাশে। মণিমালার চোখ আছে সব দিকে ; বৃষ্টি এখন নেই তো না থাক, বর্ষাকাল বলে কথা, হঠাৎ যদি বৃষ্টি আসে। তখন?

ড্রাইভার নাগেশ্বর সব কিছু এনে গুছিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে জিপ গাড়ির কাছে। গাড়িটা রয়েছে সামান্য তফাতে। কাঁচা রাস্তায়। এখান থেকে দেখা যায় না, গাছে ঝোপেঝাড়ে আড়াল পড়ে গিয়েছে।

নাগেশ্বর অবশ্য জিপ গাড়ির কাছে নেই। সে নিশ্চয় তার মায়ের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। মণিমালা এসেছে লাটুবাবার মন্দিরে পুজো দিতে। সঙ্গে কমলা। মণির সব কাজেই কমলা। বারো বছরের বেশি হয়ে গেল কমলার মণিমালার কাছে। সে তো এখন বাড়িরই লোক।

পকেট থেকে একটা ওষুধ বার করে অন্যমনস্কভাবে খেয়ে নিল নন্দকিশোর। জল খেল এক ঢোক।

আজ পূর্ণিমা। দিনটার যোগাযোগও নাকি ভাল। মণিমালা এসেছে পুজো দিতে। হয়ত তার মানত ছিল, বা ইচ্ছে ছিল—স্বামীর অসুখ সেরে গেলে সে এই মন্দিরে পুজো দিতে আসবে।

পুজো দিতে আসবে ঠিকই—তা ছাড়াও কিছু কথা আছে লাটুবাবার সঙ্গে।

লাটুবাবা বা পূজারিজি এখানে নদীর পাড়ে যে-মন্দিরটি গড়ে নিয়েছেন, সেই সঙ্গে নিজের সামান্য আস্তানা—তার কোনো ছিরিছাঁদ নেই। কিছু ইট গেঁথে একটা মন্দির মতন, আর খোলার চাল দেওয়া আস্তানা লাটুবাবার। মানুষটি এখানে এসে বসেছেন বছর পাঁচেকের বেশি। কোথ্ থেকে এসেছেন কেউ জানে না, লাটুবাবাও বলেন না। নদীর পাড়ের এই জমি সরকারি, ঝোপ জঙ্গল গাছ সবই সরকারের। এখানে এসে এই যে লাটুবাবা সামান্য জমি নিয়ে বসে গেলেন—তাতে মনে হয়েছিল, কোনো সময়ে তাঁকে না উঠিয়ে দেয় পেয়াদা এসে। ওঠায়নি। কেন না, সামান্য ব্যাপারে কেউ নজর দেয়নি। তা ছাড়া লাটুবাবা মানুষটি অন্যরকম। ভেকধারী নয়। নিজের মনে থাকেন, নিজের আনন্দে পুজোপাঠ করেন। এই জায়গাটিতে আর নদীর আশেপাশেই ঘুরে বেড়ান। শহরের দিকে তাঁকে কদাচিৎ দেখা যায়। ভিক্ষা নেন না, অনুগ্রহ চান না। লোকে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই দেখে লাটুবাবাকে।

মণিমালা আজ মন্দিরে পুজো দেবে বলে এসেছে এখানে। তা ছাড়া সে লাটুবাবার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবে। মণিমালার ইচ্ছে, মন্দিরটি সে ভাল করে তৈরি করিয়ে দেয়—আর সেই সঙ্গে লাটুবাবার আস্তানাটিও পাকাপোক্ত করে দেয়। স্বামীর অসুখের সময় সে নাকি একদিন এই মন্দিরের স্বপ্ন দেখেছিল। তখন থেকেই তার ইচ্ছে, স্বামী সুস্থ হয়ে উঠলে—মন্দিরের কাজকর্মটি সে করিয়ে দেবে।

লাটুবাবা যেমন মানুষ তাতে হয়ত রাজি না হতে পারেন।

মণিমালা তখন বলবে, আমি তো বড় করে কিছু করছি না বাবা, মার্বেল বসাচ্ছি না, চুড়ো করছি না, শুধু মন্দিরটা সারিয়ে-সুরিয়ে ঠিক করে দিচ্ছি। এই মন্দির আজ আপনার, পরেও তো মন্দির থাকবে, একটু মজবুত করে না গড়ে দিলে ভেঙে পড়ে যাবে যে। এ আমার ইচ্ছে শুধু নয় বাবা, আমি মনস্কামনা জানিয়ে দিলাম। আপনি আপত্তি করবেন না।

মণিমালা তার বলার কথা গুছিয়ে নিয়ে এসেছে। নন্দকিশোরকে বলেছিল, "তুমিও চলো না, গুছিয়ে বলবে। তুমি পুরুষমানুষ, গুছিয়ে কথা বলতে পার। আমি মেয়েমানুষ, আমি কি ছাই পারব!"

নন্দকিশোর বলল, "আমার দ্বারা হবে না। ওসব তোমরা পার। তুমিই বলো। আমি তো তোমার পেছনে থাকলাম। দশ পনেরো হাজারে আমার কিছু যাবে আসবে না। কথাবার্তা তুমি বলতে পারবে।"

"বেশ !"

"তবে যেদিন যাবে আমায় একটু নিয়ে যেও। নদীর পাড়ে গিয়ে বসে থাকব, আকাশ বাতাসের মাঝখানে। হাওয়া খেয়ে ফিরব। অনেক দিন ওপাশে যাওয়া হয়নি।"

নন্দকিশোর এসেছে নিভৃতে নির্জনে একা কিছুক্ষণ বসে থাকতে। আর মণিমালা এসেছে, মন্দিরে পুজো দিতে, লাটুবাবার সঙ্গে কথা বলতে।

নন্দকিশোর এবার হরলিকসের ফ্লাস্ক আর কাচের গ্লাস বার করে নিয়ে কিছু মনে পড়ায় দ্বিতীয় ওষুধটা খিয়ে নিল অন্যমনস্কভাবেই।

ততক্ষণে সন্ধে নেমে আসছে। জ্যোৎস্নাধারা ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

গ্লাসে হরলিকস ঢেলে ধীর ধীরে খেতে লাগল নন্দকিশোর। আ—অনেকদিন এইভাবে নদীর চরে বসে জ্যোৎস্না দেখা হয়নি, দেখা হয়নি জলের স্রোতের সঙ্গে কেমন করে গড়িয়ে চলেছে চাঁদের আলো, কখন যেন ঘুমের ঘোমটা পরা একটি আবছা ছবি ফুটে উঠল নদীর ওপারে, কখন বাতাস এমন স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

নন্দকিশোর যেন অনমনস্ক হতে হতে গভীর কোনো অর্ধ-চেতনার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। তন্দ্রার মতন ঘোর নামছিল চোখে।

দুই

কোনো শব্দ নয়, তবু নন্দকিশোর যেন বুঝতে পারল, কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"কে ?"

কোনো সাড়া নেই।

ঘাড় ঘোরাল নন্দকিশোর। "কে ?"

"আমি।"

"কে আমি ?"

"দেখেছ, চিনতে পারছ না হয়ত।"

নন্দকিশোর ভাল করে দেখল। সত্যিই চিনতে পারছে না। মাথা নাড়ল, "মনে করতে পারছি না।"

"হঠাৎ দেখলে, চিনে উঠতে পারছ না। পারবে।"

নন্দকিশোর অবাক হয়ে যাচ্ছিল। তুমি তুমি বলে কথা বলছে লোকটা।

কেন ? নন্দকিশোরের কোনো পুরনো চেনা লোক, নাকি বন্ধু ? যদিও একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, তবু অর্জুন গাছের ছায়া পড়েছে তার গায়ে। "তোমায় কি এখানে কোথাও দেখেছি ? মানে এই আমাদের শহরে ?"

"তা দেখেছ! এখানেও দেখেছ। এই নদীর ধারে।"

"কবে ?"

"বারকয়েকই দেখেছ। তোমার বাবা যখন মারা গেল, তারপর মা। আরও দেখেছ। চুয়া যখন মারা গেল!"

নন্দকিশোর হরলিকসের গ্লাসটা কোলের ওপর রাখল। অবাক কথা তো! লোকটা বলছে, এই নদীর ধারেই তাকে দেখেছে নন্দকিশোর, বাবা মারা যাবার পর, মা মারা যাবার সময়, আবার এমনকি চুয়া মারা যাবার সময়।

লোকটা নিজের থেকেই বলল, "ওই যে বটগাছটা—ওদিকে, ওর কাছে তোমার বাবাকে সৎকার করা হয়েছিল। তখন নদীর এ-দিকটা ভাঙেনি। উঁচু পাড় ছিল।"

নন্দকিশোর বটগাছটার দিকে তাকাল। বেশ খানিকটা তফাতে গাছটা। বাবাকে ওখানেই পোড়ানো হয়েছিল। সে অন্তত ষোলো সতের বছর আগেকার কথা। বেশ অবাকই হচ্ছিল নন্দকিশোর। লোকটা এত কথা জানল কেমন করে ? সে কি শ্মশানসঙ্গী হয়ে এসেছিল ? বাবাকে দাহ করার সময় লোক বেশি হয়নি। জনা বিশেক। মানিকজেঠা, ভুলুকাকা, সেনকাকা, বিজনদা, দয়ারামদা—এরা ছিল। এদের মধ্যে এই লোকটা ছিল নাকি ? আশ্চর্য! এত পুরনো লোক, এখানকার মানুষ, তবু তাকে চিনতে পারছে না নন্দকিশোর।

"তোমার বাবার কাজ শুরু হতে হতে বিকেল হয়ে গেল।"

মনে মনে মাথা নাড়ল নন্দকিশোর। তখন প্রচণ্ড গরম, চৈত্র মাস, পুড়ে যাচ্ছে চারদিক ; দুপুরে দাহ কাজ শুরু করা গেল না। বিকেলেই চিতা জ্বালানো হল।

নন্দকিশোর বলতে যাচ্ছিল, তোমার নাম কী, কোথায় থাক, কোন পাড়ায়—তার আগেই লোকটা অন্য কথা বলল।

"তোমার মায়ের বেলায় কোনো অসুবিধা হয়নি। উনি শীতকালে গেলেন। মাঘ মাসে। ওঁকেও তোমার বাবার কাছাকাছি জায়গায় সৎকার করা হল। একটু বেলায়।"

নন্দকিশোর বলল, "তুমি এত কথা জানলে কেমন করে ?"

"জানি।"

"তুমি কি আমাদের সঙ্গে এসেছিলে ? কী নাম তোমার ?"

"নাম একটা আছে। তা নাম জেনে কী করবে ! বললাম তো, আমি তোমাদের পাশাপাশি আছি। আমাকে তুমি দেখেছ। অনেকবার। যাদের কথা বললাম—তারা তোমার নিজের বলে শুধু ওদের কথা বললাম।"

"তুমি তো বেশ হেঁয়ালি শুরু করলে হে !"

"চুয়ার কথা বলব ?"

"চুয়া ! না থাক্—!"

"একেবারেই শুনবে না। একটু না হয় শোনো। চয়িার মারা যাবার সঙ্গে তোমার আর কী সম্পর্ক ! সে তাদের বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেল। মাথায় ঘাড়ে কানে লেগেছিল। কান-মুখ রক্তে ভেসে গেল...।"

"আঃ ! কী শুরু করলে ! চুপ করো। শান্তিতে একটু বসে আছি—আর পাশে এসে যত্ত মরার কথা ! কে তুমি ? কী দরকার তোমার ?"

"আমি তোমার কাছেই এসেছি। আমায় চিনলে না ?"

নন্দকিশোর মাথা নাড়তে যাচ্ছিল ; নাড়তে গিয়েও থেমে গেল। তারপর কী যে হল, সে যেন দেখল, লোকটার মুখ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। চোখ নাক মুখ আছে—অথচ সবই কেমন অদ্ভুত দেখাতে লাগল। জলের তলায় শ্যাওলা ভাসলে যেমন দেখায়—অনেকটা সেই রকম। তার চোখ নাক মুখ স্বাভাবিক আকৃতি হারাচ্ছে। তরল হয়ে গলে গিয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে বুঝি। দুটো চোখ ভাসতে লাগল। নাক বড় হয়ে উঠছিল।

ভয় পেয়ে নন্দকিশোর চোখ রগড়ে নিল। কোনো লাভ হল না। হঠাৎ তার মনে হল, তবে কি সে সামান্য আগে যে ওষুধ দুটো খেয়েছে, তখন কিছু গোলমাল করে ফেলেছে। ভুল করে আগে পরে হয়ে গেছে, পরেরটা আগে খেয়েছে, আগেরটা পরে। নাকি, অন্যমনস্কভাবে সে বেশি ওষুধ খেয়ে ফেলেছে ! ভুল বা বেশি ওষুধ খেয়ে ফেলার জন্যে ভৌতিক কিছু দেখছে নাকি ! হ্যালুসিয়েশান !

এমন সময় নন্দকিশোর ঘণ্টার শব্দ পেল। লাটুবাবার মন্দিরে সন্ধের পুজো হচ্ছে। আরতি বোধ হয়। মণিমালারা বসে আছে মন্দিরে গলবস্ত্র হয়ে।

মুখ ফিরিয়ে তাকাল নন্দকিশোর।

"কী চিনতে পারছ ?"

"পারছি এবার।"

"আমি কে ?"

"তুমি কে আন্দাজ করতে পারছি। ...আমি কে সেটাই বুঝতে পারছি না।"

"তুমি নন্দকিশোর চৌধুরী। বয়েস চুয়ান্ন।"

"প্রায় চুয়ান্ন", নন্দকিশোর যেন একটু হাসল। "তা তুমি অসময়ে এখানে কেন ?"

"তোমার কাছে।"

"আমায় ডাকতে এসেছ ?"

"ডাকাই আমার কাজ !"

"কিন্তু আমার যে অন্য কাজ আছে।"

"সেগুলো আর হয়ে উঠবে না।"

"তুমি বলছ বটে হয়ে উঠবে না। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, হয়ে গেলে ভাল হত।...তা তুমি সব বেটাকে ছেড়ে এই বেঁড়ে বেটাকে ধরতে এসেছ কেন ! আমার তো এখনও ঠিক তোমার সঙ্গে যাবার বয়েস হয়নি। চুয়ান্ন কি আজকাল একটা বয়েস ! তুমি বলবে, বয়েসে কিছু আসে যায় না। চার, চোদ্দ, চব্বিশ, চৌত্রিশ—সব বয়েসেই মানুষ যায়। ঠিক কথা। যাবার বয়েস নেই, সময় নেই, স্থান অস্থান নেই। তবু, আমি ঠিক খুশি হচ্ছি না হে !"

"কেই বা হয় ! তুমি ভয় পাচ্ছ ?"

নন্দকিশোর এবার একটু শব্দ করে হাসল। পরে বলল, "ভয় পাচ্ছি না—এ-কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। পাচ্ছি খানিকটা। তবে মারাত্মক নয়। ভয়-টয় আমার বরাবরই খানিকটা কম। এই তো কিছুদিন আগেই যাব-যাব হয়েছিলাম। বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। ডাক্তারে ওষুধে আত্মীয়স্বজনে বন্ধুবান্ধবে বাড়ি ভরে গেল। তখনও তো তুমি আশেপাশে ওত পেতে বসেছিলে। নিয়ে নিলেই পারতে। আমার কিছু বলার থাকত না। তবে তোমায় ঠিক বলছি, ভয় তখন আমি তেমন পাইনি। মন খারাপ হত, দুশ্চিন্তা হত। যাকে ভয় পেয়ে মরে-যাওয়া বলে তেমন হইনি।"

"তবে আর কী ?"

"না, কিছু না। কিন্তু এখন এই ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। রসিকতা বলে মনে হচ্ছে। দু মাস আগেই তোমার খেলাটা খেলে নিলে পারতে, মহারাজ ! ...মহা-রাজ ! বাঃ নামটা বেশ মুখে এসে গেল তো ! আমি তোমাকে মহারাজ বলেই ডাকব। ...বলছিলাম কী—সেই তখন—যখন

যাব-যাব হয়েছিলাম, তখন তুমি ডেকে নিয়ে গেলে কে তোমায় আটকাত ! কিন্তু এখন...”

“এখন কী ?”

“না, কিছু নয় । তুমি ওসব বুঝবে না ।”

“বুঝতে পারি ।”

“পার ! কী বুঝছ ?”

“তুমি কিছু ভাবছ আজকাল...”

“ধরেছ মোটামুটি । ...তা মহারাজ, এসো না—আমরা একটু কথাবার্তা বলে নিই । তুমি কি ঘড়ি ধরে এসেছ ?”

“না ।”

“তা হলে...”

“আমি তোমায় খানিকটা সময় দিতে পারব ।”

“খানিকটা মানে !... দু দশ মিনিটে আমার কী হবে ! বেশি সময় চাই ।”

“কত সময় ?”

নন্দকিশোর কিছু বলল না । চুপ করে থাকল । নদীর দিকে তাকাল । জ্যোৎস্নার আভা নিয়ে জল বয়ে চলেছে । চকচক করছিল জলের ধারা ।

নন্দকিশোর হঠাৎ বলল, “মহারাজ, তোমার সঙ্গে আমার একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়ে যাক । কী রাজি ?”

“কী চুক্তি ?”

নন্দকিশোর সামান্য চুপ করে থাকল । তার চোখ নদীর দিকে । মনে মনে কিছু ভাবছিল । মাথার মধ্যে একটা ফন্দি এসেছে । সে নির্বোধ নয়, বরং চতুর । বুদ্ধিমান । এমনভাবে সরাসরি সে কিছু বলতে চায় না যাতে পাশের লোকটি সন্দেহ করে নন্দকিশোর তাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে ।

কিছুক্ষণ পরে নন্দকিশোর বলল, “ধরো, আমি যদি এখন ওই নদীতে খানিকটা সাঁতার কাটতে চাই, তুমি রাজি হবে ?”

লোকটা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে যেন চাপা-হাসি হাসল । “হব না কেন !”

“না, মানে একসময় আমি ভাল সাঁতারু ছিলাম । জলে আমার একটা টান রয়েছে বরাবর ।”

“আমি সব জানি । তুমি ছেলেবেলা থেকেই ভাল সাঁতারু ছিলে । যত বয়েস বেড়েছে তত পাকা সাঁতারু হয়ে উঠেছিলে । এ তল্লাটে তো বটেই,

পুরো জেলায় তোমার চেয়ে বড় সাঁতারু কেউ ছিল না।"

নন্দকিশোর কথা থামিয়ে দিল লোকটির। উৎফুল্ল হয়ে বলল, "একেবারে ঠিক কথা। ক্লাব, ইন্টার স্কুল, ইন্টার কলেজ সব জায়গায় নন্দ চৌধুরী ছিল চ্যাম্পিয়ান। গাদা গাদা কাপ, মেডেল পেয়েছি। মিস্টার হিগস্ আমায় সোনার মেডেল দিয়েছিলেন। আমি ভরা বর্ষায় এই নদীতে তিন মাইল সাঁতার কেটেছিলাম।... আমার কারেজ, ডিটারমিনেশান, পেসেন্স...সরি মহারাজ তুমি কি ইংরিজি বুঝতে পারছ!"

"পারছি", লোকটি হাসল।

"আসলে কী জান, এই শেষ বেলায় আমার ইচ্ছে হচ্ছে নদীর জলে খানিকটা সাঁতার কেটে নিই। জীবনের বড় প্যাশান ছিল ওটা। এটা আমার শেষ ইচ্ছে।"

"বেশ তো, কেটে নাও।"

"কিন্তু একটা কথা আছে। সেটাই আমার শর্ত।"

"বলো।"

"আমি যতক্ষণ জলে থাকব, তুমি আমায় ছুঁতে পারবে না।"

"শর্তটা ঠিক হল না। বরং আমি বলি, তুমি যতক্ষণ জলে মাথা ভাসিয়ে থাকবে, আমি তোমায় ছোঁব না। যখন দেখব তোমার মাথা আর ভাসছে না—তখন তোমায় ছুঁতে পারব। কেমন?"

"কিন্তু আমি যদি ডুব সাঁতার দিই?"

"এক সময় না এক সময় তো ভেসে উঠবেই। আমি দেখতে পাব।"

"এত দূর থেকে দেখতে পাবে?"

"না। আমি তোমার পাশে পাশেই থাকব। সাঁতার কাটব।"

নন্দকিশোর কী ভেবে বলল, "সেটা মন্দ নয়। পাশে থাকবে, তবে ছোঁবে না।... আর একটা কথা। তোমায় ফাঁকি দিয়ে যদি আমি জল থেকে ডাঙায় উঠে আসতে পারি—তা হলেও তুমি আর আমায় ছুঁতে পারবে না এখন। কী রাজি?"

"রাজি। তুমি যে বলছিলে কী সব কথাবার্তা বলবে—সাঁতার কাটতে কাটতে আমরা কথা বলতে পারি।"

"বাঃ! বেশ বলেছ!... তা হলে আমি তৈরি হই।"

"হতে পার। কিন্তু, তুমি কি ভেবে দেখেছ—এখন তোমার বয়েস কত, শরীরের কী অবস্থা? যে বয়েসে চ্যাম্পিয়ান ছিলে সে-বয়েস আর নেই।

অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার দম কোথায় ? বুকেরই না অসুখ তোমার !"

নন্দকিশোর বলল, "মহারাজ, আর যে-ক্ষমতাই থাক তোমার, তুমি লেখাপড়া শেখোনি। তোমাকে নাকি ধর্মরাজও বলে, ধর্মের তুমি কী জান ? মহাভারতে কী আছে তুমি খোঁজও রাখ না ? তোমার সঙ্গে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার কাছে যুদ্ধের মতন। যদি আমি পিছিয়ে যাই আমি হেরে যাব। যদি পালিয়ে যাই—আমার যশ ও কীর্তি নষ্ট হবে। যদি জিততে পারি আমি বিজয়ী হব।"

লোকটি হাসল। বলল, "বেশ। তুমি জলে নেমে পড়ো। আমিও নামছি।"

তিন

নদীর জলে স্রোত ছিল। টান ছিল না।

নন্দকিশোর অনেককাল পরে জলে নেমেছে। কত কাল—তার হিসেবও করা মুশকিল। অন্তত বছর কুড়ি। কাশীর গঙ্গায়, এলাহাবাদের সঙ্গমে, পুরীর সমুদ্রে সে দু-একবার যা নেমেছে—তা নিতান্তই শখ করে, মণিমালাদের নিয়ে বেড়াতে গিয়ে এক-আধ দিন জলে নেমে ডুব মেরেছে কি বিশ-পঁচিশ গজ সাঁতার কেটেছে। নয়ত আর জলে নামা হয়নি তার। বাড়িতে স্নানঘরেই স্নান, কখনো বা কুয়াতলায়। তাও কুয়াতলায় স্নান সে গত বছর বারো-চোদ্দ করেনি। বন্ধ স্নানঘরের কলের জলে স্নান করাই এখন অভ্যাস।

নন্দকিশোরের পরনে জাঙিয়া। প্যান্টের তলায় যেটা ছিল। গায়ে কিছু নেই, হাতকাটা গেঞ্জি ছাড়া। বেতের টুকরি থেকে ছোট তোয়ালেটা নিয়েও শেষপর্যন্ত রেখে দিয়েছে। পরে গা-মাথা মুছবে বলে। পরে ? পরে কি সে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠতে পারবে !

নদীর জলে নেমে প্রথমে নন্দকিশোরের গা শিউরে উঠেছিল। ঠাণ্ডা। বাতাস দিচ্ছিল। বাতাসে গা যেন কেঁপে উঠল শীতে। প্রথমটায় নন্দকিশোর হাত-পা-গা সবই কেমন অসাড়-অসাড় অনুভব করল। মনে হল, সে পারবে না। সামান্য পরেই তার শরীর অসাড় হয়ে যাবে, সে কোনো অঙ্গই নাড়াতে পারবে না, অবধারিত মৃত্যু।

প্রথম দিকের আচমকা জড়তা নিষ্প্রাণভাব কাটিয়ে নিজেকে সে ক্রমে সামলে নিতে লাগল। সাঁতার যে শিখেছে একবার সে কি সহজে সেটা

ভোলে।

নন্দকিশোর মোটামুটি নিজেকে সামলে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশের চাঁদ যেন মাথার ওপর। পূর্ণিমার শশী। এই আষাঢ়েও চমৎকার জ্যোৎস্না ফুটেছে, ছড়িয়ে পড়েছে নদীর জলে, দু পাশের ঘন গাছপালার নিঃসাড় গায়ে-মাথায়। নদীচর, বনরাজি শান্ত, নিস্তব্ধ। লাটুবাবার মন্দিরের ঘণ্টাও আর শোনা যাচ্ছে না।

আশেপাশে তাকাল নন্দকিশোর, কাউকে দেখতে পেল না। ফেউয়ের মতন যে-লোকটা, সে মৃত্যুই হোক, অথবা মহারাজ, কিংবা ধর্মরাজ—সে কোথায়?

যদি সে না থাকে, নন্দকিশোর সামান্য পরেই গিয়ে ডাঙায় উঠবে। লোকটার সঙ্গে ভদ্রলোকের চুক্তিমতন যে-শর্ত ঠিক হয়েছে—তাতে যতক্ষণ নন্দকিশোর জলে মাথা ভাসিয়ে রেখেছে তাকে কেউ ছুঁতে পারবে না। আবার যদি সে কোনো রকমে লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে তার হাত এড়িয়ে ডাঙায় উঠে পড়তে পারে—তা হলেও ও আর নন্দকে এ-যাত্রায় ছুঁতে পারবে না।

নন্দকিশোর বোকা নয়; সে জানে শেষপর্যন্ত কোনো জীবই মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারে না। বাবা বলতেন: 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ...', যে জন্মেছে তার মরণ অবশ্যই হবে...। কিন্তু এমন তো হয়—মৃত্যু এসেও ফিরে যায় অনেক সময়, তখনকার মতন, হয়ত কম সময়ের জন্যে, হয়ত বেশি সময়ের জন্যে, তারপর সে আবার আসে। রোগ, শোক, আঘাতে কতবার বুঝি মৃত্যু আসে মানুষের কাছাকাছি, এসেও শেষপর্যন্ত জীবনের শিখাটি নেভাতে পারে না, ফিরে যায়, অপেক্ষা করে অন্য কোনো সুযোগের। নন্দকিশোর মাস দুই-তিন আগেই তো মারা যেতে পারত অসুখে, কেন গেল না? তার জীবনীশক্তি আর পবিত্র ডাক্তারদের আপ্রাণ চেষ্টা মৃত্যুকে দু' হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল। তা যদি দিয়ে থাকে নন্দকিশোর কি এবারও এই জীবন-মৃত্যুর খেলায় জিততে পারবে না? আপাতত জেতা; তারপর আবার কবে সে আসছে সেটা অন্য কথা। দেরি করেও তো আসতে পারে।

নন্দকিশোর জল ঠেলে হাত কয়েক এগিয়ে গেল।

"কই, তুমি যে বললে—তোমার কী সব কথাবার্তা আছে?"

খানিকটা চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল নন্দকিশোর। সেই লোকটা। পাশাপাশিই রয়েছে, মুখ মাথা ভাসিয়ে। জলে নামার পর থেকে ওকে আর দেখেনি নন্দ। এই প্রথম দেখল। দেখে খুশি হল না।

"ও, তুমি ! এতক্ষণ দেখিনি..."

"পাশেই ছিলাম। ...দেখলাম এতকাল পরে জলে নেমে তুমি বেশ কাবু হয়ে পড়েছ। হাজার হোক বয়স তো হয়েছে, তারপর সদ্য অসুখ থেকে উঠেছ, দুর্বল তো লাগবেই। তার ওপর সময়টাও সন্ধে, নতুন বর্ষার জল— ।"

নন্দকিশোর বলল, "তা গোড়ায় খানিকটা অসুবিধে হচ্ছিল বটে, এখন অতটা হচ্ছে না।"

"ভালই তো ! দেখ কতক্ষণ পার !"

"দেখ হে, তোমায় একটা সত্যি কথা বলি। আমি জল জিনিসটা বুঝি। জন্মকাল থেকে জল ঘেঁটে মানুষ। মিছিমিছি কি সাঁতারে চ্যাম্পিয়ান হয়েছি ! সব রকম সাঁতার জানি। ছোট্ট একটু জায়গার মধ্যেও ভেসে থাকতে পারি দু'চার ঘণ্টা। তুমি আমায় চট করে ছুঁতে পারছ না। আমার বাবা ঠাট্টা করে বলতেন, মৎস্যজন্ম থেকে আমি নরজন্ম লাভ করেছি। বাবার কাছে আমি গল্প শুনেছি, সেই পুরান জাতক-টাতকের গল্প, মাছ থেকে কেমন করে মানুষ হয়ে যেত তখনকার দেবতারা, মুনিঋষিরা, আবার মানুষ থেকে মাছ..." নন্দকিশোর যেন হেসে উঠল।

"তোমার বাবা ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার।"

"জান তুমি ? আশ্চর্য হে !... আমার বাবা শুধু হেডমাস্টার ছিলেন না, হেডমাস্টার গণ্ডায় গণ্ডায় থাকে, গোরু-গাধার মতন। বলার মতন হেডমাস্টার দু-চারটে। আমার বাবা ছিলেন মতিলাল হাই স্কুলের বিখ্যাত হেডমাস্টার। স্কুলটা আগে ছিল জুনিয়ার, তারপর হল অ্যাংলো-বেঙ্গলি মিডল, শেষে মতিলাল হাই স্কুল। বাবা অ্যাংলো-বেঙ্গলি থেকে শুরু করেন। এমনি মাস্টার। বারো চোদ্দ বছর পরে মতিলালের হেডমাস্টার। বাবার যে কত নাম ছিল তুমি জান না !"

"জানি। নামী মাস্টারমশাই।"

"স্কুলটা তো বাবাই জীবন দিয়ে দাঁড় করালেন। কিন্তু কী পেলেন বলো ! কিছুই না। জীবন যারা দেয় তারা কিছু পায় না। মহারাজ, আমরা খোলার চালের বাড়িতে থাকতাম। দু'তিনটে মাত্র ঘর। কুয়ার জল। মাকে নিজের হাতে বাসন মাজতে ঘর ঝাঁট দিতে দেখেছি। আমরা ভীষণ গরিব ছিলাম। ভীষণ গরিব।" বলতে বলতে নন্দকিশোর যেন কোনো আক্রোশবশে আচমকা হাত-পা ছুঁড়ে দু-পাঁচ হাত এগিয়ে গেল। গিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলল।

আকাশে কিছু লেখা থাকে না। পূর্ণিমার পুরন্ত চাঁদ নিয়ে আকাশ আগের মতনই নিজের রূপে বিভোর হয়ে আছে। তা থাক। নন্দকিশোরের মনের মধ্যে তো সবই লেখা আছে। বাছুরডোবার মাঠে, যাকে বলা হত নিচুডাঙা, সেখানে এক খোলার চালের বাড়িতে তারা থাকত। বাড়ি নয়, মাথা গোঁজার জায়গা। আকন্দ আর কাঁটাঝোপের বেড়া, দু'চারটে গাছগাছালি—লাউ কুমড়ো ঝিঙের এক টুকরো বাগান। কুয়া। দুটি মাত্র শোবার ঘর। একটি রান্নাঘর। ঘরের দেওয়ালগুলো হেলে থাকত, তার ওপর ফাটাফুটো। ইঁদুর টিকটিকি আরশোলা আর বিছের আড্ডা। বর্ষায় সব সেঁতিয়ে থাকত। শীতে কনকন করত ঘরগুলো। নন্দদের বাড়িতে তখন সাত আটজন লোক। দুই পিসি, এক কাকা। নন্দরা চারজন—বাবা, মা, দিদি আর নন্দ। কষ্ট করে থাকতে হত, খাওয়াপরাও ছিল কষ্টের। দিনের পর দিন কুমড়ো লাউ শাকপাতা কলাইয়ের ডাল খেতে হত তাদের। এক পিসি মরে গেল টাইফয়েড হয়ে, তখন টাইফয়েড মানেই যমের দরজায় পড়ে থাকা। অন্য পিসির বিয়ে দিলেন বাবা—মায়ের হাতের চারগাছা চুড়ি আর গলার হার খুলে নিয়ে। বিয়ের পর পিসি চলে গেল আগ্রা। সম্পর্ক ঘুচে গেল। বার দুই এসেছিল বাবার কাছে নিয়মরক্ষা করতে, আর এল না। কাকা মানুষটা ভাল ছিল। খেয়ালি গোছের। সামান্য লেখাপড়া শিখলো কি চলে গেল ডালমিয়ানগর। কারখানার কাজ নিল। বিয়েও করল এক হিন্দুস্থানী মেয়েকে। নিজের মতনই ছিল কাকা। তারপর শোনা গেল, কারখানায় গণ্ডগোলের সময় জখম হয়ে মারা গেছে।

বাবার বুক বলতে হবে। অত কষ্ট, অত আঘাত, মায়ের অপ্রসন্নতা, নন্দরা যা পায় খায়, যা পায় পরে—তবু বাবার মন টলে না। স্কুল আর ছাত্র। লোকে যেমন প্রশংসা করত বাবাকে, নিন্দেও করত। বলত মাস্টারমশাই নিজেরটাই দেখছেন—বাড়ির লোকগুলো যে কুকুর বেড়ালের মতন দিন কাটাচ্ছে সেদিকে চোখ নেই। জ্ঞানে প্রাণ বাঁচে না।

নন্দকিশোর আবার ঘাড় ঘোরালো। "কই হে? তুমি কোথায়?"

"তোমার কাছেই।"

"আছ তা হলে।...তা আমার বাবার কথাই যখন তুললে বলি—কতটুকু জান তাঁকে?"

"জানি। তুমি যা ভাবছ সবই জানি।"

"জান? আচ্ছা বলো তো আমরা কবে নিচুডাঙার বাড়ি ছাড়লাম?"

"সেবারে প্লেগ দেখা দিল শহরে..."

"ঠিক। একেবারে ঠিক। তুমি মহারাজ সব জেনে বসে আছ দেখছি।"

"তুমি তখন এইট ক্লাসে পড়ছ। সবেই সাঁতারে নাম হয়েছে।"

"আরে মহারাজ, বাবা নিজে আমায় সাঁতার শিখিয়েছিলেন। ছোট্টবেলা থেকে। আমাদের নিচুডাঙার বাড়ির কাছে একটা পুকুর ছিল। বড় পুকুর। ঝিলের মতন। রামদাসের পুকুর। বাবা আমাকে পুকুরে ছুঁড়ে দিতেন। হাঁসফাস করে মরতাম। জল খেয়ে পেট ফুলে যেত। চোখে অন্ধকার দেখতাম। মনে হত, মরে যাব।"

'তোমার মা রাগ করতেন।"

"খেপে যেত মা। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করত। বলত, ছেলেটাকে তুমিই মারবে।"

"তুমি তো শিখে গেলে। তোমার দিদি..."

"দিদিও শিখেছিল।... দিদির কথা যখন তুললে তখন বলি—আমার দিদি দেখতে ভাল ছিল। কিন্তু রঙ ছিলো কালো। দিদি বড় হল, কী সুন্দর হল তার ফিগার। মা বিয়ে বিয়ে রব তুলল..."

"তখন তোমরা হাজারি মহললায়।"

"ঠিক। বাড়িটাও ছিল মোটামুটি মন্দ নয়। বাবা খানিকটা সামলে নিয়েছেন। তখন আমরা দু-চার দিন মাছ খেতে পাই, মাসে একদিন মাংস। আমার আর দিদির জন্যে। বাবা মাছ মাংস খেতেন না। মা মাছ খেত।... তা ওই সময় দিদির জন্যে ছেলে খুঁজতে খুঁজতে মা পাগল হয়ে গেল। বাবার তেমন গা নেই তবু দিদিকে দেখতে আসে, মিষ্টি-টিষ্টি খেয়ে পালিয়ে যায় ছেলেপক্ষ। বিয়ে আর হয় না।"

"হল শেষ পর্যন্ত !"

"হ্যাঁ। আমি যখন স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিচ্ছি দিদির বিয়ে হল। ছেলে রেলের হাসপাতালের কমপাউণ্ডার। দেখতে সখী-সখী। বাবা এই বিয়েতে একেবারে রাজি ছিলেন না। মায়ের জেদ। বিয়ে হল। মাসখানেকের মধ্যে দিদি এল। তারপর যে কী হল—"

"জানি। তোমার দিদি গলায় দড়ি দিয়ে..."

"উঃ ! বলো না, ও কথা বলো না। মনে পড়লে এখনও আমার গা শিউরে ওঠে। সে কী দৃশ্য ! রান্নাঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দিদি নিজের গায়ের শাড়ি খুলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েছিল। কী বীভৎস দৃশ্য !"

"তোমার মা তখন থেকে..."

"পাগলের মতন হয়ে গেল। মায়ের মাথার গোলমালটা তখন থেকেই শুরু। বাবা কিন্তু অটল। দিদির মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকতে আমি দেখেছি বাবাকে। অদ্ভুত মানুষ।"

"তোমার বাবাকে স্কুল থেকে সরানো হল তারও বছর দুই তিন পরে।"

"হ্যাঁ। বাবার সঙ্গে শচীনলালবাবুর গণ্ডগোল শুরু হল। শচীনলালবাবু স্কুলের প্রেসিডেন্ট। ফাউণ্ডার মতিলালের ছেলে। স্কুলের জন্যে লাখ দেড়েক টাকা দিয়েছিল ঠাকুরসাহেব। বিল্ডিং সারাতে নতুন ঘর তৈরি করতে। সেই টাকা নিয়ে শচীনলাল নিজের কাজ গোছাতে লাগল। বিশ পঁচিশ টাকা যদি স্কুলের কাজে খরচ হয় বাকি আশি টাকায় শচীনলালের কাজ হয়। বাবার সঙ্গে গোলমাল শুরু হল। স্কুল ছেড়ে দিলেন বাবা।"

"তোমার গলা ভেঙে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগছে বোধহয়।"

নন্দকিশোর কান করল না কথায়। ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে এগোচ্ছিল। খানিকটা এগিয়ে আবার ঘুরে যাচ্ছিল, বলল, "তারপর কী হল শোনো। স্কুল ছেড়ে বাবা বাড়িতে বসে ছেলে পড়াতে লাগল। খাওয়া-পরা বন্ধ হল না আমাদের। কত ছেলে যে পড়তে আসত। শচীনলাল ভেবেছিল, বাবাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে আমরা না খেয়ে মরব। তার মতলব খাটল না। শেষপর্যন্ত কী করল জান?"

"তুমি যখন বলছ বলো!"

"নতুন করে স্কুল কমিটি গড়তে হচ্ছিল সে-বছর। গার্জেনদের অনেকেই বাবাকে কমিটির মধ্যে রাখতে চাইল। বলল, বাবাকে কমিটির মাথা হতে হবে। বাবা প্রথমে রাজি হননি, পরে হলেন। প্রথম দিনের মিটিঙেই হই-হই। দ্বিতীয় দিনের মিটিঙের পর বাবা যখন বাড়ি ফিরছেন, সন্ধের পর তখন শচীনলালের ভাড়া করা ক'টা গুণ্ডা, বাজারের কাছে বাবার পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাধাল। বাবাকে ঘিরে ধরে মার-ধর। সেটা তেমন বড় কথা নয়, বড় কথা হল, শালা হারামজাদারা বাবার ধুতি, জামা, মায় যা কিছু আছে গায়ে—খুলে ছিঁড়ে বাবাকে উলঙ্গ করে বাজারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে পালিয়ে গেল। লোকে দেখল, মতিলাল হাই স্কুলের সেই জাঁদরেল হেডমাস্টার ন্যাংটা হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। চোখ ফুলে গেছে, কালসিটে পড়েছে গালে গলায়।"

"আমি জানি।"

"না, তুমি সব জান না। যে-মানুষ মাথা সোজা করে জীবনের এতগুলো বছর কাটিয়ে এল, যে ভাবত পৌরুষ অর্থে ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, সোজা পিঠ করে দাঁড়ানো, সেই মানুষকে যখন বাজারে লোকের সামনে ন্যাংটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—মাথা নিচু করে লজ্জা সম্ভ্রম খুইয়ে তখন তার কী খোয়া যায়—তুমি জান না। বাবার ব্যক্তিত্ব, গর্ব, পৌরুষ—সেদিন ওরা ভেঙে চুরমার করে দিল। বাবা যে কী গ্লানির বোঝা বয়ে বাড়ি ফিরলেন তা বাবাই জানেন। উঃ ভাবা যায় না।"

"তারপরই উনি..."

"তিন চার দিন পরে হার্ট অ্যাটাক হল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। এই লজ্জা, গ্লানি, অপমান বাবা সহ্য করতে পারলেন না। ... ওরা আমার বাবাকে মারল।"

নন্দকিশোর চুপ করে গেল। তার গলার স্বর ভেঙে কর্কশ শোনাচ্ছিল।

কোনো সাড়াশব্দ নেই। সামান্য সময় যেন কেমন নিশ্চল হয়ে থাকল নন্দকিশোর। তারপর আকাশের দিকে তাকাল। বাবা কিসের যন্ত্রণা নিয়ে মারা গিয়েছে বাবাই জানেন। ছেলে হয়ে নন্দও তা খানিকটা বুঝতে পারে। কোনো মানুষের যন্ত্রণাই—সে যেমনই হোক—নিজেই সে অনুভব করে, অন্যে তা অনুমান করতে পারে মাত্র, অনুভব করতে পারে না।

নিজেকে যেন সজীব করার জন্যে নন্দকিশোর আবার সাঁতার কাটতে লাগল। এগিয়ে এল খানিকটা। ঘাড় ঘুরিয়ে আশপাশ দেখল। কাউকে দেখতে পেল না। লোকটা গেল কোথায়? বাবার কথা শোনার পর তার হল কী! পালিয়ে গেল? মায়া-মমতা হল নন্দকিশোরের ওপর।

হঠাৎ কী মনে হল নন্দকিশোরের, সে সামনের দিকটা দেখল। নদীর পাড় বেশি দূরে নয়, গজ পঞ্চাশ মতন। পাড়ের মাটি, চর, গাছপালা, পাথর দেখা যাচ্ছে। সবই ঘন ছায়ার মতন কালো। নন্দকিশোর যদি এখন এখানে একটা ডুব দেয়, দিয়ে ডুব সাঁতারে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পারে তবে তো মন্দ হয় না। বিশ তিরিশ গজ এগিয়ে একবার মাথা তুলবে। দম নেবে সামান্য। তারপর আবার ডুব। একেবারে ডাঙায় গিয়ে উঠবে। ডাঙা একবার ছুঁতে পারলে হয়ে গেল। মহারাজকে ফিরে যেতে হবে বিফল হয়ে।

নন্দকিশোর একসময় ভাল ডুব সাঁতার দিত। সে বয়েস নেই, অভ্যাস নেই। তবে দু তিন বারের চেষ্টায় সে নিশ্চয় ডাঙায় গিয়ে উঠতে পারবে।

লোকটা যখন কাছাকাছি নেই তখন আর অপেক্ষা করা কেন। সাবধানে

এবং দ্রুত একবার আশপাশ দেখে নিয়ে নন্দকিশোর জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দিল।

না, বেশিক্ষণ পারা গেল না। মাথা তুলল নন্দকিশোর। জলের ওপর মাথা তুলে নিশ্বাস নিতে লাগল বড় বড়। বুকে হাঁফ ধরে গিয়েছে।

হঠাৎ কে যেন হাসির গলায় বলল, "তুমি এখনও ডুব সাঁতার দিতে পার ?"

নন্দকিশোর চমকে গিয়ে তাকাল। সেই মহারাজ। কোথায় ছিল ও ?

"তোমার তো বুকেরই অসুখ। তাই না ? তাহলে ডুব সাঁতার দিতে গেলে কেন !"

"তুমি আছ এখনও ?"

"সব সময়েই রয়েছি।"

"মাঝে মাঝে ভ্যানিশ করে যাও নাকি ? দেখতে পাচ্ছিলাম না।" নন্দকিশোর হঠাৎ নিজেই হেসে ফেলল। বলল, "মহারাজ, সত্যি কথাটা কী জান ? আমি তোমায় ফাঁকি দিয়ে পালাতে চাইছিলাম।"

"জানি।"

"এর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। আছে ? তুমি আমায় ধরতে এসেছ, আমি তোমায় ধরা দিতে চাইছি না। হাডুডু খেলার মতন আর কী ! তাই না ! তার চেয়েও বড় খেলা। মহারাজ, তুমি তো কবিতা-টবিতা বোঝ না। যদি বুঝতে তা হলে একটা চমৎকার কবিতা শোনাতাম। দুষ্টু দস্যি ছেলেগুলো যেভাবে মাঠেঘাটে ছুটে বেড়িয়ে উড়ন্ত ফড়িংটড়িং ধরে বেড়ায়—মৃত্যু সেইভাবে আমাদের ধরার জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছে। ... আমার মুখে কবিতার কথা শুনে মজা পাচ্ছ নাকি ! না হে, এ আমার বাবার কাছে পড়া। ...তা আদত কথাটা কী জানো ? আমি তোমার হাত থেকে পিছলে যাবার চেষ্টা করছি, তুমি আমায় ধরবার চেষ্টা করছ। জীবন আর মৃত্যুর এই খেলাটা আমাকে খেলতেই হবে।"

"কতক্ষণ পারবে তাই ভাবছি।"

"এখনও পারছি। আমার মা কতদিন এই খেলা খেলেছিল জান ? দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মারা যাবার পর, বাবাকে ওইভাবে মেরে ফেলার পরও—দশ বছর। প্রায় এগারো বলতে পার। আমার মা কেমন ছিল তুমি জান না। নাম ছিল সুহাসিনী। গোল, ছোট্ট, হাসিভরা মুখ নিয়ে মা গিরিজা মাস্টারের বউ হয়ে বাবার কাছে এসেছিল। মায়ের মুখে আমি শুনেছি। ষোল-সতেরো বছর বয়সে মা শ্বশুরবাড়িতে পা দেয়। তখন তার হাসি দেখে বাবা নাকি বলত,

হাজারবার জলে ধুলেও যেমন কয়লার কালো ঘোচে না, মায়ের মুখের হাসিও মোছার নয়।... বাবা ঠিক বলত না। দু-চার বছর যেতে না যেতেই মুখের হাসি মুছতে মুছতে একেবারে দুঃখীর মুখ হয়ে গেল মায়ের। গরিব স্কুলমাস্টারের বউ, অত বড় সংসার—দুই ননদ, এক দেওর। তাদের সামলাতে সামলাতে আমরা—মায়ের ছেলেমেয়েরা এসে পড়লাম। আমাদের সেই নিচুডাঙার ঘরবাড়ির কথা তো তোমাকে আগেই বলেছি। বাড়িতে মাত্র দুটো তক্তপোশ আর একটা বড় টেবিল ছিল। দুটো টিনের চেয়ার। ছেঁড়া মাদুর, ছেঁড়া তোষক, বিছানার চাদরও থাকত না—মাটিতে শুয়ে ইঁদুর-আরশোলার সঙ্গে আমরা বেড়ে উঠছিলাম। মা বেচারির কাজের আর শেষ ছিল না। সংসার মায়ের মুখের হাসি মুছে দিল। তারপর এক পিসি মারা গেল টাইফয়েডে। মায়ের মনে বড় লাগল। আরেক পিসির বিয়েতে মায়ের গা হল শূন্য। না হার, না চুড়ি। কানে থাকল একজোড়া ছোট্ট ফুল। লোহা আর শাঁখা পরে থাকত মা।... তা মানুষটা তো আর শরীর-স্বাস্থ্যেও তত মজবুত ছিল না। চেহারা বলতে আর কিছু ছিল না মায়ের। শেষমেশ প্লেগ এল। আমরা নিচুডাঙা ছাড়লাম।"

নন্দকিশোর আবার সাঁতার শুরু করেছিল। থামছিল। কথা বলছিল। আবার দশ-পনেরো হাত এগুচ্ছিল। ভাবছিল। পুরনো দৃশ্য যেন মনের তলা দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, গাছের শুকনো পাতা যেমন উড়ে যায় বাতাসে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে। কখনো মুঠো মুঠো পাতা দমকা ঝড়ে উড়ে যাবার মতন চলে গেল, কখনো দুটি চারটি পাক খেতে খেতে ধীরে ধীরে উড়ে যাচ্ছিল।

নতুন পাড়ায় নতুন বাড়িতে এসে মা খানিকটা স্বস্তি ফিরে পেল। তখন কাকা নেই, পিসিও নেই। আমরা মাত্র চারজন, বাবা মা দিদি আর নন্দ। বাবা ততদিনে স্কুলটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর্থিক কষ্টও কমেছে খানিকটা। মায়ের শরীর সামান্য সারল। মুখে মাঝে মাঝে হাসি দেখা দিচ্ছিল। মাথার চুল কিন্তু ওই বয়েসেই পাকতে লাগল। কটা মাত্র বছর—তার পরেই উৎপাত শুরু হল দিদিকে নিয়ে। দিদির কোনো দোষ ছিল না। কিন্তু যা হয়—কয়েকটা ছেলে অসভ্যতা শুরু করল। রঙ কালো হলেও দিদির গড়ন ছিল দেখার মতন। তার ওপর দিদির খানিকটা ঝাঁঝ ছিল। রাস্তাঘাটে কেউ পেছনে লাগলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করত, বলত—'তোর মুখে জুতো মারব।' দু-পাঁচটা উড়ো চিঠি এল বাড়িতে। মা আগুন, দিদি বিরক্ত। বিয়ের জন্যে মা উঠেপড়ে লাগল দিদির। বাবাকে অস্থির করে মারছিল। দু-একটি ছেলে

জুটলো, কিন্তু বাবার টাকায় কুললো না। টাকাই নেই তো কুলবে ! শেষ পর্যন্ত এল রেল হাসপাতালের কম্পাউন্ডার। রেলের চাকরি, থাকার কোয়ার্টার্স, পাস পিটিও, বড় হাসপাতালে গেলে মাইনেও বাড়বে। বাবা মনস্থির করার আগেই মা মত দিয়ে দিল। নন্দকিশোর তখন জানত না, পরে জেনেছে—কম্পাউণ্ডারবাবুর এমন একটা খুঁত ছিল যাতে তার বিয়ে করা উচিত হয়নি। মেয়েদের খুঁত জানতে দেরি হয়, পুরুষদের হয় না। দিদি আত্মহত্যা করল, তার মানে অভিমানে অধিকারে লাগল বলে। মেয়ে হিসেবে তার রঙের খুঁত নিয়ে যদি লোকে মুখ ফেরাতে পারে, তবে মেয়ে হিসেবে সে তার স্বামীর অকেজো পুরুষ চিহ্নটি নিয়ে কেন মুখ ফেরাতে পারবে না ! তারই বা দাম থাকবে না কেন ?...শালা সেই সখী-সখী মানুষটা ছিল নপুংসকের মতন।

"তুমি বেশ থকে গিয়েছ !"

নন্দকিশোর ঘাড় ঘোরাল। ক্লান্ত সে হয়েছে। হাত-পা ক্রমশই অসাড় হয়ে আসছিল। ভিজে মাথা-মুখ ঠাণ্ডা, কনকন করছে। চোখ জ্বালা করছিল। বয়েসটাই বোধ হয় তাকে আর এগুতে দেবে না। হায় রে, আজ যদি নন্দকিশোর কোনো রকমে অন্তত কুড়িটা বছর পিছিয়ে যেতে পারত—মহারাজকে দেখিয়ে দিত সে কী পারে আর পারে না।

নন্দকিশোর বলল, "বাদ দাও। থকে গিয়েছি ঠিকই, ডুবে যাইনি। এখনও আমার মাথা জলের ওপর ভাসছে।... যাক গে, আমি মায়ের কথা বলছিলাম। দিদি ওইভাবে মারা যাবার পর মা যে-ধাক্কা খেল তাতে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। তখন থেকেই মায়ের মনে বড় একটা চিড় ধরে গেল। আয়নার কাচে চিড় ধরলে কেমন হয় দেখেছ ? সেই রকম। ওই চিড় তো আর মেরামত হয় না মহারাজ। মানুষের মন বড় আশ্চর্য, সে অনেক কিছু ভোলে, অনেক কিছু আর ভুলতে পারে না। ... ওই অবস্থা থাকতে থাকতে কত কী ঘটে যেতে লাগল। বাবা স্কুল ছাড়ল, সে আর-এক আঘাত মায়ের কাছে। তারপর বাবাকে যেভাবে শচীনলালের লোকেরা মারল—তোমাকে তো বললাম—এরপর মায়ের পক্ষে বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে উঠল। খায় না দায় না, ঘুমোয় না, গলায় শব্দ করে কাঁদে না, পুজোর ঘরে ঢোকে না। গাছ যখন মরতে শুরু করে—তার চেহারা তো দেখেছ ! মা সেইভাবে মরছিল। আমি তখন একা। আমার কোনো সহায় নেই, সামর্থ্য নেই। কলেজটুকু শেষ করেছি কোনো রকমে। এমন সময় একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যেতেই কেমন একটা গন্ধ পেলাম নাকে। ন্যাকড়া পোড়া গন্ধ। ছুটে

বাইরে এসে দেখি—মা তার ঘরের সমস্ত কিছুতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। নিজেও পুড়তে যাচ্ছিল। কপাল ভাল, মাকে আমি বাঁচাতে পারলাম। খানিকটা অবশ্য পুড়ল। একটা পায়ের খানিকটা, বাঁ হাতের আঙুল, কনুই। হাসপাতালে কদিন থাকতে হল।... মা খানিকটা সুস্থ হলে, আমি বললাম—'বাড়ি চলো এবার।' জবাব দিচ্ছিল না মা। পরে বলল, 'তোমার বাবার বাড়ি আমি পুড়িয়ে এসেছি, আমার বাড়িও পুড়েছে। ওখানে আমি যাব না। তুমি আমায় কোন্ বাড়িতে নিয়ে যাবে ?' মায়ের কথার মধ্যে মস্ত একটা হেঁয়ালি ছিল, অর্থ ছিল। আমি বুঝতে পারলাম। মাকে বললাম, আমি তোমাকে অন্য বাড়িতেই নিয়ে যাব।"

নন্দকিশোর আবার সাঁতরাতে শুরু করল। ধীরে ধীরে। মাঝখানে একটা পাথর। পাথর পর্যন্ত এগিয়ে দাঁড়াল। "মহারাজ ?"

"পাশেই আছি।"

"তুমি বুঝতে পারলে মা কী বলেছিল ? পারবে না। আবার বাবা ছিল গরিব স্কুলমাস্টার। আমরা ডাল-ভাত খেয়ে মানুষ। বাড়ি আর কোত্থেকে করব ! আসলে, মানুষ যে-বাড়িতে মাথা গোঁজে সেটা হল ইট-কাঠ সিমেন্টের বাড়ি, না হয় গরিবগুর্বোর খড়ের চাল-খাপরার বাড়ি। তাই না ? এ ছাড়াও একটা বাড়িতে মানুষ থাকতে চায়। সব মানুষ নয়, কোনো কোনো মানুষ। সেই বাড়ি হল তার মনে-গড়া বাড়ি। সেখানে থাকে ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, সততা, আদর্শ, সহিষ্ণুতা—আরও কত কী ! বাবার বাড়ি ছিল ওই রকম : লোকপ্রিয়, ক্রোধহীন, কামনা-বর্জ্জিত, লোভহীন। আর আমার মায়ের গড়া বাড়ি ছিল অতৃপ্তির দুঃখের লোকলজ্জার অবিবেচনার অনুশোচনার—এই সবের। আমি এই দুই বাড়ির বাইরে মাকে নিয়ে এসেছিলাম। একদিনে নয়, এক বছরে নয়। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস থেকে চেষ্টা করতে করতে আমি যা তৈরি করেছিলাম..."

"জানি। এই শহরে তুমি একজন মোটামুটি সফল লোক।"

"বলতে পার।"

"তুমি ঘরবাড়ি জমি জায়গার ব্যবসা ফেঁদে দু হাত ভরে রোজগার করেছ।"

"আমার দুর্নাম তুমি নিশ্চয় শুনেছ। নন্দকিশোরকে লোকে বলে ধান্ধাকিশোর। বলে, আমি ধান্ধাবাজ, চালাক, ধূর্ত, ফন্দিবাজ, চোর-জোচ্চর, হাড়-হারামজাদা, শয়তান, ক্রিমিন্যাল।... সব ঠিক। বিলকুল ঠিক। আমি ব্যবসা করতে নেমে নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু দেখি না, বুঝি না, গ্রাহ্য করি

না...”

“চুয়াকে তুমি...”

“আবার চুয়া ! আশ্চর্য ! মহারাজ, তুমি কেন চুয়ার কথা বার বার তুলছ ! আমি তো চুয়াকে মারিনি । সে তাদের বাড়ির দোতলার ছাদ থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল । আমি তখন কোথায় ? ছ' মাইল তফাতে বাড়ি কনস্ট্রাকশানের কাজ দেখছিলাম ।”

“জানি । কিন্তু চুয়া কেন পড়ল ?”

“আশ্চর্য কথা ! মিনিংলেস ! কেন পড়ল ? মানুষ লাইনে কেন কাটা পড়ল, রাম কেন লরি চাপা পড়ল, যদু কেন জলে ডুবে গেল—এ-সব কেনর জবাব আমি কেমন করে দেব ! তুমি দিতে পার ।”

“আঃ, তুমি উত্তেজিত হচ্ছ কেন ! চুয়াকে তুমি হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছ—এ-কথা তো আমি বলিনি ।”

“তা হলে কী বলছ ! চুয়ার সঙ্গে আমার এমন কিছু হয়নি যাতে ওকে লজ্জা বাঁচাতে মরতে হবে । তাছাড়া তুমি চুয়ার ব্যাপারটাকে আত্মঘাতী হওয়া বলে ধরছ কেন ? ও তো বর্ষার দিন শ্যাওলা-ধরা ছাদের আলসে ভেঙে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল ।”

“হ্যাঁ, তাই ।...চুয়া কিন্তু তোমাকে ভালবাসত ।”

নন্দকিশোর কথাটা শুনল । জবাব দিল না । পাথর থেকে হাত সরিয়ে নিল । আবার সাঁতরাবার জন্যে তৈরি ।

“ঠিক কি না ?”

নন্দকিশোর যেন মাথা নাড়ল । বলল, “আমাদের পুরনো ভাব । এক রকম ছেলেবেলা থেকেই । স্কুলের হেড পণ্ডিতমশাইয়ের ছোট মেয়ে ছিল চুয়া । রোগা, ফর্সা । গজদাঁত ছিল চুয়ার । উঁচু কপাল । চোখ দুটো ছিল বড় বড় । ওর গলায় একটা দোষ ছিল । টেনে কথা বলত, মনে হত—যেন একসঙ্গে কথা বলার মতন দম ওর নেই । শ্বাস আটকে আসে । গলার স্বর সরু হলেও ভাঙা ছিল চুয়ার ।”

“তোমার তো পছন্দই ছিল চুয়াকে ।”

“ছিল মানে প্রায় বন্ধুর মতন । বয়েসে আমার ছোট ছিল । চার বছরের ।”

“তুমি তো জানতে ও তোমায় ভালবাসে ।”

“জানতাম ।”

“তা হলে ?... হাতে করে না ঠেললেও তুমি ওকে কি এক রকম আঘাত,

অবজ্ঞা দিয়ে...”

“তুমি বড় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বল মহারাজ ! ...তুমি কি জান, চুয়া যখন মারা যায় তখন আমার বয়েস সাতাশ-আটাশ। মাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছি—কথা দিয়েছি—আমি মাকে এমন বাড়িতে বসাব যেখানে বাবার কোনো ছোঁয়া থাকবে না, মায়েরও নয়। সেই বাড়ি করতে আমার যে কী যাচ্ছিল তুমি কেমন করে জানবে ! বাবার যা ছিল সব আমি নষ্ট করছিলাম। আমার কোনো চরিত্র ছিল না। সততা ছিল না। শুধু পরিশ্রম ছিল। স্বার্থ ছিল। কোনো ন্যায়-নীতি ভাল-মন্দ ছিল না। লজ্জা ছিল না আমার। মান-অপমান নয়। যে কোনো ভাবে নিজের কাজ গুছোতে পারলেই আমি খুশি। আমার বাড়ি থেকে...”

“তোমার মায়ের অতৃপ্তি অশান্তি ঘুচে যাচ্ছিল !”

“যাচ্ছিল না। অভাব, অনটন, অস্বস্তি ঘুচলেই কি ভেতরের যন্ত্রণা ঘোচে ? তবু মা বাইরে স্বস্তি পেয়েছিল।”

“তা এর মধ্যে চুয়া কি কোনো বাধা হত ?”

“কেমন করে বলব ! আসলে তখন আমার চুয়ার দিকে মন দেবার সময় ছিল না। তাছাড়া আমি ভালবাসা-টাসা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না।”

“বিশ্বাস করতে না ?”

“মহারাজ, তুমি এসব জিনিসের কী বোঝ ! যদি বলতে বলো, আমি বলব—ভালবাসা দু রকমের। একটা দু-চার বছরের। সিজিন্যাল ভালবাসা ; সময়ে ফুটলো তারপর শুকিয়ে ঝরে গেল। অন্য ভালবাসাটা বড় দীর্ঘ। বড় দুঃখের। জগতে কোনো বড় ভালবাসার গল্প সুখ দিয়ে শেষ হয়নি। তুমি ভাবছ, চুয়া বুঝি ভালবাসার জন্যে মরে গেল। না, একেবারেই নয়। শ্যাওলায় পা-হড়কে ভাঙা আলসের ফাঁক দিয়ে না যদি ও পড়ত, বেঁচে থাকত—তুমি দেখতে ছ'মাস এক বছরের মধ্যে তার বিয়ে হয়ে গেছে। কার সঙ্গে হত—তাও আমি বলতে পারি। স্কুলের নতুন মাস্টার জগবন্ধুর সঙ্গে।”

“তুমি বড় নিষ্ঠুর।”

“এ তুমি কী বলছ ! আমি নিশ্চয় নিষ্ঠুর। কিন্তু তোমার চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর আর কে আছে ! তুমি তো কিছুই গ্রাহ্য কর না। সংসারে তুমি হলে সবচেয়ে নিষ্ঠুর। তুমি সময়, অসময়, বয়েস, অবস্থা, সুখ-দুঃখ কিছুই গ্রাহ্য করো না। ভালবাসার কথা তোমার মুখে মানায় না মহারাজ। ...চুয়াকে আমি পছন্দ করতাম—ভালই লাগত। ওর সঙ্গে আমার মেলামেশাও ছিল। কিন্তু চুয়াকে

নিয়ে সংসার করব—এমন কথা বলিনি।"

"ও মারা যাবার পর দু-তিন দিন ঘুমোতে পর্যন্ত পারনি।"

"যে-অবস্থায় ওকে দেখেছিলাম তাতে ঘুমনো যায় না। বীভৎস!"

"তুমি তবে ভালবাসায় বিশ্বাস কর না?"

"না।"

"তুমি কী কী বিশ্বাস কর?"

"কিছুই করি না।"

"ঈশ্বর নয়?"

"না। সে কে? ঈশ্বর-বিশ্বাস আমার নেই।...আমি তাকে কিছু দিই না, নিতেও চাই না। শোনো মহারাজ, আমি মনে করি, আমার এই জীবনে তোমাদের ঈশ্বর আর আমি পরস্পরের অচেনা যাত্রী হয়ে এক রেল-কামরায় বসে আছি।"

"তোমার স্ত্রী কিন্তু এখন মন্দিরে বসে আছে। তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ বলে সে মন্দিরটাকে ভাল করে গড়ে দিতে চাইছে।"

"আমার স্ত্রী যা করছে—আমিও করেছি। শোনো ধর্মরাজ, আমি এই শহরে আশেপাশে যত কাজ করেছি—সব জায়গায় ঘুষ দিয়েছি। পাঁচ-সাতশো টাকা থেকে পাঁচ-সাত হাজার পর্যন্ত। মানুষের সংসারে ঘুষ চলে। তোমাদের কাছেও কি চলে? অভ্যেসবশে আমরা দিই এই পর্যন্ত।...ধরো, তুমি—তোমায় যদি আমি ঘুষ দিতে চাই—তুমি নেবে? যদি বলি, মহারাজ—আমাকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত টিকিয়ে রাখ—তার বদলে তোমায় না হয় দিচ্ছি কিছু—তুমি নেবে?"

নন্দকিশোর কোনো জবাব পেল না। অপেক্ষা করল। তাকাল দু পাশে—লোকটাকে দেখতে পেল না। গেল কোথায়?

হঠাৎ নন্দকিশোরের মনে হল সে এবার এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে—যেখান থেকে জোরে সাঁতার কাটতে পারলে নদীর পাড় ছুঁতে খুবই সামান্য সময় লাগবে। লোকটা বুঝতে পারেনি, নন্দকিশোর নিজেও সচেতনভাবে বোঝেনি যে—ওই ফেউটাকে কথায় কথায় ভুলোতে ভুলোতে সে এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে যেখান থেকে নন্দ মাত্র একটা ডুব সাঁতারে পাড় ছুঁতে পারে। লোকটা বোকা। নন্দকিশোর যথেষ্ট চালাক।

নন্দকিশোর আর দেরি করল না। এত কাছে জীবন, প্রায় তার নাগালের মধ্যে। এই সুযোগ সে ছেড়ে দেবে কেন? মাছের মতন নিঃশব্দে হাত কয়েক এগিয়ে গিয়েই জলের মধ্যে ডুব দিল।

মাথা তুলে নন্দকিশোর হাঁপাতে লাগল। তার কাশি এল। নিশ্বাস নিতে পারছে না। চোখ যেন অন্ধ। জল ঝরছে মাথা কপাল নাক চোখ ভিজিয়ে। তবু সে অনুমান করল—মাত্র হাত দশেক দূরে মাটি।

বুকের শব্দটা যেন কানেও বাজছিল নন্দকিশোরের। আর মাত্র...

"আমি আছি।"

সঙ্গে সঙ্গে নন্দকিশোর মাথা ঘোরাল। সেই লোকটা। আশ্চর্য কোথায় ছিল ও এতক্ষণ, কেমন করে পাশে পাশে চলে এল! নন্দকিশোরের আর যেন রাগও হচ্ছিল না।

"তুমি আমায় আবার ফাঁকি দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করছিলে?"

নন্দকিশোর হাঁ করে শ্বাস টানতে টানতে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

"তুমি জান তোমার বুকের অসুখ?"

"জানি।"

"কী অসুখ জান?"

"না, সঠিক করে ডাক্তার বলতে পারেনি। বলছিল, বুকের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ একটা কী হয়ে যায়। শব্দ হয় ভীষণ। ঘূর্ণি ওঠার মতন একটা ঘূর্ণি ওঠে যন্ত্রণার। তখন বুকে যে কী হয়! ব্যথা যন্ত্রণা শ্বাসকষ্ট—কী না হয়। মনে হয় একটা কষাই যেন ছুরির মতন অস্ত্র দিয়ে ভেতরে—ভেতরের সমস্ত কিছু কেটে ছিঁড়ে বার করে দিচ্ছে। অসহ্য কষ্ট।"

"তবু তুমি সাঁতার কাটছ?"

"কাটছি। জীবনটা তো এই রকমই। লম্বা সাঁতার...। তুমি হাত-পা আড়ষ্ট করে বসে থাকতে পার না।"

"তা ঠিকই।...কিন্তু তুমি কি কোনোদিন নিজের মনে মনেও বোঝনি—এই ব্যথা, এই যন্ত্রণা—যা ঘূর্ণির মতন বুকের মধ্যে পাক খেয়ে ওঠে—সেটা কেন?"

"না, বুঝিনি?"

"তুমি মিথ্যে কথা বলছ। নন্দকিশোর, তুমি আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করছ।"

নন্দকিশোর নীরব। কোনো কথা বলল না।

"তুমি জান, তোমার ওই বুকের মধ্যে তোমার বাবা ছটফট করছেন, তোমার দিদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, তোমার মা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নিজের ঘরে; আর চুয়া মাথা মুখ থেঁতলে পড়ে আছে।"

নন্দকিশোর কথা বলল না অনেকক্ষণ। তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, "এসব কথা থাক।...তুমি আমাকে আর কতক্ষণ সময় দেবে।"

"সে তো তোমার ওপর নির্ভর করছে। আমি শর্ত মেনে চলব।"

"বেশ—তা হলে এসো, দুজনে এখানে একটু সাঁতার কাটি। ধীরে ধীরে। এসো।"

নন্দকিশোর আবার সাঁতার কাটতে লাগল ধীরে ধীরে। তার পাশে সেই লোকটা।

আকাশ কী শান্ত। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ বাতাস জুড়ে আলো মাখিয়ে দিয়েছে। নদীর জলে জ্যোৎস্না-কিরণ। স্রোতের শব্দ হচ্ছে। দু পাশের গাছপালা, মাটি, পাড়, চর যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

নন্দকিশোর আকাশের দিকে তাকাল বার বার। জলের দিকে। মন্দির দেখা যাচ্ছে না। মণিমালা বসে আছে মন্দিরে।

হঠাৎ কেমন করে যেন একটু হাসল নন্দকিশোর। "মহারাজ, আমার হাসি পেল হঠাৎ!"

"কেন?"

"আমরা দুজনে বেশ মজার খেলা খেলছি। মাছের মতন। জলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে খেলা। চাঁদ আমাদের দেখছে, আকাশ দেখছে..."

"আমিও তোমাকে দেখছি।"

"কেমন দেখছ?"

"তুমি আর পারছ না।"

"সত্যি আর পারছি না।...তা আমায় একটা কথা বলবে?"

"বলো?"

"পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। কিন্তু জগতের হিসেবটা কেমন, মহারাজ? মানে, কতটা পাপ আর কতটুকু পুণ্য?"

"পাপ অনেক বেশি, পুণ্য কম।"

"তা হলে পুণ্যের অর্থ কী?"

"পুণ্যের আলাদা কোনো অর্থ নেই। পুণ্য শূন্যবিশেষ। তার অর্থ মানুষের নিজের কাছে। সৎকর্মের যোগে পুণ্যের অর্থ হয়।"

"তুমি যে সেই ধার্মিক বকের মতন কথা বলছ। আমি তো যুধিষ্ঠির নই।"

"আমি ধর্মরাজ হে।"

"ঠাট্টা করছ!...আচ্ছা বলো তো, মানুষ এত স্বপ্ন দেখে কেন, কেন এত

আশা করে ?"

"স্বপ্ন দেখা তার স্বভাবধর্ম। আশা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। আশা, ভালবাসা, প্রত্যাশা। গাছ বাঁচে তার শেকড়ের রসে। জীবন বাঁচে স্বপ্নে আর আশায়।"

"কিন্তু তুমি ? তুমি তো এসব ভাব না। তুমি বড় নির্দয়।"

"আমি অস্বীকার করছি না। তবে আমি আছি—এটা তোমরা ভুলে যাও।...আমাকে মনে রাখলে বাঁচা যায় না, আমাকে ভুলে গিয়েও কি বাঁচা যায় !"

নন্দকিশোর যেন কী একটা বলতে গেল। পারল না। গলা বন্ধ হয়ে এল। কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। জোরে জোরে মাথা নাড়ল। চেষ্টা করল গলা পরিষ্কারের। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায়, অস্পষ্টভাবে যেন বলল, "এই নদী, এই জল, আজকের এই সাঁতার..."

অর্জুন আর শিরীষ গাছের মাথায় চাঁদ। একজোড়া কলকে ফুলের ঝোপ বাতাসে কাঁপছে। নদীর পাড়ে পাথরের পাশে নন্দকিশোর শুয়েছিল। পাশে বেতের টুকরি, ফ্লাস্ক, তোয়ালে।

ড্রাইভার নাগেশ্বর এসেছিল সাহেবকে ডাকতে। মণিমালারাও আসছে মন্দির থেকে। মণিমালা আর কমলা।

নাগেশ্বর এসে দেখল, সাহেব আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন।

ডাকবে কি ডাকবে না করে ডাকল সাহেবকে।

সাহেব ঘুমোচ্ছেন।

মণিমালারাও এসে পড়ল। মুখে হাসি। লাটুবাবাকে রাজি করিয়েছে মণিমালা। কমলার হাতে পুজোর প্রসাদী ফুল, মিষ্টি।

মণিমালা কাছে আসতেই নাগেশ্বর বলল, "সাহেব নিদ গিয়েছেন মা। ডাকছি—উঠছেন না।"

মণিমালা স্বামীর পাশে ঝুঁকে পড়ে ডাকল, "এই যে শুনছো! ওঠো! পাথরে শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে! নাও, ওঠো।"

নন্দকিশোর সাড়া দিল না।

দাঁড়াও পাঠকবর,জন্ম যদি তব এই বঙ্গে

এসেছে নতুন বছর,২০১১ সালের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি আমরা। অনেক আশা নিয়ে অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তোলার প্রয়াস,আজ বর্ষশেষের পরিক্রমায় বলতেই হবে যে লক্ষ্য অনেকাংশেই সফল। দেশে বিদেশে আজ শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদেও সক্রিয়তাই আমাকে নিত্যনতুন বাধাবিঘ্ন পার হয়েও সাইটটিতে নতুন নতুন বই আপডেট করায় নিয়োজিত রেখেছে।

যারা এ্যাড ব্রাউজ করে আমাকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছেন,তাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা রইল। আবারও বলছি,যারা বাংলাদেশে থাাকেন,তাদের এই কাজে অংশ নেওয়ার দরকার নেই। যারা প্রবাসী,তাদের কাছে অনুরোধ রইল আর একটু বেশী সময় ধরে ব্রাউজ করতে। সম্ভব হলে ভিন্ন আইপি থেকে ব্রাউজ করতে পারেন।

আপনাদের পছন্দের বইটি পেতে চাইলে চ্যাট বক্সে বা আমাকে সরাসরি মেইল করতে পারেন ayan.00.84@gmail.com এ। আমার শহরে বইয়ের প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনাদের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করব। আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা এ সাইটের কথা জানেন না,তাদেরকে রেফার করতে পারেন। এছাড়া শীঘ্রই ফেসবুকে একটি পেজ খোলার চিন্তা করছি,যেখানে আপনারা সংযুক্ত থাকতে পারবেন।

মূলত এখনও পর্যন্ত ওয়েবে অপ্রাপ্য বইগুলিই এখানে দেওয়ার চিন্তা আছে,তাই কোন বই আপনি সাজেষ্ট করার আগে বিভিন্ন ফোরাম ঘুরে দেখে নিন সেখানে বইটি আছে কিনা।

বর্তমানে মূলত ভারতীয় লেখকদের লেখাই প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,পরবর্তীতে বাংলাদেশী লেখকদের লেখাও আনা হবে।

এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে লেখক,প্রকাশকদের কোনওভাবে ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না,তাই কোন বই আপনার ভাল লাগলে তার হার্ডকপিটা বাজার থেকে কেনার চেষ্টা করুন,প্রিয়জনকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দিন। আর বেশী বেশী করে বাংলা বই পড়ুন। আপনাদের জীবন বইয়ের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুক,এই কামনায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা আরও একবার জানিয়ে শেষ করলাম।

মোবাইলঃ 8801734555541
8801920393900